শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস

ইমতিয়ার শামীম

সামান্য মুখবন্ধ
শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস
বাজারের ক্ষুধা : বলিভিয়া থেকে বাংলাদেশ
শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস : পূর্বপাঠ
সামাজিক বণিক, রুইকাতলার ব্যবসা এবং জরুরি একুশ
বিদায় স্বায়ত্তশাসন ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা?

সামান্য মুখবন্ধ

অভয় দিচ্ছি শুন্‌ছ না যে? ধরব না কি ঠ্যাং দুটা?
বস্‌লে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা।
আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

- সুকুমার রায়

আমাদের অনেকেরই মনে আছে, ২০ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর কালক্রমে বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী বামপন্থীরা জিয়াউর রহমানের মধ্যে অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপব আর চৈনিক বামপন্থীরা জনগণতান্ত্রিক বিপব সম্পন্ন করার মতো অসাধারণ নেতৃত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিয়াউর রহমান অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপব সম্পন্ন করেন নি; কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপবের উপযোগী কোনও পথও তৈরি করেন নি। উল্টো তিনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিত ১৯৭২-এর সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে হত্যা করেছিলেন, ধর্মজ রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার দিয়েছিলেন, ধর্মজ রাজনীতির অনুসারী যেসব নেতা-কর্মীরা যুদ্ধাপরাধজনিত অপরাধে বিচারের জন্যে কারাগারে ছিলেন কলমের এক খোঁচায় তাদের মুক্তি ও নিস্কৃতি দিয়েছিলেন, মুক্তবাজার গঠন ও বেসরকারিকরণের কাজ জোরদার করেছিলেন। আর এসবের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান ও তার সহযোগীদের মোক্ষম যুক্তিটি ছিল : 'একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হত্যা করা হয়েছে। আমরা চাই বহুদলীয় গণতন্ত্র।' শুধুমাত্র চতুর্থ সংশোধনীটি অকার্যকর ও বাতিল করেই এই গণতান্ত্রিক অধিকার তখন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তা করতে উৎসাহী হন নি। কেননা তাদের বিশেষ কর্মসূচি নির্ধারণ করা ছিল ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই।

মাত্র বছরদেড়েক আগে ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এ আমাদের দেশে আবারও একটি নীরব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই নীরব সামরিক অভ্যুত্থানের যোগান দিতে দেশের কথিত নাগরিক সমাজ ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তাদের সেই ভূমিকার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসে সামরিক বাহিনী। দেশ জুড়ে মাতম তোলা হয়, আমরা আর ১১ জানুয়ারির আগে ফিরে যেতে চাই না; বাংলাদেশ এবার 'ইউনূস-যুগে' প্রবেশ করেছে, এইবার দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে, দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হবে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, তথ্যঅধিকার পাওয়া যাবে, নারীর সমানাধিকার পাওয়া যাবে, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশের মানুষ এসব কথায় আশ্বস্ত হোক বা না হোক, দেশের কয়েকটি মিডিয়া অবশ্য এরকম সংবাদই পৌঁছে দিচ্ছিল দেশবাসীর কাছে। আর সেসব মিডিয়ার ওপর আস্থাশীল শহুরে মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশও খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

এইসব মধ্যবিত্ত এখন ক্লান্ত ও অবসন্ন। কেননা ছদ্দবেশি সামরিক শাসনের গর্ভে সুশীল নাগরিকদের জান্তব প্রগতিশীলতা কোনও স্বস্তির জন্ম দিতে পারে নি। দেশে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হয় নি, বরং আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি আর ঘুষ নিয়ে গবেষণাকারীরা,– যাদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই সামরিক-তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছেন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছেন। এরকম এক 'জেহাদের' ফল এই যে, সম্প্রতি 'ইকনোমিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের রংপুরে ন্যায্যমূল্যের চালের সারিতে দাঁড়ানো নিঃস্ব দিনমজুরকে এখন বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমাদের রাজনীতিকরা দুর্নীতিবাজ ছিলেন ঠিকই,

কিন্তু তাদের সময়ে আমাদের হাতে চাল কেনার মতো টাকাও ছিল!' বছর শেষে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন, তা থেকেও দেখা যাচ্ছে হত্যা-সন্ত্রাসও আতংকধর চারদলীয় জোট সরকারের সময়ের মতোই আছে। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য এত বেড়ে গেছে যে একদা এ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মধ্যবিত্ত পুরুষরা মুখ চুন করে তাদের বউদের পাঠাচ্ছেন মুখে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে বিডিআর পরিচালিত ন্যায্যমূল্যের দোকানের সারিতে দাঁড়ানোর জন্যে; প্রতিদিন ঘর্মাক্ত শরীরে তর্কাতর্কি করছেন বাস-স্কুটারের চালক ও টিকেটবিক্রেতাদের সঙ্গে টিকেটের বেপরোয়া মূল্য নিয়ে। আর এইসব মিডিয়া, যেগুলি আগবাড়িয়ে কথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'পার্লামেন্ট' হয়ে উঠেছিল এবং সেই পার্লামেন্ট হিসেবে টিকে থাকার জন্যে এক ব্যারিস্টার ও প্রাক্তন উপদেষ্টা এবং বর্তমানে মৃত এক খতিবকে মধ্যস্থতাকারী মেনে মৌলবাদীদের সামনে নতজানু হয়ে মাফ চাইতে গিয়েছিল, তারাও এখন বিভিন্ন প্রতিবেদন লিখে যুদ্ধাপরাধী বিচার ও নারীনীতির সপক্ষে দাঁড়িয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার, চেষ্টা চালাচ্ছেন এসব দায় থেকে কর্পোরেটমালিকদের নিরাপদে রাখবার এবং জনগণের ক্ষোভ থেকে কর্পোরেটব্যবসা রক্ষা করার।

বিখ্যাত লেখক এদুয়ার্দো গালিয়ানো ১৯৮৩ সালে লিখেছিলেন, 'মিলটন ফ্রিডম্যানের তত্ত্বসমূহ তাঁকে দিয়েছিল নোবেল পুরস্কার আর চিলির জনগণকে দিয়েছিল জেনারেল পিনোচেট।' বাংলাদেশেও একজন মানুষ ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান এবং তারপরই দাবি তোলেন চট্টগ্রাম বন্দর বেসরকারি করার। আর এই দাবি তোলার মধ্যে দিয়ে তিনি ইঙ্গিত দেন ফ্রিডম্যানের বিশ্বস্ত এক অনুসারী এবার দানবীয় শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। তবে এই দানব আসছে বেসামরিক পথ ধরে, যাতে সামরিক শাসনবিরোধিতায় অভ্যস্ত এদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায়। কেননা অর্থনীতিতে মুক্তবাজারউপযোগী সংস্কার আনার জন্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সামরিক শাসকদের প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিচিত পথটি আর কিছুতেই অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। অতএব জন্ম নিলো একজন সামাজিক বাণিজ্যবাদী, জন্ম নিলো সামাজিক বাণিজ্যতত্ত্ব। তিনি এমনকি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও কথা বললেন। কিন্তু মুর্খ আমরা বুঝতে পারলাম না, ফ্রিডম্যানও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ঘোরতর বিরোধিতা করে গেছেন, কেননা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ মুক্তবাজারপন্থী হলেও বাজারকে সর্বাত্মকভাবে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করে এবং কেইন্সবাদকেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্রয় দেয়। অথচ ফ্রিডম্যান ও শিকাগো স্কুলপন্থী অর্থনীতিবিদদের কাছে কম্যুনিস্টদের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর হলো এই কেইন্সপন্থী পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা।

নোবেলবিজয়ীর পাশাপাশি একজন পূর্ণাঙ্গ জেনারেল পেতে অবশ্য আমাদের একটু দেরি হলো, কেননা পূর্ণাঙ্গ কোনও জেনারেলই ছিলেন না বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে। অতএব ১১ জানুয়ারির পর প্রথম সুযোগেই এ পদটি সৃষ্টি করা হলো। এবং আমরা একজন পূর্ণাঙ্গ জেনারেলের মুখ দেখলাম। সুশীল নাগরিকরাও এতে প্রীত হলেন, পদায়নের শক্তি তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। একজন সম্পাদক দূরদর্শনে গলা তুলে ঘোষণা করলেন, এই সরকারকে আমরাই এনেছি। এই সরকারকে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাও একই স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। মিডিয়া এবং রাজনীতিকদের প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে দিয়ে 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় মারব না' বলতে বলতে আমাদের প্রতিটি আপদে-বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল সামরিক বাহিনী। ১১ সেপ্টেম্বর যেমন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেটবাদীদের নতুন করে কর্পোরেটস্বার্থ বিন্যস্ত করার সুযোগ এনে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ বিভিন্ন সংকট আর প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিও কর্পোরেটবাদীদের একের পর এক নতুনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার সুযোগ এনে দিলো। সামরিকতন্ত্র বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের দাওয়াই অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্পোরেটদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে থাকল, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলল পূর্বঐতিহ্যিক পথে,– ধর্মজ রাজনৈতিক শক্তি সংঘবদ্ধ করার পথে,– যে পথের দিশারী ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সামরিক জান্তা জিয়াউর রহমান।

মঈন উ আহমেদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতিতে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পাঠের সময়েই জানিয়ে দিলেন, ধর্মের নৈতিকতা দিয়ে রাজনীতির কলুষ দূর করতে হবে। চতুর্দশ শতাব্দীতে আধুনিক রাষ্ট্রবাদীরা যে ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিল, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলল সামরিক বাহিনী পরিচালিত শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু এ দিকটি আমাদের নাগরিক ও রাজনীতিকদের চোখেই পড়ল না। কেননা তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মঈন উ আহমেদ কথিত মুক্তিযুদ্ধ তত্ত্ব নিয়ে। তারা মনে করলেন এইবার দেয়ালে শেখ মুজিবুর রহমানের পাশ থেকে জিয়াউর রহমানের ছবি খসে পড়বে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বাস্তবে দেয়ালে আরও অনেকের ছবি উঠল। যদিও সেই ছবির ভিড়ে এমনকি তাজউদ্দিনের মতো মুক্তিনায়কও কল্কে পেলেন না। এমনকি এখনও সুশীল নাগরিক ও মধ্যবিত্তদের অনেকে বুঝতে চাইছেন না, জিয়াউর রহমান যেমন সোভিয়েত ও চৈনিক রাজনীতিকদের সঙ্গে নিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বার্থসংরক্ষণ করেছিলেন মৌলবাদী ধর্মজ রাজনীতিকদের তেমনি এই সামরিক বাহিনী পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও প্রতিটি কথিত প্রগতিশীল কাজ সম্পন্ন করার নামে সামরিকতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন।

প্রচণ্ড সাফল্যও অর্জন করেছেন তারা তাদের এজেন্ডাগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। একেবারেই গর্হিত ও দৃষ্টিকটূ দেখায় বলে (তা ছাড়া সামরিক শাসনসহ বিভিন্ন অবৈধ শাসন বৈধ করার শেষ আশ্রয়ও বটে!) প্রধান বিচারপতি হিসেবে কোনও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলেও দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে একজন সাবেক সেনাপ্রধানকে। সম্ভব হয়েছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তাকে অধিষ্ঠিত করা, যিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কেই ভিন্নমত পোষণ করেন। নির্বাচন কমিশনের মতো স্পর্শকাতর জায়গাটিতে সেনাকর্মকর্তা কাউকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা না গেলেও গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন এমন একজন সেনা কমর্কর্তা যিনি চাকরিজীবনে দুর্নীতি-অনিয়মের দায়ে সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং যিনি সারা দেশে একযোগে বোমা বিস্ফোরণের পর জোট সরকারকে জঙ্গিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাকে নিয়োগ দেয়ার পরদিন এইসব দুর্নীতি-অনিয়মের কাহিনী প্রকাশিত হয় দৈনিক সমকালে। কিন্তু এ কাহিনীকে ঢাকবার জন্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'পার্লামেন্ট' সর্বাধিক প্রচারসংখ্যার দৈনিক প্রথম আলো ত্বরিৎগতিতে খবর ছাপে,- দায়িত্ব নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার সম্পত্তির হিসেব দিয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিচয় দিয়েছেন! দেশের কারাগারগুলির মূল দায়িত্বেও এখন সেনাকর্মকর্তারা। প্রশাসনের সবখানে এখন অঞ্চলপ্রতিনিধি বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তাদের তুমুল দাপট। আর 'জনস্বার্থে' সামরিক বাহিনীর প্রধানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে আরও এক বছর।

অন্যদিকে প্রতিটি আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে প্রশাসনিক শিক্ষক ও সামরিক প্রতিনিধিদের মতবিনিময় কেন্দ্রে, প্রতিবাদকারী ছাত্র-শিক্ষকদের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে অব্যাহতগতিতে। প্রগতিশীল হিসেবে বিবেচিত অনেকেই তাদের সারা জীবনের গৌরব এই অপচেষ্টার পেছনে ব্যয় করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। আগস্ট ২০০৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এবং তার অনুসারীদের মুখোশ খসে পড়তে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প রাখার মধ্যে দিয়ে নাগরিক সমাজসমর্থিত সামরিকতন্ত্রের প্রতিনিধিরা যা বলতে চেয়েছিলেন, অনেক আগেই তার সারমর্ম সুকুমার রায় লিখে গেছেন তাঁর ছড়ার এইসব বাক্যে : 'হাতে আমার মুগুর আছে, তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?/ মুগুর আমার হালকা এমন মারলে তোমার লাগবে না।' কিন্তু তাদের সেই অভয়ে কাজ হয় নি বলে তারা সত্যিই আমাদের ঠ্যাং চেপে ধরেছিল, মুণ্ডু চেপে বসেছিল। তারপর 'তিনি, তার গিন্নি এবং তাদের নয় ছেলে' অর্থাৎ অদৃশ্য সামরিক শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ উপদেষ্টা মিলে কামড়াতে শুরু করেছিল,– শাহবাগের আজিজ মার্কেট থেকে শুরু করে সেদিনের গোটা বাংলাদেশই এসব ঘটনার সাক্ষী।

পেছনের দরজা দিয়ে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা নেন, তারা এমনসব ঘটনা ঘটাতে শুরু করেন যাতে জনগণ খানিকটা স্বস্তি খুঁজে পায়, যাতে তাদের কাটা ঘায়ে আরামপ্রদ মালিশ লাগে। এ ধরনের সব শাসকই ক্ষমতা দখলের পর দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা তৈরি করতে থাকে। কিন্তু পরে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্যে আবার এরকম সব দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদেরই আত্তীভূত করতে থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। এই সামরিক-তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর যারা উলসিত হয়েছিলেন এবং এখনও যারা উলাস করছেন তারা এ ইতিহাসবিস্মৃত হয়েছেন। তারা ভুলে গেছেন, প্রতিটি সামরিকতন্ত্রই ক্ষমতা দখলের পর 'প্রথমে জানোয়ারটার গায়ে দুর্গন্ধ লাগিয়ে দাও, তারপর ওটাকে শিকার কর' তত্ত্ব অনুসরণ করে, যাতে আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে যেসব কেন্দ্রগুলি থেকে, সেগুলিকে তছনছ করে দেয়া যায়। তছনছ করে দেয়া এইসব পরিকেন্দ্রের ওপরে দাঁড়িয়েই আবার গড়ে তোলা হয় পুরানো সব জঞ্জাল দিয়ে নতুন এক কেন্দ্র। এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রথম উদাহরণ জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, দ্বিতীয় উদাহরণ এরশাদের বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি। আর তৃতীয় উদাহরণটি তৈরি করার চেষ্টা চলছে এখন এবং অবশ্যই অতীতের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি মুন্সীয়ানার সঙ্গে। এমনকি ভুলগুলিও সামরিক-তত্ত্বাবধায়ক সরকার করছে অনেক-অনেক বেশি মুন্সীয়ানার সঙ্গে, যাতে সেইসব ভুল থেকে অনেক বেশি ফায়দা আদায় করা যায়।

এবং সে-লক্ষ্যে সব কিছু তছনছ করা হচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক দলগুলিকে নয়, আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধারণাগুলিকেও। দেশের সংবিধানে পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সরকারই তা অমান্য করে বাজারকে অবাধ করেছেন। এবং লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, এই সামরিক-তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এরকম একটি মারাত্মক অপরাধ করে চলেছেন এবং বাজারকে প্রতিদিন তছনছ করছেন। বায়তুল মোকাররম থেকে যারা 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের জামাইআদরে রাজপথ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করায় বামপন্থীদের মুক্তাঙ্গন থেকে মিছিল করার পথে বাধা দেয়া হচ্ছে, হামলা করা হচ্ছে। আমাদের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল। এই স্বাধীনতা কতটুকু দেয়া হয়েছে, বিচার বিভাগ অবমাননার ভয়ে কারোরই সাহস নেই তা নিয়ে প্রাণ খুলে আলোচনা করার। আমাদের তথ্যঅধিকার আইনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সেই তথ্যঅধিকার আইন বাস্তবে কতটুকু

তথ্য জানার অধিকার দেবে, তথ্য জানানোর জন্যে দায়বদ্ধ করবে, সে সম্পর্কে এর মধ্যেই আমাদের চোখ খুলে গেছে। বিটিভি'র চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তথ্যস্বচ্ছতার প্রতি এ সরকারের কত দরদ! 'যুদ্ধাপরাধী' শব্দটি জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে,– যাতে ধর্মজ রাজনৈতিক শক্তিই যে মূলত যুদ্ধাপরাধী ছিল, রাজাকার, আলশাম্‌স ও আলবদর ছিল, সেটি আমরা ভুলে যাই ক্রমান্বয়ে। এবং যাতে এইভাবে ধর্মীয় রাজনীতির একটি স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য অবয়ব তৈরি করা যায়। সবচেয়ে কৌতুককর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নারীনীতি নিয়ে। ধর্মজ রাজনৈতিক শক্তি বলছে, সমানাধিকারের কথা বলা যাবে না, বলতে হবে নারীর ন্যায্য অধিকারের কথা। সামরিকতন্ত্র পরিচালিত সরকার এর মধ্যেই ধর্মজ রাজনৈতিক শক্তির উত্থাপিত এরকম সব দাবি পর্যালোচনা করার জন্যে একটি কমিটিও তৈরি করেছেন। এবং আমাদের প্রকারান্তরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ন্যায্য অধিকার আর সমানাধিকারে অনেক তফাৎ, ন্যায্য শব্দটির মধ্যেও শোষণের দিক রয়েছে এবং সেই শোষণমূলক দিকটি বহাল রাখার ব্যাপারে এ সরকার বদ্ধপরিকর।

আমরা জানি না, ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে আরও কত কী অপেক্ষা করছে। তবে এটুকু এর মধ্যেই পরিষ্কার, নাগরিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা এই সামরিকতন্ত্রের কাছ থেকে পাওয়ার কোনও কিছুই নেই। এই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করা আর ধর্মজ রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করা, রাজনীতিতে সামরিকতন্ত্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও সাংবিধানিকভাবে বৈধ করা সমান কথা। যারা এতদিন এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এদের উত্থাপিত একেকটি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশংসা ও আলোচনা করেছেন এবং এইভাবে সময় নষ্ট করেছেন, নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির পথ রুদ্ধ করেছেন এবং কথিত 'গোপন ক্ষুধা'র মতো 'গোপন দুর্নীতি' ও 'গোপন সন্ত্রাসের' রাজত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন তাদের সম্পর্কেও সময় এসেছে প্রশ্ন তোলার।

এসব হচ্ছে, কেননা বর্তমানে গণতন্ত্রকে বিশ্বায়িত করার সশস্ত্র প্রক্রিয়া চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। সশস্ত্র বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ২০০১-এর অক্টোবরে গণতন্ত্র দেয়ার নামে ইরাকে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেইন।

আর বাংলাদেশেও আমরা দেখছি একই প্রক্রিয়া, দেখছি সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্ভট প্রচেষ্টা। সশস্ত্র বাহিনীর রাষ্ট্রশাসন, সামরিকতন্ত্র ইত্যাদি আমাদের জন্যে নতুন ঘটনা নয়। নতুন বিষয় হলো রাজনৈতিক সংস্কারের সামরিকতান্ত্রিক এ উদ্যোগের পেছনে নাগরিক সমাজের সমর্থন ও সহায়তা। নতুন বিষয় হলো এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে কর্পোরেটতন্ত্রের সম্পর্ক। এদেশে এমনটি এর আগে কখনও দেখা যায় নি।

এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে এমনই সব প্রসঙ্গ। বইয়ের প্রথম লেখা 'শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এ চেষ্টা করা হয়েছে সামরিক-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সামগ্রিক চরিত্র, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন তুলে ধরার। দ্বিতীয় লেখা 'বাজারের ক্ষুধা : বলিভিয়া থেকে বাংলাদেশ'-এ চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা তুলে ধরার; চেষ্টা করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রবণতা তুলে ধরার। প্রাসঙ্গিকভাবেই এতে আলোচিত হয়েছে বলিভিয়ার প্রসঙ্গ, শক থেরাপী তত্ত্ব। তৃতীয় লেখা 'শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার : পূর্বপাঠ'-এ রয়েছে ২০০৬-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর অবধি রাজনৈতিক সংকটের দিনগুলোর পর্যালোচনা। 'সামাজিক বণিক, রুইকাতলার ব্যবসা এবং জরুরি একুশ' প্রবন্ধটি ভিন্ন শিরোনামে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পাঠ করা হয়েছিল ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানমালার সেমিনারপর্বে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারমুগ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ প্রবন্ধেই তখন লেখা হয়েছিল, একটি দেশে জরুরি অবস্থা এলে জনগণ প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন কারণে খুশি হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরাও যখন খুশি হন এবং বিষয়টির অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করতে থাকেন, তখন বুঝতে হবে আমাদের জন্যে সামনে দুর্দিন অপেক্ষা করছে। সর্বশেষ লেখা 'বিদায় স্বায়ত্তশাসন ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা'-য় আলোচনা করা হয়েছে এই সরকারের সময় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ সংস্কার ও ব্র্যাকের কাছে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা তুলে দেয়ার পরিকল্পনার অযৌক্তিকতা নিয়ে।

লেখাগুলি বিভিন্ন সময় এক বা একাধিকবার ছাপা হয়েছে সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্রের গবেষণা জার্নাল সমাজ নিরীক্ষণ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সমকাল, অনলাইন দৈনিক ইউকে বেঙ্গলি ডট কম, সাপ্তাহিক একতা এবং সাপ্তাহিক নতুন দিনে। লেখাগুলো প্রকাশের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সমকালের সম্পাদক-সাংবাদিক আবেদ খান, ইউকে বেঙ্গলি'র সম্পাদক মাসুদ রানা, ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সাংবাদিক সুকান্ত গুপ্ত অলক ও অশোক দাশগুপ্ত প্রমুখের কাছে। বইয়ে লেখাগুলি প্রকাশের সময় তেমন কোনও পরিবর্তন করা হয় নি। এ বই ছাপা হতে হতে আরও অনেক ঘটনা ঘটবে, অনেক পরিবর্তন ঘটবে; কিন্তু যে মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলো এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কোনও পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করি না।

লন্ডন, ১৭ আষাঢ় ১৪১৫/ ০১ জুলাই ২০০৮।

শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস

প্রথমে আমরা তোমাদের নিংড়ে নিংড়ে খালি করে ফেলব, তারপর আমাদের দিয়ে তোমাদের ভরিয়ে তুলব।

- জর্জ অরওয়েল, নাইনটিন এইটিফোর

আকস্মিক এক প্রচণ্ড ধাক্কা ও মোক্ষম সংকটের মধ্যে দিয়েই কেবল সম্ভব সব কিছু ঢেলে সাজানো, সম্ভব পুঁজিবাদকে তরঙ্গিত করা আর মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্রুপদ রূপটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা,– আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ১৯৬২ সালে সোজা বাংলায় বলতে গেলে এটুকু কথাই জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান তাঁর 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ফ্রিডম' বইটির মধ্যে দিয়ে। কালক্রমে বইটি পরিণত হয় সারা বিশ্বের মুক্তবাজারবাদীদের একমাত্র নিরাময়গ্রন্থে। বইটির ১৯৮২ সালের সংস্করণভূমিকায় ফ্রিডম্যান এ সম্পর্কে এভাবে তাঁর চূড়ান্ত ভাষ্য লেখেন : 'শুধুমাত্র একটি সংকট – তা প্রকৃতই হোক আর উপলব্ধিজাতই হোক – পারে সত্যিকারের পরিবর্তন সংঘটিত করতে। যখন ওই সংকট দেখা দেয়, চারপাশের ধারণাসমূহের ওপর নির্ভর করে যে কী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এটাই, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মৌলিক কাজ : বিদ্যমান নীতিসমূহের বিকল্প বিকশিত করা এবং রাজনৈতিকভাবে সেগুলির অসম্ভাব্যতা যতক্ষণ না রাজনৈতিক সম্ভাব্যতায় পরিণত হয় ততক্ষণ সেগুলিকে জীবন্ত ও সহজলভ্য রাখা।' ধীরে ধীরে ফ্রিডম্যানের এই ভাষ্যই পরিণত হয় নতুন গণতান্ত্রিক পর্বের মূল ও মৌলিক মন্ত্র। অ্যালান মেলজার পরে ফ্রিডম্যানের এই ধারণার পরিবর্ধিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আইডিয়া বা ধারণা হলো সেইসব বিকল্প যেগুলিকে একটি সংকটময় কালে পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা রাখার জন্যে জিইয়ে রাখা হয়। ফ্রিডম্যান যে 'মডেল অব ইনফ্লুয়েন্স' তুলে ধরেন তার মূল লক্ষ্যই ছিল এই ধরনের আইডিয়া বা ধারণাগুলির যৌক্তিকতা তুলে ধরা, এগুলিকে ধারণ ও গ্রহণযোগ্য করা এবং ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকা।

ফ্রিডম্যান ও তাঁর ধারণা প্রথমদিকে গুরুত্ব না পেলেও বিশেষকরা এখন এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত যে, মধ্য আশির দশক থেকে শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বাবধানে 'সংকটের অনুমিত সিদ্ধান্ত' বা 'দ্য ক্রাইসিস হাইপোথিসিস' তত্ত্বই কম্যুনিস্ট বকে ভাঙন ধরায় এবং বিশ্বপুঁজিবাদকে চাঙ্গা করে তোলে। ফ্রিডম্যান তাঁর এ তত্ত্ব বিনির্মাণের দিকে আগ্রহী হন এই অনুমান থেকে : একটি গ্রেট ডিপ্রেশন সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রীদের জয়যাত্রার সূচনা করে, বাজার ব্যবস্থায় ধ্বস নামে এবং এই মহাবিপর্যয়কে কাজে লাগিয়েই অনেকদিন ধরে অপেক্ষমান অর্থনীতিবিদ কেইন্স ও তাঁর সহযোগীরা অবশেষে তাঁদের নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের বাস্তবায়ন ঘটান। ১৯৩৩ সালে কেইন্স রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর কাছে এক চিঠিতে জানান, 'এটি এমন এক সময় যখন বাম ও ডানের মধ্যে সমঝোতা কোনও নোংরা বিষয় নয়, বরং অনেকেই বিশ্বাস করে এটি এই বিশ্বকে রক্ষা করার একটি মহৎ উদ্যোগেরই অংশবিশেষ। কেইন্সপন্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়া আর বেকারত্ব ঠেকানোর মতো কাজগুলিই হলো রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদদের প্রকৃত কাজ। কেইন্স সক্ষম হন তাঁর তত্ত্বকে বাস্তবায়ন করতে এবং জন্ম নেয় কল্যানরাষ্ট্রের ধারণা। যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার, কানাডায় জনস্বাস্থ্যের, ব্রিটেনে

সমাজকল্যাণের, ফ্রান্স ও জার্মানিতে কর্মজীবীর অধিকার সংরক্ষণের সফল উদাহরণগুলি সৃষ্টি হয় এই নয়া অর্থনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে।

উন্নত রাষ্ট্রগুলির কেইন্সপন্থী ও সামাজিক গণতন্ত্রীদের অনুসরণে উন্নয়নবাদীরাও একইভাবে পঞ্চাশের দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিণত করেন তাদের উন্নয়ন পরীক্ষাগারে। চিলির সান্তিয়াগোভিত্তিক ইউনাইটেড নেশনস ইকনোমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকার মাধ্যমে দক্ষিণ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যথা চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের অংশবিশেষ জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সাফল্য রচিত হয়, যা চাঙ্গা করে তোলে বিশ্বপুঁজিবাদকে।

উত্তরে কেইন্সপন্থীদের আর দক্ষিণে উন্নয়নবাদীদের সাফল্য শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদদের জন্যে ডেকে আনে অন্ধকার এক যুগ। সেই সঙ্গে অন্ধকার যুগ নেমে আসে কর্পোরেটবাদীদের ওপরেও। কিন্তু বাজারের ক্ষুরধার প্রান্তগুলিকে একটু ভোঁতা করে দেয়ার জন্যে সরকারেরও অধিকার রয়েছে মাঝেমধ্যে বাজারের ওপর হস্তক্ষেপ করার,– এ ধারণার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ যুদ্ধে মিলটন ফ্রিডম্যান তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, রাজনীতিকরা যখন থেকে নয়া অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক স্থপতি মেইনার্ড কেইন্স-এর কথা শুনতে শুরু করেছেন তখন থেকেই ইতিহাস এক মহাচরম ভুল পথে যাত্রা করেছে। ১৯২৯ সালের বাজার বিপর্যয়ের পর বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মোটামুটি ঐকমত্য গড়ে উঠতে থাকে থাকে যে, লেসে-ফেয়ার বা অবাধ বাণিজ্য নীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং সরকারের উচিত সম্পদ পুনর্বন্টন ও কর্পোরেশনসমূহ পরিচালনার জন্যে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করা। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপবের আশংকায় শংকিত পরিণত পুঁজিবাদী সরকারগুলি দ্রুত এগিয়ে যায় কল্যাণমুখী অর্থনীতির পথে। কিন্তু ফ্রিডম্যানের দীক্ষাগুরু ফ্রেডরিক হায়েক এ পথ মানতে নারাজ হন এবং তাঁর স্কুলে দীক্ষিত করেন মিলটন ফ্রিডম্যানসহ বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদকে, যারা এত কিছুর মধ্যেও আদি পুঁজিবাদের বাজার ব্যবস্থার প্রতি তাদের নিঃশর্ত সমর্থন ও নৈবেদ্য দেয়া অব্যাহত রাখেন। হাতেগোণা কয়েকজন অবশ্য বরাবরই ছিলেন, যারা ফ্রিডম্যানকে নবী মনে করতেন। যদিও ১৯৬৯ সালে ফ্রিডম্যানকে রক্ষণশীল পুঁজিপতিদের মুখপত্র 'টাইম'-এও বর্ণনা করা হয় রূপকথার সেই ছুঁচালো নাক-কানওয়ালা এক 'মারাত্মক বালাই' হিসেবে।

কিন্তু সংকটের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কয়েক দশক ধরে শান্তিপূর্ণ অব্যাহত একাডেমিক বিতর্ক চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্রিডম্যান সমর্থ হন সাম্রাজ্যবাদী বিপন্ন রাজনীতিকদের চোখের মণি হয়ে উঠতে। আর তাঁকে এ ব্যাপারে একটানা প্রেরণা যোগায় কর্পোরেটবাদীরা। ১৯৭৬ সালে ফ্রিডম্যানের মাথায় পরিয়ে দেয়া হয় নোবেলমুকুট। আশির দশকে গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার, যার চোখে ফ্রিডম্যান ছিলেন একজন 'বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তিসেনা'। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন রোনাল্ড রিগ্যান, যিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে সব সময় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে বহন করতেন ফ্রিডম্যানের 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ফ্রিডম' গ্রন্থখানি। অতএব ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব প্রায়োগিকতার মুখ দেখতে থাকে। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাজার আবারও অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের সামরিকতন্ত্রচালিত বিভিন্ন দেশগুলিতেও জান্তাদের মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্যের পথ প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সামরিক জান্তা পতনের পরও এ সব দেশে বাজার সম্পর্কিত পুরানো নীতি অব্যাহত থাকে। একটি দেশের সমাজ কিভাবে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদীদের মধ্যে খুব নীরবেই এক মতৈক্য গড়ে ওঠে। সেটি হলো, রাজনৈতিক নেতাদের রাষ্ট্রপরিচালনায় আসতে হবে নির্বাচিত হয়ে আর যিনিই আসুন না কেন, অর্থনীতি তাকে পরিচালনা করতে হবে ফ্রিডম্যানের নীতি অনুসারে। সোজা কথায় বলতে গেলে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের আলাদা ও স্বতন্ত্র কোনও অবস্থান সহ্য করা হবে না। এ পরিস্থিতিকেই ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা বর্ণনা করেছেন 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি' হিসেবে।

ফ্রিডম্যান ছিলেন পুঁজিপতিদের কাছে বিকল্পহীন। তাই ২০০৬-এর নভেম্বরে ফ্রিডম্যান মারা গেলে পুঁজিবাদীদের মুখপত্র 'ফরচুন'-এ লেখা হলো, 'তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ইতিহাসের ধারা।' যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে গৃহীত শোকপ্রস্তাবে লেখা হলো, 'কেবল অর্থনীতি নয়, সব রকম বিবেচনাতেই সারা পৃথিবীতে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা বা লিবার্টির একজন অন্যতম পথিকৃৎ।' ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আরনল্ড সোয়ার্জনিগার ২৭ জানুয়ারি ২০০৭-এ তাঁর প্রদেশব্যাপী পালন করলেন মিলটন ফ্রিডম্যান ডে। আর এই অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতা ও গভর্নরের এ পদক্ষেপকে অনুসরণ করল আরও ক'টি প্রদেশ ও শহর। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শিরোনাম দেয়া হলো – 'ফ্রিডম ম্যান।'

বিশ্বের আর সব মৌলবাদীদের মতো 'ফ্রিডম ম্যান' ওরফে 'ফ্রিডম্যান' এবং শিকাগো স্কুলজাত অর্থনীতিবিদদের সবাই অগাধ বিশ্বাস রাখেন পুঁজিবাদের মৌলবাদে, আস্থা রাখেন বাজারের মৌলবাদে। আর তাই ধর্মজ মৌলবাদও হয়ে ওঠে তাদের বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে শিকাগো স্কুলের পথ খুবই সরল সহজ : আরও কঠোরভাবে, আরও নিবিড়ভাবে বাজারকে অবাধ করে দিতে হবে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর বাজার মৌলবাদে বিশ্বাসী এক পত্রিকা অসীম ব্যথা নিয়ে লিখেছিল, 'আজকে যে আমরা বৈশ্বিক সাফল্য ভোগ করছি তার সব কৃতিত্বই মিলটনের মুক্ত বাজার, অবাধ মূল্য,

ক্রেতা নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মন্ত্রের ।' ফ্রিডম্যান মনে করেন, মুক্ত বাজার হলো এমন এক সবচেয়ে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বার্থপ্রণোদিত আকাঙ্ক্ষার মারফত সবার জন্যে সবচেয়ে বেশি মুনাফা ও সুফল নিয়ে আসতে পারে । যদি কোনও বাজারে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ঘটতে থাকে, অস্বাভাবিক বেকারত্ব দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে ওই মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কোনও ঝামেলা আছে, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, আসলে ওই বাজার সত্যিকার অর্থে অবাধ ও মুক্ত নয় । বাজারকে সাফল্য পেতে হলে প্রথমত মুনাফা আহরণ করার পথে দাঁড়িয়ে থাকা সব রকম বিধিবিধান দূর করতে হবে । দ্বিতীয়ত সরকারি মালিকানাধীন মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম সব ধরনের সম্পদ বিক্রি করে দিতে হবে কর্পোরেশনের কাছে । তৃতীয়ত সামাজিক জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলি থেকে দ্রুততার সঙ্গে সরকারি তহবিল প্রত্যাহার করে নিতে হবে । অর্থাৎ প্রবিধান বাতিল, বেসরকারিকরণ এবং সরকারি তহবিল কর্তন ও প্রত্যাহারই হলো ফ্রিডম্যানের মতে বাজার অর্থনীতিতে সাফল্য অর্জনের মূল নিয়ামক । আর সেজন্যেই শিকাগো স্কুলের কাছে মার্কসবাদীদের চেয়েও অনেক মারাত্মক শত্রু ছিলেন কেইন্সপন্থীরা । শিকাগোপন্থীরা বলতেন, সমস্ত সমস্যার উৎস নিহিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেইন্সবাদ, ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্রী এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নবাদীদের মধ্যে । কেননা এরা বিশ্বাস করে মিশ্র অর্থনীতিতে ।

১৯৫৩ সালে ইরানের জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারপ্রধান (পুঁজিবাদী বিশেষকদের ধারণায় উন্নয়নবাদী নেতা) মোহাম্মদ মোসাদেগকে হত্যার মধ্যে দিয়ে কর্পোরেটবাদীদের উত্থান ঘটতে থাকে । এর পরপরই কর্পোরেশনের স্বার্থে ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় সংঘটিত হয় সিআইএ-পরিচালিত চক্রান্তমূলক অভ্যুত্থান । দক্ষিণের দেশগুলোর জাতীয়তাবাদী সরকারগুলি উন্নয়নের যে ধারার সূচনা করেছিল তা হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রণা ও সংকটের কারণ । এরকম পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালে চিলিতে দুজন মার্কিনীর এক বৈঠক ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এদের একজন ছিলেন চিলির ইউএস ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ইউএসএআইডি) ডিরেক্টর আলবিয়ন প্যাটারসন ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান থিওডোর ডবিউ স্কালজ । এই আলোচনার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী । ফ্রিডম্যানের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদের খ্যাতি পেয়েছেন এমন একজন আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাংক পরবর্তীসময়ে এ ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেছেন, 'হঠাৎ করেই, চিলি এবং এর অর্থনীতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিদিনকার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল ।'

স্বাভাবিকভাবেই আকস্মিক এক প্রচণ্ড ধাক্কা ও সংকটতত্ত্বের প্রথম শিকার হয় এই চিলি । শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদরা চিলিকে গিনিপিগ বানিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে সঙ্গতকারণেই আলেন্দে সে প্রক্রিয়ায় এক ভয়ানক ব্যাঘাত তৈরি করে । এবং ১৯৭৩ সালে আলেন্দেকে হত্যার মাধ্যমে সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় জেনারেল অগাস্তো পিনোচেট । আর সেদিনও ছিল ১১ সেপ্টেম্বর এবং আলেন্দেকে রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনাটিকে পিনোচেট ও তাঁর সঙ্গীরা অব্যাহতভাবে উলেখ করেন 'অভ্যুত্থান' হিসেবে নয় বরং এক 'যুদ্ধ' হিসেবে । চিলির এই সংকটকে আশ্রয় করে ফ্রিডম্যান আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন । যদিও তখনও তিনি ছিলেন অনেকের কাছেই হিসেবের বাইরে । এরপরই চিলি পরিণত হয় মুক্ত বাজার শিকারীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষাগারে । অসীম ধৈর্য নিয়ে ফ্রিডম্যান এগিয়ে চলেন । ১৯৭৫ সালে তিনি পিনোচেটের কাছে এক চিঠিতে লেখেন, 'আমার মতে, মূখ্য ভুলটি হলো এই বিশ্বাস যে, অন্য সব মানুষের অর্থ দিয়ে ভালো করা সম্ভব ।' অন্য সব মানুষের অর্থ অর্থাৎ সরকারপ্রণোদিত জনখাতের ওপর তাই নেমে এলো জোরালো আঘাত । চিলিতে ফ্রিডম্যানের আকস্মিক ধাক্কা ও সংকট তত্ত্বের এত সফল প্রয়োগ ঘটে যে তিন দশক পর এখনও সেটি মুক্ত বাজারবাদীদের কাছে এক অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত । তাই ডিসেম্বর ২০০৬-এ ফ্রিডম্যানের মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক পর যখন পিনোচেটও মারা যান, তখন দ্য নিউইয়র্ক টাইমস 'একটি দেউলিয়া অর্থনীতিকে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্যে' তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেন । অন্যদিকে ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, তিনি এমন সব 'মুক্ত বাজার নীতির প্রচলন করেন যা চিলিতে অর্থনৈতিক মিরাকল ঘটায় ।' তারা শুধু এই কথাটুকু লিখতে ভুলে যায়, এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার কোনও সুফলই সাধারণ চিলিবাসী ভোগ করে নি, বরং প্রতি মুহূর্তে তাদের মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে । মৃত্যু, রক্ত ও হতাশা ছাড়া আর কোনও কিছুই তারা চোখে দেখে নি পিনোচেটদের শাসনামলে ।

ফ্রিডম্যানের এই আকস্মিক ধাক্কা ও সংকটতত্ত্ব বিশ্বপুঁজিবাদকে সচল রাখতে এতই অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা নিজেদের দেশেও এটিকে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন । যুক্তরাষ্ট্রবাসীর ওপর নেমে আসে ১১ সেপ্টেম্বর বা বুশদের ভাষায় নাইন ইলেভেনের মারাত্মক ধাক্কা । শুধু সালের তফাৎ, কিন্তু চিলির মতোই একই তারিখে ঘটে এই ঘটনা এবং পিনোচেটের মতো বুশও একে উলেখ করেন একটি 'যুদ্ধ' হিসেবে । ১১ সেপ্টেম্বরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার মৌলবাদীদের সামনে থেকে শেষ প্রতিবন্ধকটুকুও দূর হয়ে যায় । উন্মত্ত উলাসে বেসরকারিকরণের ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে পথে নেমে আসে তারা । যদিও ওই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে জনখাতগুলো রেখেছিল সবচেয়ে উলে-

খযোগ্য ভূমিকা, তারপরও পুনর্নির্মাণের কাজে সবখানে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে বেসরকারি খাত এবং সরকারি খাতের সর্বশেষ ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিও ধ্বংস করে ফেলা হয় ।

কীভাবে এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞকে বাজার মৌলবাদ কাজে লাগিয়েছে? ১১ সেপ্টেম্বর তো অনেক বড় উদাহরণ, আমেরিকার নিউ অরলিয়ানসের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উদাহরণ থেকেই তা বোঝা সম্ভব । নিউ অরলিয়ানসের ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তিন মাস পর ৯৩ বছরের থুরথুরে বুড়ো 'আঙ্কল মিলটি' ওরফে মিলটন ফ্রিডম্যান দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ লেখেন, 'নিউ অরলিয়ানসের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই যেসব শিশুরা ওইগুলোতে পড়াশুনা করত তাদের বাড়িঘরের মতোই ভেসে গেছে । এই ছেলেপেলেরা এখন সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে । এটি একটি ট্র্যাজেডি । আবার এটি একইসঙ্গে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে রেডিক্যালি সংস্কার করার একটি সুযোগ!' ফ্রিডম্যানের সেই রেডিক্যাল সংস্কারের ধারণাটি ছিল এরকম, সরকারি স্কুলগুলিকে আর সরকারের টাকা খরচ করে পুনর্নির্মাণ ও পুর্নউন্নয়ন করার কোনও দরকার নেই । এবং অচিরেই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিণত হয় বেসরকারিভাবে পরিচালিত চারটার বিদ্যালয়ে । বুশের দু দফার শাসনামলে এ ধরণের ঘটনা কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, সবখানেই ঘটতে থাকে ।

ফ্রিডম্যানের এই আকস্মিক ধাক্কা ও সংকট তত্ত্ব বা শক থেরাপী তত্ত্বের মাধ্যমেই এখন দেশে দেশে চলছে বাজার মৌলবাদ পুনর্গঠনের তৎপরতা, মুক্ত বাজার বিকাশের উদ্যোগ আর কর্পোরেট সংস্কৃতিকে স্থিতিশীল ও অপরিহার্য করে তোলার কাজ । আর নতুন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এশিয়াতেও এর একটি পরীক্ষাগার অপরিহার্য হয়ে ওঠে । আর সেই শূন্যতা দূর করার জন্যে এগিয়ে গেলেন বাংলাদেশের কতিপয় অর্থনীতিবিদ, যারা মনেপ্রাণে আস্থাশীল শিকাগো স্কুলের বাজার মৌলবাদের ওপর । এগিয়ে গেলেন অনেক মিডিয়ামানব । ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন তারা । ধৈর্য ধরে প্রথমে তারা পরামর্শ দিতে লাগলেন নিয়মতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল রাজনীতি করার । পরে ধৈর্য ধরে বিভিন্ন উপায় বাতলে দিতে থাকলেন বিভিন্ন সংলাপ, গোলটেবিল ইত্যাদির মাধ্যমে । আর এর পাশাপাশি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন জনগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে, কখন তাদের মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে, কখন তারা রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ডে তড়িতাহত হয়ে কাতরাতে থাকবে, কখন সংকট দেখা দেবে । এরকম একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজেদের ভূমিকা কি হবে সেসব নিয়েও হোমওয়ার্ক চলতে লাগল । আর ফ্রিডম্যান মারা যাওয়ার মাত্র দু মাস পরেই বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ তত্ত্বের প্রয়োগ শুরু হলো । মাস আলাদা, বছরও আলাদা, কিন্তু কাকতালীয়ভাবে এই তারিখটি ছিল একই,– সেই ১১ তারিখ । তা ছাড়া এক কৌশলটিও । এটিকেও অভিধা দেয়া হলো যুদ্ধের,– নতুন এক যুদ্ধের!

কথিত নতুন দিন

সার্বভৌম হলো সে, যে জরুরি অবস্থার সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।
– কার্ল স্কমিট, নাজী আইনজীবী, ১৯২২

জরুরি অবস্থা জারি হতে চলেছে, – অক্টোবর ২০০৬ থেকেই এ রকম একটি কথা শুনতে থাকি আমরা সবাই, যার কোনও সুনির্দিষ্ট উৎস ছিল না । হতে পারে, পরিকল্পিতভাবেই কথাটি ছড়ানো হচ্ছিল; হতে পারে, মানুষের ভবিষ্যৎ কল্পনার প্রবণতা থেকেই এ রকম একটি কথা ছড়িয়ে পড়ছিল । উৎস যেটাই হোক না কেন, এ প্রচারণার রাজনৈতিক প্রায়োগিকতা ছিল । প্রথমত এর ফলে জরুরি অবস্থাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র বিকল্প পথ হিসেবে প্রচারিত হতে থাকে । দ্বিতীয়ত যে কোনও মুহূর্তে জরুরি অবস্থার শিকার হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলি আমরা সবাই । তৃতীয়ত আমরা বুঝতে পারি, দেশের অবস্থা যত বাজেই হোক না কেন, উর্দিপরা সামরিক শাসন কখনও আসবে না । কারণ সামরিক বাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা নিলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর লোভনীয় বেতনের চাকরির অযোগ্য হয়ে পড়বে বাহিনীর সদস্যরা ।

অতএব সামরিক শাসন নয়, এলো ১১ জানুয়ারি, এলো সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র । গড়ে উঠল সামরিক সুশীলায়তন ।

সকালে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক ও চিফ রিপোর্টাররা জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় থেকে আবাসিক সমন্বয়কারী মিস রেনাটা লক ডেসালিয়েন-এর পাঠানো এক বিবৃতি পেলেন । তার আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে মাত্র তিন মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো গভীর উদ্বেগ মেশানো বিবৃতি দিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন । রেনাটার বিবৃতিতে বান কি মুন-এর এসব বিবৃতির কথা উলেখ করে জানানো হলো, এখনও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন নি, যাতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চিন্তে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে । এ প্রেক্ষাপটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, আইনসংগতও হবে না ।

রেনাটা বললেন, যে-নির্বাচনে অংশ নিতে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সশস্ত্র বাহিনী সেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে সম্প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হতে চলেছে। বাংলাদেশের পুলিশসহ সশস্ত্র বাহিনী সারা বিশ্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং প্রশংসাযোগ্য কাজ করে চলেছে। বিগত নির্বাচনগুলিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথানুগত ভূমিকা জাতিসংঘের কাছ থেকে প্রশংসিত হওয়ার দাবি রাখে। তবে সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়াই আগামী ২২ জানুয়ারির নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সমর্থনে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োজিত হওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকার ক্ষেত্রে এর অর্থবহ তাৎপর্য রয়েছে।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী আরও জানালেন, অর্থবহ তাৎপর্য রয়েছে বলেই এ নিয়ে (অর্থাৎ বিএনপি-জামাত পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর নিয়োজন নিয়ে) আজ রাতে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারালস ইব্রাহিম গামবারি, রাজনৈতিক বিভাগ ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত জেন-মারী গুয়েহেনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক, তত্ত্বাবধায়ক ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

আবাসিক সমন্বয়কারী রেনেটার এ বিবৃতির দুটি দিক ছিল। প্রথম দিকটি হলো, আসন্ন অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা জাতিসংঘের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে দ্বিতীয় দিকটি ছিল সামরিক বাহিনীর জন্যে সত্যিই ভয়াবহ : সামরিক বাহিনী ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে পাহারাদারি করলে তা হবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর জন্যে খুবই 'অর্থবহ'। তার মানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পুলিশসহ সশস্ত্র বাহিনী অংশ নেয়ার সুযোগ হারাবে। এবং এই 'অর্থবহ' দিকটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যেই রাতে জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবেন।

অতএব সামরিক বাহিনী দ্রুত নতুন সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য হলো এবং রাতের আগেই সক্রিয় হলো। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি ও জামাতকে পাহারা দেয়ার পরিকল্পনা বাতিল করল তারা। আর এ পরিস্থিতির জন্যে আগে থেকেই তৈরি ছিল তারা। কেননা এ ঘটনার মাত্র মাসখানেক আগে, ৯ ডিসেম্বরেও রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন নির্দেশ দেন সারা দেশে সেনা মোতায়েনের। কিন্তু সারা দেশে মোতায়েনের আগেই ফের 'বিশ্রামে' পাঠিয়ে দেয়া হয় সেনাসদস্যদের। এ ঘটনার প্রায় মাসখানেক আগে ১২ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আরও একবার নির্দেশ দেয়া হয় সেনা মোতায়েনের। কিন্তু পরদিনই প্রত্যাহার করা হয় সেই নির্দেশ। এইসব নির্দেশ প্রত্যাহারের ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সবার কাছে। মানুষ বুঝতে পারছিল, নতুন মোড়ক ছাড়া সেনাবাহিনী রাজি নয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজে নামতে। ১১ জানুয়ারিতে জাতিসংঘের দেয়া বিবৃতি পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখল নতুন এই মোড়ক সৃষ্টিতে। গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের একটি অংশ আগে থেকেই তৈরি ছিল। জাতিসংঘের বিবৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ত্বরান্বিত হল। তৈরি হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে এ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী ও সুশীল সমাজ অবধি সবার কাছে 'গ্রহণযোগ্য' একটি সমাধানের পথ তৈরির কাজ।

সংবাদপত্রের দপ্তরগুলোয় যখন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির বিবৃতি এসে পৌঁছল, বঙ্গভবনে তখন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন বৈঠক করছিলেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। ওই বৈঠক শেষ হয় বেলা দুটোর দিকে। সবার কাছে 'গ্রহণযোগ্য' সমাধান পথ তৈরির পথটিও ফুটে ওঠে প্রায় একই সময়ে। বিকেল তিনটায় বঙ্গভবনে যান তিন বাহিনীর প্রধান। তাদের সঙ্গে আরও যান প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক। বঙ্গভবনে বসবাসকারী খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিষয়ক ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কথিত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে দেখা করেন তারা। ওই সময়, *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের অলিখিত নিয়ন্ত্রক খালেদা জিয়ার বাসভবনের সঙ্গে বঙ্গভবনের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তারপরও তার একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত কর্মকর্তাটি প্রচেষ্টা চালান পূর্ব ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার। তখন টেলিফোনে নবম পদাতিক ডিবিশনের জিওসিকে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল মইন উ আহমেদ কিছু নির্দেশ দেন। এই ওষুধে কাজ হয়, ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ভূমিকা বদল করেন। শুরু হয় পুতুলনাচের ইতিকথার দ্বিতীয়পর্ব। রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রাত ১১টায় জাতিকে টিভি ও বেতারভাষণে জানালেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন, সর্বজ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা বিচারপতি ফজলুল আহমেদ ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং অন্যান্য উপদেষ্টারা পদত্যাগ করেছেন। শীঘ্রই নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে, যিনি নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন এবং নতুনভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করবেন।

ওদিকে রাত ১১টাতেই দু'জন উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তা ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেন। ড. ইউনূসের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাত ১২টায় যোগাযোগ করেন ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। জগতে কোনও স্থানই শূন্য থাকে না;

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ও বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউলাহ চৌধুরীদের শূন্যস্থান পূরণ করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ।

এ ভাবেই ১১ জানুয়ারি থেকে নতুন এক যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধ রাজনৈতিকতার বিরুদ্ধে সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্রের। এ যুদ্ধ জনখাতের বিরুদ্ধে কর্পোরেটপন্থী অর্থনীতিবিদ ও মিডিয়াজীবীদের। এ যুদ্ধ ব্যক্তি-দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের। যুক্তরাষ্ট্র তার দূত হ্যারি কে টমাসের মুখ দিয়ে যে বিকল্প বা তৃতীয় শক্তির কথা শুনিয়েছিল, সেই শক্তি এবার প্রকাশ্যে তার কাজ শুরু করল। জাতিসংঘের বিবৃতি কাজ করল নেহাৎ অনুঘটকের। সরকার গঠন করা হলো বেসামরিক উপদেষ্টাদের নিয়ে, কিন্তু পেছনে রইল সশস্ত্র বাহিনী। মাসখানেক বাদে ৯ ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (পরে জেনারেল) মইন উ আহমেদ মুখ খুললেন। বললেন, 'সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিতে ইচ্ছুক নয়। তারা দেশের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করছে মাত্র।' বলার মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তাদের আসলে ইচ্ছা করছে না। তারা চান সংকট আরও ঘনীভূত হোক। তখন না হয় ভেবে দেখা যাবে। বোঝা গেল, দেশের পরিস্থিতি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সেই 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজবে কখন' গল্পের মতো। রাস্তার ধারে বেড়ালটি রাজ্যের আলস্যি নিয়ে শুয়ে আছে, তার চোখের সামনে ইঁদুর ঘোরাফেরা করছে। বারবার এসে বেড়ালটিকে ডেকে তুলছে আর বলছে, আমাকে খাও, আমাকে খাও। কিন্তু বেড়ালটি কিছুতেই এখন ইঁদুর খাবে না। কেন খাবে না? না, তার খাওয়ার ইচ্ছে করছে না। কখন খাওয়ার ইচ্ছে হবে? ইঁদুরের এই জিজ্ঞাসার জবাবে বেড়ালটি বলল, অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজলে। তখন কেউ না কেউ তার লেজে পা ফেলবে। লেজে পা পড়ায় বেড়ালের প্রচণ্ড রাগ হবে এবং তখন সে কপ করে ইঁদুরটাকে গিলে ফেলবে। ঠিক তেমনি সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা নেয়ার ইচ্ছে করছে না। যদিও সিংহাসনটা তাদের সামনে নাচানাচি করছে আর বলছে, আমার ওপর চড়ে বসো, আমার ওপর চড়ে বসো...

কিন্তু লেজে পা না পড়লে সামরিক বাহিনী ক্ষমতার মসনদ গিলবে কেন? বিশেষত তাদের যখন জানাই আছে, সিভিল সোসাইটি মুখিয়ে আছে তাদের ক্ষমতার ছড়ি হয়ে বাতাসের মধ্যে বনবনিয়ে ঘোরাফেরা করতে? অতএব সামরিক নেতারা একটি সরকার গড়ল তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সিভিল সদস্যদের নিয়ে আর বেসামরিক প্রশাসনে একের পর এক সামরিক ব্যক্তিকে বসিয়ে 'অদক্ষ' 'অযোগ্য' বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করতে শুরু করল। বেসামরিক প্রশাসন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে প্রথম চোটেই যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা থেকে সরে এলো। গোপনে প্রস্তুতি চলল সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার, রাষ্ট্রপতি হিসেবে সামরিকতন্ত্রের স্বার্থ দেখবে এমন কোনও প্রতিনিধিকে বসিয়ে সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষমতা ভাগাভাগি করার। অর্থনীতিবিদ ড. মোজাফফর আহমেদ তাঁর সারা জীবনের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে টিআইবি গড়ে তুলে এবং প্রতি বছর টিআই-এর কান্ট্রি রিপোর্ট ঘোষণার দায়িত্ব নেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের সামনে চরম দুর্নীতিগ্রস্থ একটি দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নতুন তত্ত্বাবধায়কের প্রথম কাজ হলো নির্বাচনের বদলে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আড়ালে তারা আসলে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে। পদ্ধতিটি খুবই পুরানো। এই একই পদ্ধতিতে আইয়ুব খান আর জিয়াউর রহমানও এগিয়ে ছিলেন। একই পদ্ধতিতে এরশাদও এগিয়ে ছিলেন। তফাৎ হলো তারা এগিয়েছিলেন সামরিক শাসন জারি করে, আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এগুতে লাগলেন সামরিকতন্ত্রকে অন্তর্বাসের মধ্যে গুঁজে। তাদের জন্যে এটি ছিল একটি অপরিহার্য কাজ। কেননা তারা বুঝতে পারছিলেন, ব্যক্তিসন্ত্রাস ও ব্যক্তিদুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির কাছে পরাস্ত ও অধীনস্ত করা সম্ভব না হলে শ্রেণিগতভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়বেন। তাদের সাধের মুক্ত বাজার ব্যবস্থা একটি যৌক্তিক পরিণতি পাবে না। ১১ জানুয়ারির মাধ্যমে এ কাজটিই শুরু করলেন তারা : ব্যক্তিসন্ত্রাস ও ব্যক্তিদুর্নীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শাসনের এমন এক রূপরেখা তৈরি করার দিকে তারা এগিয়ে গেলেন, যাতে ব্যক্তির এমন এক পরিতৃপ্ত সামাজিক সত্তা তৈরি হয় যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির প্রতিবাদ করার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

কেউ কেউ বলছিলেন, ক্ষমতায় যারা এসেছেন তারা দায়ে পড়ে এসেছেন। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল, দায়ে পড়ে নয়, তারা এসেছেন সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে। তখন এও বোঝা গেল, অক্টোবর থেকে জরুরি অবস্থা জারির যে ঢাকঢোল বাজছিল, তা নেহাৎ অনুমান ছিল না, তার পেছনে ছিল সংঘবদ্ধ প্রস্তুতি। সময় ও সুযোগ খুঁজছিলেন এরা সবাই। বিচারপতি ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের আগামী ১৫ বছর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে 'বিতর্ক' বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়নে সবাই মিলে ঝাপিয়ে পড়ার ডাক, মুহাম্মদ ইউনূসের সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করার আহ্বান, জেলায় জেলায় দেবপ্রিয়দের সৎ ও যোগ্যপ্রার্থীর অনুসন্ধানপর্ব, রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা, মিডিয়ায় এসব নিয়ে রীতিমতো তাণ্ডব তৈরি – এসবই এই সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার একেকটি পর্ব। কেউ জেনেশুনে, কেউ আবার না জেনেই এইসব পরিকল্পনার

শিকার কিংবা অংশীদার হয়েছেন। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে জাতে তোলার জন্যে একটি জনপ্রিয় উন্মাদনা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। কেননা এইসব লেখাপড়া জানা কিন্তু সাঁতার না জানা সুশীলদের কথায় পা ফেলতে সাধারণ মানুষ রাজি ছিল না। অতএব দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কালো টাকার বিরুদ্ধে, অর্থপাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী উন্মাদনা তৈরি করা হলো। রাজ নৈতিক সংস্কারের অমীয় বাণী প্রচারিত হতে লাগল।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এতই সুপ্রচারিত হলো যে ঢাকা পড়ে গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংগুপ্ত সব সন্ত্রাস, রাষ্ট্রকেই একটি অতি দানবীয় সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজে রূপান্তর করার যাবতীয় চক্রান্ত। সর্বত্র যেন বাজতে লাগল বব ডিলানের সেই গান : ''সামথিং ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, বাট ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ, ডু ইউ মি. জোনস?'' আমরা সবাই মি. জোনস হয়ে গেলাম। প্রথমে গিয়াস আল মামুন, তারপর তারেক রহমান, তারপর শেখ হাসিনা, তারপর খালেদা জিয়া এইভাবে একের পর এক দুর্বৃত্ত ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত গ্রেফতার হতে থাকল। সবাই এতে মুগ্ধ হলো এবং হাততালি দিতে লাগল। কেননা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আত্মবিশ্বাসও শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি বামনেতারা, মনে করা হয় দুর্নীতি যাদের স্পর্শ করে নি, তারাও বলতে লাগলেন, ঠিকই হচ্ছে, তবে জামায়াত নেতাদের যে কেন ধরা হচ্ছে না তা আমরা বুঝতে পারছি না!

এইভাবে রাজনৈতিক নেতাদের অপরিণামদর্শিতার মধ্যে দিয়ে আমরা এক শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাসের চোরাবালিতে পা রাখলাম। আমরা কেউই এ ব্যাপারটি ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাইলাম না, যা হচ্ছে তার সঙ্গে দেশপ্রেম ও দুর্নীতিবিরোধিতার কোন সম্পর্ক নেই, বরং গূঢ়তর সম্পর্ক রয়েছে সামাজিক বাণিজ্যবাদী সিভিল সোসাইটি ও সামরিকতন্ত্রের যাবতীয় বিশেষ এজেন্ডার।

সামরিক বাহিনীর জন্যে প্রতীক্ষা

তা হলে, আমার মাথা আর স্মৃতি, যা আমার পুঁজি, সেসব ধ্বংস করার আর আমাকে কাজকর্মের বাইরে রাখার মানেটা কি? চিকিৎসাটা দুর্দান্তই হয়েছে, মাঝখান থেকে আমরা হারিয়েছি সহিষ্ণুতা।

- আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, তাঁর ওপর প্রয়োগ করা ইলেকট্রোশক থেরাপি সম্পর্কে, আত্মহত্যা করার কিছুদিন আগে ১৯৬২।

এটুকু বোঝা যাচ্ছিল এবং রাজনীতিকরাও বুঝতে পারছিলেন, এত কিছু যে হচ্ছে তার কারণ সেনাবাহিনী এ রকমই চাইছে। তারা চেয়েছে বলেই ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তার শিক্ষক খালেদা জিয়ার দেয়া যাবতীয় শিক্ষা ভুলে গিয়ে ১১ জানুয়ারি অন্যরকম ভাষণ দিয়েছে। তারা চেয়েছে বলেই কেউ কেউ গ্রেফতার হচ্ছে, কেউ কেউ বহালতবিয়তে ঘোরাফেরা করছে। এইসব গ্রেফতারবাজিতে মুগ্ধ হওয়ার যথেষ্ট আপাতকারণও ছিল। তারপরও সত্যি হলো, সাধারণ মানুষ বা তাদের হয়ে কেউ একবারও জরুরি অবস্থার জন্যে রাষ্ট্র, সরকার, সামরিক বাহিনীসহ কারও প্রতিই আহ্বান রাখে নি। অক্টোবর থেকে অব্যাহত রুদ্ধশ্বাস ও আতংকময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কামনা তাদের ছিল; আবার পরিস্থিতি পরিবর্তিত না হলে ওসবের মধ্যে দিয়েই প্রাত্যহিক কাজকর্ম করার সৎসাহসও ছিল। অরাজকতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের জানমাল নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার প্রস্তুতি ছিল, একইভাবে জরুরি অবস্থার শিকার হওয়ার নিরুপায় সাহসও ছিল।

ব্যতিক্রম ছিল দেশের রাজনৈতিক দল আর ঐতিহ্যবাদী সব বুদ্ধিজীবী। তারা তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে অপেক্ষা আর হা-হুতাশ করছিলেন,– দেশের এ রকম অবস্থায় এখনও সামরিক শাসন আসে না কেন! জরুরি অবস্থা আসে না কেন! যে রাজ নৈতিক সমস্যা তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এ রকম হা-হুতাশ আর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা এবং তাদের নেতৃত্বাধীন দু রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের। খালেদা জিয়ার জন্যে সমস্যা উৎক্রমণের এই পথটি যত লজ্জারই হোক, সমাধানের উপায় মেনে নেয়াটা যত কষ্টেরই হোক, তিনি জানতেন অন্য কোনও বিকল্প হতো আরও ভয়াবহ। তা ছাড়া খেলার চাল যেহেতু সামরিক বাহিনীই দিয়েছে, সেহেতু বিরক্ত হলেও অন্তত কোনও অস্বস্তি জাগে নি তার। সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র তাঁকে এর প্রতিদান দেয়ারও চেষ্টা করেছে, পরিবারসহ বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, টেলিরাজনীতি করার অবাধ সুযোগ দিয়েছে, শেষমেষ নেহাৎই দায়ে পড়ে 'সংকট তত্ত্ব'কে আরও কার্যক্ষম করার জন্যে বাধ্য হয়েছে তাকে গ্রেফতার করতে।

এর বিপরীতে, পাঁচ বছর ধরে রাজপথে আন্দোলনের ডাক দেয়ার পরও আওয়ামী লীগের পক্ষে কোনও অদম্য আন্দোলন গড়ে তোলা হয়ে পড়ে প্রায় দুঃসাধ্য। অক্টোবর ২০০৬-এ রাজপথের আন্দোলন তুঙ্গে উঠতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চোরাবালিতে ডুবে যেতে থাকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতাদের কারণে। ২৮ অক্টোবর ২০০৬-এ পল্টনে মানুষের উপপব তাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ ওইদিন আন্দোলনের মূলকেন্দ্র পল্টন ছিল নিরস্ত্র ১৪ দলের কর্মীদের দখলে।

যদিও সেখানে প্রধান সারির কোনও নেতা ছিলেন না। অন্যদিকে অনুপস্থিত বিএনপি'র সপক্ষে জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডার বাহিনী বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ছিল, ঢিল ছুড়ছিল, চেষ্টা করছিল গোটা এলাকার দখল নিতে। যে কোনও মূল্যে বায়তুল মোকাররমের সামনে নিজামীদের নিয়ে পথসভা করার জন্যে অস্ত্রবাজি করতে করতে জামায়াতে ইসলামী প্রমাণ করে যাচ্ছিল জোট সরকারের সত্যিকারের রাজনৈতিক শক্তি তারাই।

আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মীদের ওইদিনের ভূমিকা ছিল সত্যিই ঈর্ষণীয়। তাদের এই ভূমিকার প্রতি যদি প্রধান ও মধ্য সারির নেতারা শ্রদ্ধাবান হতে পারতেন তা হলে ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। প্রথমত জামায়াতে ইসলামী পর্যুদস্ত হতো। ১৪ দলের নেতারা সক্রিয় হলে বায়তুল মোকাররমের সামনে জামায়াতে ইসলামীর পথসভার ওই মঞ্চেই সভা করতে পারতেন তারা। দ্বিতীয়ত জামায়াতে ইসলামীর এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জোট সরকারেরও পরাজয় ঘটত। আর এর ফলে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র হতো জনগণ ও গণতন্ত্রের প্রতি অনেক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু ঐক্যজোট করলেও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের কোনও মনযোগই ছিল না জোটবদ্ধ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি, রাজপথের আন্দোলনের প্রতি। বড়দল হিসেবে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল এতই সীমাহীন যে অক্টোবরের আন্দোলনে নিহত এক বামকর্মীর নাম বারবার অনুরোধ জানিয়েও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলকে দিয়ে তাঁর ভাষণে উচ্চারণ করানো যায় নি।

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক ব্যবসায়ী নেতাদের মিছিল করে চর্বি কমাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু চর্বির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়েও টান পড়ায় তারা অনাগ্রহী হয়ে পড়ে রাজপথের আন্দোলনে। সংসদীয় আন্দোলনেও অনীহা ছিল তাদের। কেননা রাজপথের নিষ্ক্রীয়তাকে তারা ন্যায্যতা দিতে চাইছিলেন সংসদ বর্জন করার মাধ্যমে। তাদের এ দুটি ভূমিকাই জোট সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রশংসিত হয়। তাই জোট সরকারের দীর্ঘ পাঁচ বছরের শাসনামলেও আওয়ামী লীগের প্রধান সারির কোনও নেতার কোনও সমস্যা হয় নি। না ব্যক্তিগত, না ব্যবসায়িক। জোট সরকারের শাসনামলেও ড. ইকবালরা বহাল তবিয়তে দিন গুজরান করেন। হরতালের ডাক দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল গাড়ি হাঁকিয়ে হোটেল শেরাটনে গিয়ে তাঁর মালিকানাধীন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সভা করেন। এ ভাবে আওয়ামী লীগের নেতারা রাজপথের আন্দোলনকে হাস্যকর করে তোলেন। সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বারবার বলতে থাকেন, 'আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পার্টি, আমরা চাই নির্বাচনে যেতে।' কিন্তু নির্বাচনে গেলেও কি জেতা যাবে? ১০ ডিসেম্বরেই দেশের প্রতিটি জেলায় সেনাবাহিনীর সদস্য পৌঁছে যায় খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ সরকারবিষয়ক কর্মকর্তা ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সপক্ষে। শেখ হাসিনা সখেদে বলতে থাকেন, 'সেনাবাহিনীর কাজ দেশ পাহারা দেয়া, চোর পাহারা দেয়া নয় (আমাদের সময়, ১১ ডিসেম্বর ২০০৬)।' অপেক্ষা করতে থাকেন কবে সেনাবাহিনী 'দেশ পাহারা' দিতে আসবে।

আর বিভিন্ন সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের মূলপ্রাণ বামসংগঠন,– তাদের অবস্থা কেমন ছিল ১১ জানুয়ারির আগেপরে? তারাও জানতেন অচিরেই সামরিক শাসন কিংবা জরুরি অবস্থা জারি হতে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম একটি পরিস্থিতি এলে কর্মীদের কী করতে হবে, জনগণের প্রতিই বা পার্টির কী আহ্বান থাকবে, সে সম্পর্কে তাদের কোনও পরিষ্কার ভাষ্য ছিল না। ষাট ও সত্তরের দশকের যে তরুণ ছাত্রনেতারা বামপন্থী রাজনীতিকে উর্বর করেছিলেন, সামরিক শাসকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন, তাদের সামনে একটি পথই খোলা ছিল : অতীতের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনগুলিতে তারা কী কী করেছেন সেসবের স্মৃতিচারণ করা আর আচমকা হুংকার দিয়ে ওঠা।

বুদ্ধিজীবীরাও বুঝতে পারছিলেন, একটা কিছু ঘটতে চলেছে দেশে। কিন্তু তাদের কাছ থেকেও আগাম কোনও পরামর্শ পায় নি দেশের জনসমাজ। কেননা তারাও চূড়ান্ত অর্থে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না তাদের কারও। দলের ধারণাই ছিল তাদের চূড়ান্ত ধারণা। তারা সেই ধারণা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন জরুরি অবস্থার জন্যে। বারবার পার্টিভাঙনের মধ্যে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা কেউ কেউ সংবাদপত্রে কলাম লিখে অবসর জীবন ভালোই কাটাচ্ছিলেন। তাদের কলমে অত ধার ছিল না যে এ রকম কোনও বিষয় নিয়ে কলাম লিখে মৃত্যুর আগে কলামিস্টের খাতা থেকেও নাম কাটাবেন।

১১ জানুয়ারি এদের সবার জন্যে স্বস্তি নিয়ে এলো। জারি হলো জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থাকে অবিশ্বাস্য নগ্নভাবে স্বাগত জানালো দেশের মিডিয়াগুলো। এই নগ্নতা যাবতীয় সৌন্দর্য হারালো দুর্নীতির দায়ে প্রথমে শেখ হাসিনা ও পরে খালেদা জিয়াকে গ্রেফতারের পর মিডিয়াগুলো সামরিকতন্ত্র পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে হাততালি দেয়া শুরু করলে; এমনকি এখনও তারা প্রচার করে চলেছে, 'অমন অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ঘটনা এই বাংলাদেশে আর কখনও ঘটতে দেখা গেছে?' তাদের মতে, 'এই অনির্বাচিত সরকার জনগণের ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল, চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে উজ্জীবিত করেছিল।' তারা বলতে লাগল, 'গত বছরের ১২ জানুয়ারি খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে

যদি এ ভূখণ্ড থেকে বহু দূরের দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হতো, তা হলে জনগণ শুকরিয়া জানাতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করত।' ফ্রিডম্যানের তত্ত্বের সফল এক প্রতিচিত্র দাঁড় করানোর জন্যে পায়রাখাওয়া মানুষের মতো হন্যে হয়ে উঠল তত্ত্বাবধায়কপন্থী এই সাংবাদিকরা। বাস্তবতা হলো, এর চেয়েও বহু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ সালের রাতে ঘুমের ঘোরেও কি কেউ চিন্তা করেছিল, আগামীকাল সকালে উঠে তারা সপরিবারে শেখ মুজিব হত্যার খবর শুনতে পাবে? দেশে যতবার সামরিক শাসন এসেছে ততবারই কোনও না কোনও অজুহাতে রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে নেয়া হয়েছে। দুর্নীতির দায়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আবার জেল থেকে মুক্তি দিয়ে শাসকদলে আত্তীভূত করে নেয়া হয়েছে। অথচ নব্য সুশীল সামরিকসাধকদের কাছে মনে হতে লাগল 'এ তো অবিশ্বাস্য কাণ্ড!' তারা বলতে লজ্জা পেল, আসলে জনগণের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে নি, ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছে তাদের মতো কিছু মানুষের। আর মিলাদ মাহফিল? সে-তো খুবই স্বাভাবিক, এ দেশে ১৫ আগস্ট একটি রাজনৈতিক দলনেত্রীর উৎসবমুখর জন্মদিন হয়ে যায়, ১৪ ফেব্রুয়ারিতে রাজনৈতিক নেতারাও সব ভুলে নির্লজ্জের মতো ভ্যালেন্টাইন দিবস পালন করেন! এরকম একটি দেশে কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন খুবই সম্ভব।

এবং বাস্তবে একঅর্থে তাই হয়েছে। জরুরি অবস্থাকে স্বাগত জানালেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টার শপথ অনুষ্ঠানেও দেখা গেল তাঁকে উলসিত চোখমুখ নিয়ে হাজির হতে। তাঁর প্রতিটি আচরণে মনে হচ্ছিল আওয়ামী লীগই আড়াল থেকে একটি নীরব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, জরুরি অবস্থা জারি করিয়েছে। ১৫ মার্চ ২০০৭-এ আমেরিকা যাওয়ার মুখে বিমানবন্দরে সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্রের কাজকর্মে উলসিত হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে বলে বসলেন, 'ক্ষমতায় এলে আমরা এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেব!'

১১ জানুয়ারি শেখ হাসিনার মুখে বিজয়ের আনন্দ জেগে উঠেছিল। ১১ এপ্রিল ২০০৭-এ তাঁর বিরুদ্ধে হত্যামামলার চার্জশিট দেয়া হলে হোঁচট খেলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হলো। চেষ্টা চালানো হলো তাকে বিদেশ থেকে ফিরতে না দেয়ার আর খালেদা জিয়াকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়ার। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের পাঠানো হলো কারাগারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দেবেন কী, শেখ হাসিনা এখন কারাগারের মধ্যে থেকে ফখরুদ্দিন-মইন উ আহমেদদের বদলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তাঁর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়ার সঙ্গে।

ভবিষ্যতে এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের প্রতিফলও নিশ্চয়ই পেতে হবে তাঁকে!

সুশীলায়তন গঠনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

মিলটন ফ্রিডম্যানের তত্ত্বসমূহ তাঁকে দিয়েছিল নোবেল প্রাইজ আর চিলির মানুষকে দিয়েছিল জেনারেল পিনোচেট।
- এদুয়ার্দো গালিয়ানো, ডেইজ অ্যান্ড নাইটস অব লাভ অ্যান্ড ওয়ার, ১৯৮৩।

১২ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুরের মধ্যেই এ খবর ছড়িয়ে পড়ল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন ড. ফখরুদ্দিন আহমদ। রাজনৈতিক দলগুলির এতে কোনও ভূমিকা না থাকলেও তারা ভাব দেখাতে লাগলেন, যা হচ্ছে তাদের আনুকুল্যেই হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এ প্রক্রিয়ার গূঢ় বার্তাটি ছিল খুবই পরিষ্কার : গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের কথিত সিভিল সোসাইটি নতুন দক্ষিণ এশিয়ার দুয়ার উন্মোচন করতে খোলা বাজার অর্থনীতির অনুকুল স্থিতিশীল ও ঝঞ্ঝাহীন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির যে দাবি জানিয়ে আসছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে দাবিকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার মতো সামরিক আশ্বাস, বোঝাপড়া ও সমর্থন জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন তারা। আর তারই ফল এ জরুরি অবস্থা। ড. ফখরুদ্দিন আহমদকে এই জরুরি অবস্থার ঘোড়ায় চড়ে সামাজিক বাণিজ্যবাদী সিভিল সোসাইটি আর সামরিকতন্ত্রবাদীদের বিভিন্ন সমঝোতাসূচক এজেন্ডাগুলি বাস্তবায়নের কঠিন কাজ করার জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোটি তৈরি করে দিতে হবে।

পত্র-পত্রিকাগুলি অবশ্য তেমন কোনও তথ্য দিতে পারল না ড. ফখরুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে। ডেইলি স্টারে ১৩ জানুয়ারি ২০০৭-এ ছাপা জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা গেল, মুন্সীগঞ্জে জন্ম হয়েছে তাঁর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স এবং ১৯৬১ সালে এমএ পাশ করেন তিনি। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে। কিন্তু অচিরেই তিনি কর্মক্ষেত্র বদল করেন, যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে। ঠিক কবে ইউএসএ'র উইলিয়ামস কলেজ থেকে তিনি ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্সে মাস্টারস ডিগ্রি নেন সংবাদপত্রের খবর থেকে তা পরিষ্কার বোঝার উপায় নেই। যেমন বোঝার উপায় নেই মুক্তিযুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পর তিনি কোথায় ছিলেন আর সিভিল সার্ভিসে কবে কোন পোস্টিং-এ কাজ করেছেন। তবে প্রিন্সটন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি নেয়ার থিসিসের নাম ছিল 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড এমপয়মেন্ট ইন মালটিসেক্টর মডেল : অ্যান অ্যাপলিকেশন টু বাংলাদেশ।' যা থেকে

আমরা টের পেলাম ডক্টরেট ডিগ্রি তিনি স্বাধীনতার পর করেছেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সিভিল সার্ভিসে। পরে বিশ্বব্যাংকে কাজ করেন ২০০১ সাল অবধি। ২০০১ সাল থেকেই তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ৩০ এপ্রিল, ২০০৫-এ তাঁর চুক্তি শেষ হয়। আরও পরে একটি তথ্য জানা গেল, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস থেকে তিনি অবসর নেন যুগ্ম সচিব হিসেবে।

প্রথম কয়েকদিন প্রধান উপদেষ্টা ব্যস্ত থাকলেন তাঁর উপদেষ্টা নিয়োগ করার কাজে। উপদেষ্টা পরিষদ বিন্যস্ত করলেন তিনি প্রধানত আত্মীয়স্বজন নিয়ে। এই আত্মীয়স্বজনদের অযোগ্য বলা যাবে না। তবে চক্ষুলজ্জা বলে একটি শব্দ আছে; ফখরুদ্দিন আহমদ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থকে পায়ে মাড়ালেন। কেননা শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়ার মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, সহমতে পৌঁছানোর পথে এবং ঢাল হিসেবে আত্মীয়কুলই বরং অনেক বেশি কার্যকর ও নিরাপদ। নিজের চারপাশে প্রথম থেকেই ফখরুদ্দিন আহমদ নিরাপত্তা ব্যূহ তৈরি করেন এ রকম একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে এবং দেশীয় মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে চূড়ান্ত দূরত্ব বজায় রেখে।

কালক্রমে এই উপদেষ্টাদের মধ্যে জনগণের নজর কাড়তে সক্ষম হলেন তথ্য, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, যোগাযোগ উপদেষ্টা এবং জরুরি অপরাধ দমনসংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান এম এ মতিন (অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) এবং শিল্প, বস্ত্র ও পাট, সমাজকল্যাণ এবং নারী-শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক সংস্কারের জন্যে উচ্চকিত হলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, রুইকাতলা ধরার জন্যে জাল ফেললেন এম এ মতিন আর নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে (আমি এখন মানবাধিকার নিয়ে নয়, নিজেকে নিয়ে ভাবছি) শ্রমিকদের কর্মহীন করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। এদের মধ্যে কালক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছর পূর্তির মুখে আট জানুয়ারি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এবং গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী ভদ্রভাষায় 'পদত্যাগ' করলেও এম এ মতিন (অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল)-এর ঘটেছে পদোন্নতি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে তাকে,– যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এর আগের প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাই পালন করেছেন। 'পদত্যাগ' করেছেন আরও তিনজন : আইয়ুব কাদরি, ড. এতপন চৌধুরী এবং মতিউর রহমান (মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত)। এইসব পদত্যাগের কোনওটিই সরকারকে বিপদগ্রস্ত করে নি। বরং তাদের সামরিক সুশীলায়তন গঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করেছে। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন এ এফ এস হাসান আরিফ, এ এম এম শওকত আলী, গোলাম কাদের (মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত), রাশেদা কে চৌধুরী এবং হোসেন জিলুর রহমান।

তবে যারা 'পদত্যাগ' করেছেন, তারাও ভূমিকা কম রাখেন নি। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলতে শুরু করেন, রাজনীতিকরাই দেশের সব বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী। কে বলবে, এই 'ধোয়া তুলসীপাতা'ই শেখ হাসিনার কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে তার ছেলের মনোনয়নের জন্যে! এ তো সামান্য ঘটনা, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হওয়ার আগে পর্যন্ত যে সব কলাম লিখেছেন ও বক্তব্য দিয়েছেন তার সবই ছিল জোট সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা। ২৫ মার্চের কালো রাতে হানাদার বাহিনীর আক্রমণে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ইত্তেফাক অফিসের শোক ভুলে ১৯৭১ সালের প্রায় পুরো সময়ই ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ঢাকায় থাকেন। মাঝখানে একবার লন্ডন যান, ইয়াহিয়া বা টিক্কা খানরা বাদ সাধে নি তাতে। ইত্তেফাকের ভূমিকা অবশ্য ১৯৬৯ এর ৩১ মে রাতে মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর থেকেই পাল্টে যেতে থাকে। পুড়ে যাওয়া ইত্তেফাক ছাপাতেও কোনও সমস্যা হয় নি, হানাদার বাহিনী এ সংবাদপত্রমালিকদের ওপর ছিল এতই সদয়! লন্ডনে তাঁর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। তাকে অনুরোধ করা হয় মুক্তবাংলায় এসে ইত্তেফাক ছাপানোর জন্যে। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ঢাকায় ফেরেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সঙ্গী হন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি প্রগশ-এর। ২০০৫ সালে তাকে দেখা যায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অনুষ্ঠানে। এ-হেন মানুষটিকে নিঃশব্দ সামরিক অভ্যুত্থানের পর ফখরুদ্দিন সরকার নিরপেক্ষ মানুষের সিল লাগিয়ে দিলেন!

তাই মইনুল হোসেন আকারেইঙ্গিতে জামায়াতের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রাখলেও জামায়াত নেতাদের না চেনার ভান করতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, মুজাহিদ কে? এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও না কি ১৫ জুলাই ২০০৭ গ্রেফতার হওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন! এমনকি তিনি বিদায় নেয়ার আগে আট জানুয়ারি ২০০৮-এ স্বাক্ষর করে যান ন্যাম ফ্লাটে বসবাসকারী সংসদ সদস্যদের ভাড়া মওকুফসংক্রান্ত একটি ফাইলে, যার ফলে বাংলাদেশ সরকারের বা এ দেশের জনগণের ক্ষতি হয় সাড়ে তিন কোটিরও বেশি টাকা।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন পুরোপুরি সক্রিয় হন ড. ইউনূস রাজনৈতিক দল গড়তে ব্যর্থ হওয়ার পর। গ্রামাঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে, 'হওয়া ছেলে হাসে পা দিয়ে মেরে ফেলল!' ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দলটির মৃত্যুসংবাদও ছিল অনেকটা

তাই। যদিও চেষ্টা তিনি কম করেন নি। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তাঁর রাজনৈতিক দল গঠনের কাজে কখনও বাধা দেয় নি। বস্তুত দু দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে ওঠে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পল্টন ময়দান। এই ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি খালেদা জিয়ার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবিষয়ক ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ড. ইয়াজউদ্দিনকে এ পাস দেন, তাঁর ঘোষিত নির্বাচনের পক্ষে সাফাই গান, রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন, আবার দলটির নাম ও কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা দেন সাংবাদিকদের কাছে। জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পরও ড. ইউনূসের কর্মকাণ্ড অব্যহত থাকে। যদিও তাঁর সম্পর্কে সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা নিউইয়র্কে বলেন, 'ড. ইউনূস দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার মতোই একজন রাজনৈতিক নেতা এখন।' কিন্তু বাস্তবে ড. ইউনূসের নির্লজ্জতা রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও অনেক বেশি। তাই শিক্ষকরা আপত্তি জানালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে কোনও লজ্জা পান নি তিনি!

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে জ্বালানি, খনিজ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তপন চৌধুরী সাভার সেনানিবাসে স্কয়ার গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যান। রিপোর্টাররা তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'এখন জরুরি অবস্থা চলছে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢালাওভাবে প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?' তপন চৌধুরী ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, বলেন 'এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত কিছু জানি না' (যুগান্তর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। কিন্তু ঠিক পরের দিনই আরেক উপদেষ্টা তেড়েমেড়ে উঠে জানিয়ে দেন, 'ড. ইউনূস দলীয় রাজনীতি করছেন এবং এ ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না।' তিনি এও বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো বেশ বাড়াবাড়ি করছে এবং এই বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে না।'

উপদেষ্টা, সুশীল ও সমরবিদদের এরকম পক্ষপাতিত্ব থাকলেও ড. ইউনূস নিজেই প্রতিদিন রাজনীতিক হিসেবে তাঁর অযোগ্যতাগুলি তুলে ধরতে থাকেন। তিনি এমন সব বাগাড়ম্বর দেখাতে থাকেন, যা ছিল সবার কাছেই দৃষ্টিকটূ। সামরিকতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় কোলকাতা গিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক স্টেটসম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলে আসেন, 'তারেক রহমানের বন্ধু মামুনকে ধরা হয়েছে। তাকে রাজসাক্ষী করে আরও অনেককেই ধরা হবে।' তারেক রহমান ও তার বন্ধু মামুন দুনিয়ার সেরা দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের অন্যতম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু ড. ইউনূসের মন্তব্যও ছিল আপত্তিকর। অচিরেই তিনি তা বুঝতে পারেন এবং বাংলাদেশের মিডিয়াকর্মীদের কাছে বলেন, এ রকম কোনও কথাই তিনি বলেন নি সেখানে। কিন্তু *স্টেটসম্যান* তাঁকে ছাড় দিল না, জানালো, গোটা সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা রয়েছে তাদের কাছে। ড. ইউনূস তখন ঠোঁটে কুলুপ এঁটে চুপ হয়ে গেলেন।

ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সবার কাছে হয়ে ওঠে রীতিমতো কৌতূক ও বিরক্তিকর ব্যাপার। ডেইলি স্টারে একজন পাঠক তাঁর রাজনীতিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মাত্র একটি বাক্যে লেখেন, 'তিনি তত ভালো মানুষ নন।' ২৩ ফেব্রুয়ারিতে আরও একজন লেখেন, ড. ইউনূস সম্পর্কে এতদিন ধরে জমে ওঠা তার যাবতীয় ভালো লাগা ঝরে পড়েছে। কেননা তিনি দেখছেন, বাংলাদেশের কোনও রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কেই ড. ইউনূস ইতিবাচক ধারণা লালন করেন না। এই সহজ সরল পাঠক আমাদের প্রতি একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'একবার চিন্তা করে দেখুন, দেশে এখনও পাঞ্জাবি শাসন চলছে অথচ শেখ মুজিবের মতো কোনও নেতা নেই, তা হলে পরিস্থিতিটা কেমন হতো!'

এইসব কথা ড. ইউনূস গায়ে মাখতেন কি না বলা মুশকিল। রাজনীতি নিয়ে সুপ্ত এক উচ্চাভিলাষ তাঁর বরাবরই ছিল। আর এই গভীর সংকটকালকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠার উচ্চাভিলাষ ছিল আরও প্রবল। এর আগেও বিভিন্নভাবে রাজনীতি করেছেন তিনি, যেমন এখনও সংগোপনে করে চলেছেন। ড. কামাল হোসেনদের *গণফোরাম* গঠনের সময় তিনি *আমার দল* নামের একটি উদ্ভট রাজনৈতিক দলের খসড়া প্রস্তাবনা দিয়ে নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দল গড়ার ব্যাপারে একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আনু মুহাম্মদ পুরানো সত্যটিকেই আবার তুলে ধরেন, 'তার ভেতরে শুরু থেকেই রাজনীতি ছিল। তিনি যদি কারও ত্রাণকর্তা হয়েও থাকেন সেটা গরীব মানুষের নয়।' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, 'মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে ঋণমুক্ত হওয়া। কিন্তু ড. ইউনূস বলছেন ঠিক এর উল্টো কথা। বলছেন, দরিদ্রদেরও ঋণ করার অধিকার দিতে হবে!'

রাজনৈতিক নেতা হতে না হতেই মানুষজনের কাছে খসে পড়তে শুরু করল মিডিয়ার তৈরি করা ইউনূসিয় মুখোশ। মানুষ দেখল, ঋণ করে হলেও ঘি খাওয়া উচিত,– সেকেলে এই অপরিণামদর্শী দর্শনই হলো ড. ইউনূসের প্রিয় দর্শন। এই দর্শনে তিনি দীক্ষিত করতে চাইছেন প্রতিটি মানুষকে। তাঁর স্তাবকেরা বলতে লাগল, তিনি ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক! ড. ইউনূসকে কোনও কথা বলতে শোনা গেল না স্তাবকদের এই অপপ্রচার সম্পর্কে। এদিকে থলের বেড়াল বের হতে শুরু করল। খবর এলো হিলারি ক্লিনটনদের গলায় যে দু বালিকা ফুলের মালা পরিয়েছিল, তারাও শিকার হয়েছে বাল্যবিয়ের। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়া ক্ষুদ্র ঋণের মাহাত্ম্য তাদের রক্ষা করতে পারে নি এই সামাজিক পশ্চাৎপদতা থেকে। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কে কে আত্মহত্যা করেছেন তা আবার নতুন করে আলোচিত হতে লাগল। গ্রামীণ ব্যাংকের

সাবেক এক কর্মকর্তা শহিদুল হক জানালেন, 'গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরির ১০ বছরের মাথায় স্বেচ্ছা অবসর দিয়ে দেয়া হয়। অন্য কোনওখানে এরকম অমানবিক নিয়ম নেই'। গ্রামীণ ব্যাংকেরই সাবেক এক কর্মকর্তা সরদার আমিন লিখলেন 'গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনূস' নামের একটি বই, ফলে বেরিয়ে পড়ল অজানা সব ইতিহাস।

ড. ইউনূস রাজনীতিতে নামছিলেন রাজনীতিবিদদের একহাত দেখিয়ে দেয়ার মানসিকতা নিয়ে। এতদিন তিনি ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করার বাণী দিয়েছেন। এবার তিনি বলতে লাগলেন সামাজিক বাণিজ্য হলো তাঁর রাজনৈতিক এজেন্ডা। খালেদা জিয়া, সাইফুর রহমান, তারেক রহমান আর গিয়াস আল মামুনরা এতদিন বাণিজ্য করেছেন, ড. ইউনূসরা চাইলেন তারই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বাণিজ্য,– সামাজিক বাণিজ্য। সারা জীবন ঋণের ব্যবসা করে, টেলিনরের মাধ্যমে বিদেশে কোটি কোটি টাকার মুনাফা পাচার করে ইউনূস এবার বলতে লাগলেন, দারিদ্র দূর করার জন্যে রাজনীতি করব। বলতে লাগলেন, টেলিনর মালিকানা ছেড়ে দিলে গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন হবে। বললেন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যক্তিগত মালিকানায় দরিদ্র মহিলাদের কাছে (মানে ইউনূসনিয়ন্ত্রিত দরিদ্র মহিলাদের কাছে) ছেড়ে দেয়া হোক। বললেন, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদগুলি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে সামাজিক বাণিজ্য করার মধ্যে দিয়ে আমরা দারিদ্র দূর করতে পারি, দেশের মানুষের জীবনের প্রাচুর্য আনতে পারি।

ইউনূসরা চাইলেন সামাজিক বাণিজ্যের নামে 'বগুড়ার দই' প্রত্যয়টি চিরতরে নষ্ট করে 'জিদান দই' তৈরি করতে। শ্রমঘন শিল্পকে পুঁজিঘন করতে। মাটির পাত্রের বদলে পরিবেশবিরোধী প্যাকেটজাত দই বেশি দামে কনফেকশনারিতে সাজিয়ে রাখা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আহরিত মুদ্রা 'আইনসিদ্ধ' উপায়ে বিদেশী সহ-বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দিতে। বুর্জোয়া রাজনীতিরও জনগণকে প্রয়োজন পড়ে। ড. ইউনূস চাইলেন এই সত্যকে অস্বীকার করতে। তিনি যে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন তাতে রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা হলেন রাজনীতির এপিঠ ওপিঠ। বাণিজ্যই ধ্যান তাঁর, বাণিজ্যই তাঁর জ্ঞান। জনগণ সেখানে ঋণগ্রহিতা, যার অধিকার থাকবে কেবল ঋণগ্রহণের। একই সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় ফুটে উঠল জিয়াউর রহমানদের মতোই রাজনীতিবিদদের একহাত দেখিয়ে দেয়ার মানসিকতা। তাই খোলাখুলিই বলতে লাগলেন, রাজনীতিতে নামার তাঁর কোনও ইচ্ছেই ছিল না (অবশ্য কুখ্যাত সামরিক জান্তা জিয়া ও এরশাদও তাই বলেছিলেন), সুশীল সমাজের চাপেই না কি তিনি রাজনৈতিক দল গড়ছেন! চাপে পড়ে যারা রাজনৈতিক দল গড়তে আসেন, দলের হাল তারা ধরতে পারেন না। ড. ইউনূসও পারলেন না।

তবে হাতেগোণা কয়েকদিনের এই রাজনৈতিক জীবনে ড. ইউনূস বিরল কিছু রাজনৈতিক প্রতারণা ও চরম অস্বচ্ছতার নিদর্শন রেখে গেলেন। যেমন তিনি জানালেন না কোন কোন সুশীলের কথায় পটে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক গল গড়তে এগিয়ে এসেছিলেন। জনগণের উদ্দেশে তিনি তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে বললেন, রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নপূরণ। সামাজিক বাণিজ্য যাঁর এজেন্ডা তিনি বললেন কি না মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নপূরণের কথা! তা ছাড়া তাঁর মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের তথ্যবিকৃতির সময় তাঁকে কখনও কোনও মন্তব্য করতে দেখা যায় নি। এমনকি হালে যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হন নি তিনি। এই তিনিই তখন বললেন মুক্তিযুদ্ধের কথা!

দ্বিতীয় দফার খোলা চিঠিতে ইউনূস আরও বললেন, একমাত্র তরুণ ও ছাত্রদের পক্ষেই সম্ভব পরিবর্তন ঘটানো। তিনি ছাত্র ও তরুণদেরও তাঁর দলে যোগ দেয়ার আহ্বান জানালেন। ইউনূস ভুলে গেলেন তাঁর *আমার দল*-এর ঘোষণায় ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিলেন তিনি।

সুশীল সমাজ চেষ্টা করছিল দু নেত্রী ও তাদের পারিবারিক সদস্যদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে, রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রীয় করে নিজেদের একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে। *প্রথম আলো*তে জোরেশোরেই প্রশ্রয় ও প্রচার করা হচ্ছিল *মাইনাস টু* তত্ত্ব। *আমাদের সময়*এর সম্পাদক লিখলেন, 'প্রিয় খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সমীপে, আপনাদের সামনে রেখে দুষ্ট রাজনীতি আর নয়।' কিন্তু এইসব আহ্বান কল্কে পাচ্ছিল না। এদিকে সময় ফুরিয়ে আসছিল। সুশীল সমাজ ও সামরিকতন্ত্রের মধ্যে যে আপাতসমঝোতা হয়েছিল তাতেও ছন্দপতন ঘটছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ সার্ক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে দিলী গেলে সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জে. মইন উ আহমেদ একটি সেমিনারে ভাষণ দিয়ে সামরিক বাহিনীর মনোভাব জানিয়ে দিলেন। এক মাস পর ৩ মে ড. ইউনূস প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করলেন। পরের দিন দেশের মানুষ তাঁর সম্পর্কে দুটি কথা জানতে পারল। প্রথমত, তিনি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। দ্বিতীয়ত, নোবেল পুরস্কার হিসেবে পাওয়া তাঁর প্রায় ১০ কোটি টাকার কর সরকার মওকুফ করেছেন। ১৯ এপ্রিল তিনি এই কর দাবি না করার অনুরোধ জানিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

ড. ইউনূস তাঁর খোলা চিঠিতে দেশের মানুষকে জানালেন, "...যারা আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন তারা নিজেরা রাজনীতিতে আসবেন না, প্রকাশ্যে সমর্থনও দেবেন না, যেহেতু তাদের প্রত্যেকের নানারকম অসুবিধা আছে। আর যারা

রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। অন্ততঃ এখন আসবেন না। পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তখন আসবেন। আমি রোজ হিসেব মিলিয়ে দেখেছি জমার ঘরে আমার খুব বেশি থাকছে না। তাহলে আমি জোরালো টিম বানাবো কাদের নিয়ে?" সত্যিই তো! ড. ইউনূস দৈনিক ঋণ দেন, দিনের শেষে কত টাকা ঋণ দেয়া হলো, কত টাকার সুদ এলো সেই হিসেব রাখেন, রাজনীতির হিসেব তিনি কীভাবে মেলাবেন? তাঁর গ্রামীণ ব্যাংককর্মীরা ঋণ আদায় করার জন্যে যা করে রাজনীতির জমার ঘর তো আর সেই ভাবে ভরাট করা সম্ভব নয়! রাজনীতিকদের রাষ্ট্র ও সরকারের রোষানলে পড়তে হয়, জেলে যেতে হয়, সন্ধ্যা বেলা রাস্তা তৈরি করে রাতে ঘুমিয়ে সকালে উঠে জানতে হয় রাস্তা ভেঙে গেছে, আবারও বানাতে হবে নতুন করে। ড. ইউনূসের মতো ক্ষুদ্র ঋণ ও সামাজিক ব্যবসায়ীর পক্ষে কি সম্ভব রাজনীতিকদের মতো এ সব ধকল সামলানো? ফ্রিডম্যানদের আশীর্বাদে তাঁর চোখে স্বপ্ন জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সেই স্বপ্নের ধকল যে এত বেশি তা কি তিনি জানতেন?

অতএব তিনি সরে গেলেন রাজনীতি থেকে।

তবে রাজনীতি থেকে আপাতদৃষ্টিতে সরে গেলেও বিশেষত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ড. ইউনূসের উপযোগিতা এখনও শেষ হয় নি। প্রতিটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকটকালেই বিশ্বপুঁজিবাদের প্রয়োজন হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সঙ্গে বাদরামি করার উপযোগী অর্থনৈতিক তত্ত্বের। ষাটের দশকে সে তত্ত্বের জন্যে বিশ্বপুঁজিবাদ ভর করেছিল উন্নয়নবাদীদের ওপরে। আর এখন তারা ভর করেছে সামাজিক বাণিজ্যবাদী ও তাদের জনক ড. ইউনূসের ওপরে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে তারা স্বপ্ন দেখাতে চাইছে, সামাজিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই সম্ভব দারিদ্র দূর করা! তবে বাজারের পাছাটা উদলো করে দিতে পারলেই কেবল সম্ভব এই সামাজিক বাণিজ্য করা। ড. ইউনূস তাঁর এই দুর্দান্ত প্রতিভার জন্যে পেয়েছেন নোবেল প্রাইজ, কিন্তু এই প্রতিভা আমাদের জন্যে ডেকে এনেছে দীর্ঘমেয়াদী এক জরুরি অবস্থা।

মুক্তিযুদ্ধ, সামরিকতন্ত্র ও ইতিহাসের সংস্কার

সকলেই এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছিল। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না বলেই সরকার পরিবর্তনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়। ...ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ...সেনাবাহিনী জনগণের জন্য সুযোগের স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছে।

- শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণে খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ১৯৭৫।

আমাদের রাজনীতিবিদরা শুধু দেশকে বিভক্তই করে গেছেন...
সেনাবাহিনী দেশ চালাচ্ছে না। আমাকে প্রমাণ করতে দিন, সেনাবাহিনী আসলেই দেশ চালাচ্ছে না...
আমি রাষ্ট্রপতি হবো না সে কথা বলি নি। বলেছি, রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার...

- বিভিন্ন সময় মইন উ আহমেদ, জেনারেল ও সামরিক বাহিনী প্রধান ২০০৭।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা যা করছেন তার জন্যে এ দেশবাসীর তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

- বিবিসি বাংলা বিভাগের সংলাপ অনুষ্ঠানে মইনুল হোসেন, ব্যারিস্টার ও উপদেষ্টা, এপ্রিল ২০০৭।

সুশীলরা তাদের রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। ছিঁড়ে গেল শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখোশের একপাশ। তারা এবার নিয়ে এলেন সংস্কারের চমক।

রাজনীতিতে নতুন ধারা আনার নামে অনেকেই অনেক চমক দেখান। ১৯৬৮ সালের ২৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট হামফ্রে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়ার সময় বলেছিলেন 'দি পলিটিক্স অব হ্যাপিনেস, দি পলিটিক্স অব পারপাস, দি পলিটিক্স অব জয়'-এর কথা। সেটি ছিল মার্কিন রাজনীতির এক জটিল সময়। তাঁর ওই ঘোষণার ঠিক তিন সপ্তাহ আগেই গুপ্তহত্যার শিকার হন মার্টিন লুথার কিং, অন্যদিকে দেশের মধ্যে তখনও চলছে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা। আবার এ ঘোষণা দেয়ার ঠিক ছয় সপ্তাহের মাথাতে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছিলেন ববি কেনেডি। রিগান ঘোষণা দিয়েছিলেন 'নিউ মনিং অব আমেরিকা'র। তারপর বিল ক্লিনটন ঘোষণা দিয়েছিলেন 'ব্রিজ টু টুয়েনটিওয়ান সেঞ্চুরি'র।

বাংলাদেশেও কখনও সবুজ বিপব, কখনও দ্বিতীয় বিপব, কখনও আবার খালকাটার বিপবের কথা শোনা গেছে। এইভাবে বিপব শব্দটিকে হাস্যকর করে তুলে বলা হয়েছে নতুন বাংলাদেশ-এর কথা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও সেরকম চমক দেখালেন। বিক্ষিপ্ত মধ্যশ্রেণি আর সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা

আড়াল করা এবং কর্পোরেট কালচারের উপযোগী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি গড়ে তোলা,– এসব লক্ষ্য পূরণের জন্যে সামরিকতন্ত্র পরিচালিত ফখরুদ্দিন সরকারের রাজনৈতিক কর্তব্য দাঁড়ালো সংস্কার করা আর অর্থ নৈতিক কর্তব্য দাঁড়ালো দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা! একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বললেন, 'যে রাজনীতি দেশে সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে সেই রাজনীতির শীর্ষ ব্যক্তিদের নিজ থেকেই সরে যাওয়া উচিত।' এপ্রিল ২০০৭-এ বিবিসি'র বাংলা বিভাগের সংলাপ অনুষ্ঠানে আরও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় তিনি বললেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা যা করছেন তার জন্যে এ দেশবাসীর তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!' এ দেশে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এইভাবে কাউকে দেশবাসীর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা দাবি করতে দেখা যায় নি। না মহাজনী ঋণবিরোধী আন্দোলনের নেতা ফজলুল হককে, না গণঅভ্যুত্থানের প্রাণপুরুষ মওলানা ভাসানীকে, না মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে। কিন্তু শৈবালদের পক্ষে সম্ভব উচ্চকণ্ঠে দীঘিকে একবিন্দু শিশির দেয়ার কথা স্মরণ করাতে পারা। তেমনি ব্যারিস্টার মইনুলদের পক্ষেও সম্ভব হলো দেশবাসীকে কৃতজ্ঞ থাকতে বলা।

রাজনৈতিক দল গড়তে ব্যর্থ হয়ে সুশীল সমাজের নীতিনির্ধারকরা মরিয়া হয়ে উঠলেন পুরানো রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দিয়েই কথিত রাজনৈতিক সংস্কার ঘটাতে। অন্যদিকে সামরিকতন্ত্র চাইল এই কথিত রাজনৈতিক সংস্কারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। পুরো রাজনৈতিক খেলাটিই শুরু হলো মৌরিতানিয়ার মডেলে। পার্থক্য ছিল শুধু এ টুকুই যে মৌরিতানিয়ায় সামরিক বাহিনী সামরিক নেতাদের নিয়ে কথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করেছিলেন, আর বাংলাদেশে এই পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো কথিত সুশীলপ্রতিনিধিদের নিয়ে।

রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে সামরিক ও সুশীল প্রতিনিধিরা চাইলেন বিভিন্ন নেতাদের এক পালায় তুলে কথিত জাতীয় ঐক্যের একটি মডেল দাঁড় করাতে, দু নেত্রী তথা 'পরিবারতন্ত্র'কে রাজনীতি থেকে বিদায় করতে এবং সংস্কারের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এমন একটি পাটফর্ম দাঁড় করাতে যা সামরিকতন্ত্রের এইসব কাজকে বৈধতা দেবে। অতএব শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, ওসমানী আর জিয়াউর রহমানকে জাতীয় ঐক্যের কাণ্ডারি বানানোর চেষ্টা চালালেন তারা। দু নেত্রীই যেহেতু 'জাতির সকল বিপর্যয়ের মূল' সেহেতু একই কারাগারের এদিকে আর ওদিকে রাখা হলো শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়াকে। শিক্ষকদের মৌন মিছিল হয়ে গেল 'রাজ নৈতিক অপতৎপরতা'; খালেদা জিয়ার টেলিকনফারেন্স আর সংস্কারবাদীদের কাউন্সিল ও নতুন দল গঠনের প্রচেষ্টার প্রতি ঝরতে লাগল সুপ্রসন্ন মৌন আশীর্বাদ।

অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জোরদার করল, শুরু হলো যে কোনও উপায়ে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের কাজ। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হলো, রাজনৈতিক নেতা আর দলগুলোই এ দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন এবং তাদের শাস্তি দিয়ে সংস্কারবাদী রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব একটি দুর্নীতিমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

কখনও নতুন রাজনৈতিক দল, কখনও জাতীয় সরকার, কখনও আবার রাজনৈতিক সংস্কার,– সামরিক ও সুশীল প্রতিনিধিদের বিভিন্ন নামে ডাকা একই ধরনের উদ্যোগকে সর্বজনীন অবয়ব দেয়ার জন্যে সরকার চেষ্টা করলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে কর্পোরেট মেশিনে তৈরি করা ধারণা গেলাবার। সত্যিকার অর্থে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে নতুন এক সন্ত্রাস। সাত নভেম্বর ১৯৭৫-এ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তান মডেলের রাষ্ট্রবাদী মুক্তিযোদ্ধারা নিজস্ব ধাঁচের জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই জাতীয় সংহতিই যথেষ্ট ছিল না। ৩০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র বুঝতে পারছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে এবং জিয়াউর রহমানকে কাণ্ডারি বানিয়ে এ রাষ্ট্রের ইতিহাস দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাই শুরু হলো ইতিহাসে শেখ মুজিবকে আত্মীভূত ও দখল করে রাজ নৈতিক মেরুকরণের নতুন প্রচেষ্টা। সঙ্গতকারণেই এই শেখ মুজিব নতুন এক শেখ মুজিব, যিনি আর ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রবাদী নন। তিনি এক ধর্মমনা রাষ্ট্রনেতা, যিনি 'সেক্যুলারপন্থীদের খপ্পরে পড়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্ত করেছিলেন'। *আমাদের সময়*এ খবর বের হলো, আগামী ১৭ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে যাবেন। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমে এ খবর অস্বীকার করা হলেও পরে জানালো হলো প্রধান উপদেষ্টা ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধীস্থলে এবং ৩০ মে জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন। শুরু হলো সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্রের 'নিরপেক্ষতার' রাজনীতি। আর আবারও সে রাজনীতির প্রথম বলি হলেন মুক্তিযুদ্ধের একক ও অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে প্রধান উপদেষ্টার বাণীতেও এই 'নিরপেক্ষতার' রাজনীতি করা হলো। তবে খালেদা জিয়ার দুর্ভাগ্য, তাঁর সাবেক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবিষয়ক ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ড. ইয়াজউদ্দিন তাঁর বাণীতে কেবল শেখ মুজিবুর রহমানের নামই উলেখ করলেন। জিয়াউর রহমানের নাম উচ্চারণ করতে ভুলে গেলেন। অবশ্য কোনও এক অজানা কারণে উদ্বেলিত হয়ে এই বাণীতে উলেখ করলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কথা,– যিনি তখন রাজনৈতিক নেতা হওয়ার

জন্যে জাতির উদ্দেশ্যে বার বার চিঠি লিখছেন। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের মঞ্চে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান আর লে. জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর প্রতিকৃতি পাশাপাশি রেখে নির্দেশনা দেয়া হলো এরা আমাদের জাতীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের নেতা। ২৭ মার্চ নবম পদাতিক ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আয়োজিত প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত সমাবেশ ও চা-চক্রে সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল মইন উ আহমেদ বললেন, যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার করা হবে। জাতীয় নেতাদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আত্মহারা হলো।

সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মইন উ আহমেদ আরও বললেন, ''ভেবে দেখুন, আমরা আমাদের জাতির পিতাকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে পারিনি। আর আমাদের যে বিভিন্ন শীর্ষ নেতা আছেন, তাদেরও আমরা স্বীকৃতি দিতে পারিনি। আমাদের রাজনীতিবিদরা শুধু দেশকে বিভক্তই করে গেছেন। একত্র করার চেষ্টা করেননি এবং করতে পারেনওনি। তাই সময় এসেছে, আমরা একসঙ্গে করে দেশকে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার (সমকাল, ২৮ মার্চ ২০০৭)।'' এই কথাগুলি বলার সময় তার একবারও মনে হলো না, 'জাতির পিতা'র প্রতি প্রথম রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর একাংশ। সামরিক জান্তা জিয়াউর রহমানই প্রথম সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করেন যার ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এও এক রাজনীতি বটে, কিন্তু সেই রাজনীতির পরিকল্পক ও নির্ধারক শক্তি ছিল সামরিক বাহিনী ও সামরিক শাসন। ক্ষমতা হাতে থাকলে জনগণকে অনেকভাবেই ভেবে দেখার কথা বলা যায়, নির্দেশ দেয়া যায়। কিন্তু ১১ জানুয়ারি ডেকে আনল জাতির সবচেয়ে অন্ধকারতম সময়। কেননা বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনীতিক সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তার এইসব অমীয় বাণী।

দুই এপ্রিল ২০০৭-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির আঞ্চলিক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ 'দ্য চ্যালেঞ্জিং ইন্টারফেস অব ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড সিকিউরিটি' উপস্থাপন করতে গিয়ে লে. জেনারেল মইন উ আহমেদ যা যা বললেন তাতে আবারও আনন্দের ঢেউ উঠল। তিনি বললেন বটে, কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করবে সে মারা গেছে; কিন্তু যেসব কথা বললেন, তাতে মনে হলো মারা গেলেও কাদম্বিনী তার প্রতিচ্ছায়া ও অপচ্ছায়া রেখে যেতে চায়। পুরোপুরি রাজনৈতিক কথাবার্তাই বললেন তিনি সেখানে। বললেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে। বললেন, ধর্মকে রাজনীতিতে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে রাজনীতির নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সুশীল সমাজের তো বটেই, রাজনৈতিক নেতাদের কেউও প্রশ্ন তুললেন না, সেনাপ্রধানের কি অধিকার আছে এ রকম বক্তব্য রাখার? জরুরি অবস্থা থাকলেও কি কোনও সেনাপ্রধান পারেন কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে? আমলাদের যেমন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার কোনও অধিকার নেই, তেমনি সশস্ত্র বাহিনীর কারও অধিকার নেই রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার। অধিকার নেই সরকারি বেতনভোগী কারও। কিন্তু তারা এই প্রশ্ন তুললেন না। বরং হাততালি দিতে লাগলেন। 'অতীতকে ফিরিয়ে আনা যাবে না' শিরোনামে সম্পাদক মতিউর রহমান লিখলেন, '১১ জানুয়ারির পর জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশে যেসব বড় পরিবর্তন হয়েছে ও হতে যাচ্ছে, এর কৃতিত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তবে আমরা এটাও দেখেছি, এই উদ্যোগগুলোর ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর সমর্থন ও একটি অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, যা এসব পরিবর্তনের সহায়ক হচ্ছে। তাই তারাও এ কৃতিত্বের অংশীদার। সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জে. মইন উ আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী সত্যিই এ সময়ের মধ্যে একটি লাইনচ্যুত ভারী ট্রেনকে পুনরায় লাইনে টেনে তুলতে সহযোগিতা করছে সেনাবাহিনী (প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল)।' আর যোগাযোগ উপদেষ্টা এম এ মতিন (অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল)-কে বলতে শোনা গেল, 'সেনাপ্রধান রাজনৈতিক বক্তব্য দিলেও তা দেশের স্বার্থেই দিয়েছেন। সে কারণে তা দেশে বিদ্যমান জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশের পরিপন্থী নয় (সমকাল, ৪ এপ্রিল ২০০৭)।'

সামরিক বাহিনীপ্রধান সংবিধান সংশোধনের দাবিও তুললেন। মুহাম্মদ ইউনূস মে ২০০৭-এ রাজনৈতিক দল গঠনে অপারগতার ঘোষণা দেয়ার পর এ দাবি আরও জোরদার হলো। ১০ জুলাই বিআইপিএসএস এবং আমেরিকান সেন্টার আয়োজিত 'ডেমোক্র্যাটিক একাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড ওয়ে টু কার্ব করাপশন' সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি জানালেন, 'সুশাসনের জন্যে সংস্কার অপরিহার্য এবং দরকার হলে সংবিধানও সংশোধন করতে হবে। ...দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ একটি আনুষ্ঠানিক নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। সে সরকার কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করছে তার প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই (যুগান্তর, ১১ জুলাই ২০০৭)।' বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'সেনাবাহিনী দেশ চালাচ্ছে না। আমাকে প্রমাণ করতে দিন, সেনাবাহিনী আসলেই দেশ চালাচ্ছে না (যুগান্তর, ১২ জুলাই ২০০৭)।

তারপর আমাদের সামনে প্রমাণিত হতে লাগল, সেনাবাহিনী সত্যিই দেশ চালাচ্ছে না! তবে দেশ না চালালেও তারা মনে করে, '৩৬ বছরের জঞ্জাল সরাতে দু বছর যথেষ্ট নয়।' প্রধান দু দলের নেতারা আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে

লাগলেন, 'আমরাও সংস্কার চাই, আমরাও চাই... ।' আর বামপন্থী নেতারা আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া দূরের কথা, জামায়াত নেতারা কেন গ্রেফতার হচ্ছে না তাই নিয়ে চিন্তিত হতে লাগলেন। সেনাপ্রধান ২৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত গোবাল বাংলাদেশ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিলেন। বললেন, 'তাদের (হাসিনা ও খালেদা) মধ্যে কেউ একবার কেউ দুবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দুর্নীতিসংক্রান্ত সাম্প্রতিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা গেছে, তারা উভয়ে দেশকে সম্পূর্ণ দুঃশাসন দিয়েছে। সে কারণে আমি সত্যিই ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে জানতে চাই যে, এই জাতি এভাবে পালাক্রমে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও সমাজে সংগঠিত অপরাধ সংঘটনের এত বড় সুযোগ কি কখনও কাউকে দিয়েছিল? বাংলাদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ধারণ করবে (আমাদের সময়)।

কিন্তু না, বাস্তবে জনগণ নয়, হাসিনা-খালেদার ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগল সামরিকতন্ত্রই। যার হাত ধরে এদেশে সামরিকতন্ত্র প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, সেই জিয়াউর রহমানের পরিবারের প্রতি অবশ্য সামরিকতন্ত্র কৃতজ্ঞই থাকতে চেয়েছিল; কিন্তু একটানা ৩০ বছর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সামরিকতন্ত্রের আনুকূল্য পেতে পেতে জিয়া পরিবার সামরিক বাহিনীকে বাপ-দাদার সম্পত্তি ভাবতে শুরু করেছিল বলে খালেদা জিয়া এবারও সাহস পেলেন 'আপোষহীন' হয়ে ওঠার এবং সামরিকতন্ত্র বাধ্য হলো খানিকটা কৃতঘ্ন হতে। অতএব তাকেও শেষ পর্যন্ত কারাগারে যেতে হলো। সামরিকতন্ত্রের একটি অংশ আবার এ পদক্ষেপকে খালেদা জিয়ার ভাবমূর্তি উদ্ধারের ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে মেনে নিলেন। সাঈদা ইস্কান্দার তাই বুকে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু খালেদা জিয়া স্থান পেলেন উপ-কারাগারে। সংবিধান সংশোধনের দাবি আর জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আলোচিত হতে লাগল। দুটি বিষয়ই ছিল স্পর্শকাতর। কারণ সংবিধান সংশোধনের কথা উঠল রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে। দেশে অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ আছেন, কিন্তু সেনাপ্রধানই আগবাড়িয়ে রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার সমতা নিয়ে চিন্তিত হলেন।

অনেকে তা সমর্থনও করলেন। সাবেক সচিব আকবর আলী খান বললেন, 'ব্রিটেনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টল চার্চিল বলেছিলেন, যুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা শুধু সেনানায়কদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে আমিও বলতে চাই, গণতন্ত্র এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এর সব দায়দায়িত্ব শুধু রাজনীতিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। সমাজের সব স্তরের মানুষের এতে অংশগ্রহণ থাকা দরকার। আমি মনে করি, গণতন্ত্র নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার। বর্তমান সরকার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা নিয়েছে। সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ যে বক্তব্য দিয়েছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই। ...সংবিধান পরিবর্তনের জন্যে কমিটি বা কমিশন করে এখনই আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে (প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০০৭)।' হয়তো সাবেক সচিব ঠিকই বলেছেন; হয়তো কর্তব্যরত আমলা ও সামরিক কর্মকর্তারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন, কিন্তু জনগণ কি এতই বোকা যে বুঝবে না, মাইক বেধে সাংবাদিক ডেকে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার অধিকার তাদের আছে কি না!

জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রসঙ্গও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যেমনটি মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল বলেছেন, গণতন্ত্র দুর্বল অবস্থায় থাকলে এ ধরনের নিরাপত্তা কাউন্সিল কেবলই ক্ষমতাসীনদের পক্ষে আর জনগণের বিপক্ষে যেতে থাকে। গণতন্ত্র দুর্বল থাকলে রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না জনগণের অংশীদারিত্ব, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি ইতিবাচক একটি পর্যায়ে রাখা। ফলে ক্ষমতাসীন আর জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে এবং এই জাতীয় কাউন্সিল এই দ্বন্দ্ব দূর করতে পারে না বরং জনগণের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে জনগণকে বেকায়দায় ফেলে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকেও 'সংকট তত্ত্বে'র কাজে লাগানো হলো। আগস্টে বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতাকে সামনে রেখে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ আরও সামনে চলে এলেন। শুধু বাংলাদেশের মতো দেশেই নয়, খুব উন্নত দেশগুলিতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা থাকে। আর তা বেসামরিক ও রাজনৈতিক সরকারই নির্ধারণ করে থাকেন। কিন্তু মইন উ আহমেদ রাজনীতিকদের প্রতি করুণার বাণী বর্ষণ করলেন, 'বাংলাদেশ এখন পাবিত। সেনাবাহিনী বা সরকারের একার পক্ষে বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। জরুরি অবস্থার মধ্যেও রাজনীতিবিদদের বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে কোনও বাধা নেই।' তিনি অভিযোগ তুললেন, জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বন্যার্তদের পাশে না দাঁড়িয়ে সরকারকে 'নাজেহাল' করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারপর ঘিওরের পেচারকান্দায় রীতিমতো অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন, 'একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক আছেন, যারা হোটেল সোনারগাঁ ও শেরাটনে বসে বন্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা করেন ও বুদ্ধি দেন। পরামর্শ দেয়া বাদ দিন, বন্যাদুর্গত এলাকাতে আসুন, দেখুন মানুষ কত দুর্ভোগ পোহাচ্ছে (প্রথম আলো, ০৫ আগস্ট)।'

আগস্টের গণবিক্ষোভের রাশ টেনে ধরার পর সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র তার সুশীলমনস্কতা ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হলো। সেনাপ্রধানের বাণীপ্রদান আর সেমিনার, প্রবন্ধপাঠ ও ত্রাণতৎপরতায় সীমিত থাকল না। সুবর্ণ নীরবতার মাধ্যমে সেসব বাণীকে বৈধতা দিতে লাগল উপদেষ্টা পরিষদ। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান

উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদও উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন সেনাবাহিনীর। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র পাকিস্তানে যখন গণউত্থানের ভয়ে সামরিকতন্ত্র পালানোর পথ খুঁজছে, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিলেন, জনগণ নয়, সরকারের ক্ষমতার উৎস সেনাবাহিনী। আর সেনাবাহিনী পাশে থাকায় তারা খুবই উল-সিত ও পরিতৃপ্ত, জনগণ তাদের সঙ্গে না থাকলেও কোনও সমস্যা নেই।

সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের একচেটিয়া বাণীবর্ষণ প্রথম বাধা পেল অক্টোবর ২০০৭-এ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর। তার আগে এমনকি যুক্তরাজ্যেও তিনি ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। সিলেটিঅধ্যুষিত লন্ডনে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা পেতে তাঁর কোনও সমস্যা হয় নি। সামান্য সমস্যা হয় মাত্র একটি বিষয় নিয়ে। লন্ডনের বাঙালি সম্প্রদায়ের পত্রিকাগুলি, তা ছাড়া দেশের সংবাদপত্রগুলিও তাঁর একটি ভাষ্য ছাপে : 'আমি রাষ্ট্রপতি হব না। হলে আরও আগেই হতে পারতাম।' মইন উ আহমেদ এই বক্তব্য সংশোধন করলেন; প্রকারান্তরে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হতে পারে, তার সামান্য আভাস দিলেন। তিনি জানালেন, 'আমি রাষ্ট্রপতি হবো না সে কথা বলি নি। বলেছি, রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।' এর অর্থ খুবই পরিষ্কার, 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের ডাকে আমাকে রাষ্ট্রপতি করা হলে সেটি হতে কোনও অসুবিধা নেই আমার।' দেশে এখন বেশ কিছু কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার 'সমতা' বিধানের আইনি রূপরেখা তৈরি করছেন এবং তার সঙ্গে এই উক্তির কোনও যোগ নেই মনে করা মোটেও ঠিক হবে না।

লন্ডনে মইন উ আহমেদ আরও একটি কথা বললেন, যেরকম কথা সামরিক কর্মকর্তারা বলেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষক আনোয়ার হোসেনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়। তিনি বললেন : 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করলে আমার দুঃখ লাগে।'

এ রকম তুলনা সত্যিই অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরাও চাই না এ ভাবে কেউ তুলনা করুক। কিন্তু সেই না-চাওয়াটা তখনই বাস্তব হয়ে উঠবে যখন সশস্ত্র বাহিনীও বুঝতে পারবেন, এ ধারণার জন্ম হলো কেমন করে। কেন মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠার পরও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তারা একের পর এক সফল ও ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে এই তুলনার যৌক্তিকতা। আমরা কি মুক্তিযুদ্ধ শুধু মাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে করেছিলাম, না কি সামরিকতন্ত্র ও ধর্মজ রাজনীতির বিরোধিতার জন্যেও করেছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর সামরিক কর্মকর্তাদেরও জানা আছে, কিন্তু তারপরও এ দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে! স্বাধীনতার পরও শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশসমান। সাত মার্চ ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট কারচুপিকে তিনি প্রশ্রয় না দিলেও পারতেন। কিন্তু তারপরও ওই নির্বাচনে কারচুপি করা হয়। আওয়ামী লীগ সারা দেশের মোট প্রদত্ত (৫৫.৬২ শতাংশ) ভোটের ৭৩.২ শতাংশ ভোট পায়। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, এ রকম কারচুপির রাজত্বেও ক্যান্টনমেন্টগুলিতে সেনাদের দেয়া ভোটের ৮০ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছিল আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে! (অ্যান্থনী ম্যাসকারনহাস-এর বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ অনুবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স পুনর্মুদ্রন ২০০০ সাল, পৃষ্ঠা ২৬)। মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

সেনাপ্রধান হিসেবে মইন উ আহমেদ শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানকে এক পালায় তুলে জাতীয় নেতার স্বীকৃতি দিতে চাইছেন। কিন্তু কেন? মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যে দেশে জাতীয় নেতার স্বীকৃতি পান না, সে যুদ্ধের একজন সামরিক কর্মকর্তা কীভাবে জাতীয় নেতা হন? বিশেষত তিনি যখন ক্ষমতা নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পাওয়া সংবিধানে ছুরি চালান? ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান এক সাক্ষাৎকারে ম্যাসকারনহাসকে বলেছিলেন, 'আমরা সত্যিকার অর্থে কোনো সেনাবাহিনী ছিলাম না। কাগজপত্রে আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেনাবাহিনীর জন্য আইনগত কোনো ভিত্তি ছিল না। টেবল অব অর্গানাইজেশন অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট বলে কিছু ছিল না। সবই ছিল 'এডহক'। সেনাবাহিনী বেতন পেত। কারণ শেখ মুজিব তা দিতে বলেছিলেন। মুজিবের মুখের কথার ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল।' জিয়াউর রহমানের এই কথাতেই বোঝা যায় কোন জিকির তুলে মুজিবকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তার পক্ষে।

সেনাবাহিনী বার বার অভ্যুত্থান করেছে আর বলেছে, গণতন্ত্রের স্বার্থেই তা করা হয়েছে। শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী লীগই রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল, এই বিবেচনাবোধ থেকে অনেকেই আজকাল দাবি করেন, শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগই হত্যা করেছে! অথচ খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেয়ার পর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন : 'সকলেই এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছিল। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না বলেই সরকার পরিবর্তনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়। ...ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ...সেনাবাহিনী জনগণের জন্য সুযোগের স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছে।' কারও কি বুঝতে অসুবিধা হয় এই বক্তব্য?

১৫ আগস্ট-এর পরদিন এখন যিনি তথ্য ও আইন উপদেষ্টা, সেই ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'গতকাল ছিল গতানুগতিক জীবনধারার একটি ব্যতিক্রম। চলার পথে শক্তি সঞ্চয়ের দিন। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন। দেশের প্রবীণ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে

সেনাবাহিনী দেশের ভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যুষে বেতারে এই ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটি আকাঙ্ক্ষিত সূর্য-রাঙা প্রভাত দেখিতে পায়।' আমাদের সেনাবাহিনী কি কখনও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই ঘটনার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করেছে? করে নি, কারণ করলে অভ্যুত্থানকারী সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার করতে হবে। ১৫ আগস্টের মাত্র ৫ দিন পর ২০ আগস্ট সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। বিমান বাহিনীর প্রধান এ কে খোন্দকার ১৭ আগস্ট বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করেছিলেন অথচ জিয়াউর রহমান ২৪ আগস্ট বিশেষ কোনও তাড়নায় চিফ অব আর্মি স্টাফ হয়েছিলেন! তিন অক্টোবর এক বেতার ভাষণে খোন্দকার মোশতাক কি বলেন নি শেখ মুজিবের খুনিরা 'সেনাবাহিনীর সাহসী সূর্যসন্তান?'

সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ শেখ মুজিবকে স্বীকৃতি দিতে চান, কিন্তু চান গুটিকয়েক সেনাকর্মকর্তার ভূমিকাকে ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে চাপা দিতে! তিনি কি একবারও বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা ও স্থপতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি বরং নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে? তিনি কি একবারও বলেছেন, হত্যাকারীদের দলে সেনা কর্মকর্তারাও ছিল এবং এই সেনা কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর কলংক?

এ রকম বলা দূরে থাক, তিনি বার বার শেখ মুজিবকে উপস্থাপন করেছেন জিয়ার সমান্তরালে। সামরিকতন্ত্রের জোরে এদের দু'জনকে পাশাপাশি স্থাপন করে জাতীয় ঐক্যের মঞ্চ তৈরি করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সেমিনারে তাঁর উপস্থিতিতেই আতাউর রহমান বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমানের নাম পাশাপাশি রাখা উচিত।' কেউই সেদিন তার এ কথার প্রতিবাদ বা সমালোচনা-আলোচনা করে নি।

বাইরে থেকে সেনাবাহিনীর জোরে রাজনৈতিক সংস্কার চাপিয়ে দিলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিধারায় কী ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুরস্ক। এখনও সেখানে সেক্যুলারিজমকে বাঁচানোর জন্যে সেনাবাহিনীকে অস্ত্র বাগিয়ে ধরতে হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীকেও বার বার হুংকার ছাড়তে হয়, তবে তা সেক্যুলারিজমকে হটিয়ে দিতে। ২ এপ্রিল মইন উ আহমেদও অত্যন্ত নম্র স্বরের আড়ালে সেই হুংকার দেন, ধর্মকে রাজনীতিতে যুক্ত করার মাধ্যমে রাজনীতির নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার কথা বলেন তিনি। অথচ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের তা চোখেই পড়ল না। তারা পুলকিত হলেন, উলসিত হলেন শেখ মুজিব ইতিহাসে স্বীকৃতি (!) পাচ্ছে দেখে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, নৈতিক শিক্ষার সূত্রগুলি তো ধর্মের কাছ থেকেই পাই আমরা; তা হলে মইন উ আহমেদ কী এমন দোষ করেছেন ধর্ম দিয়ে রাজনৈতিক নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার কথা বলে? না, খোলা চোখে কোনও দোষই চোখে পড়ে না। কিন্তু তার এই কথার সঙ্গে পার্থক্য কোথায় জামায়াতে ইসলামীর কথায়? জামায়াতে ইসলামী একই কথা বলাতে আপত্তি করি কেন আমরা? আমরা তো জানি, যেমনটি বলেছেন প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "প্রকৃত ধার্মিকতায় আধ্যাত্মিকতা থাকে, সেখানে পরিচ্ছন্নতা পাওয়া যায়; কখনো কখনো তা মরমীবাদ হয়ে ওঠে বটে, তবে প্রায়শঃ মানুষের প্রতি বিদ্বেষ না জাগিয়ে ভালোবাসা জাগায়। প্রকৃত ধার্মিকের গুণ এগুলো। তিনি অন্যকে করুণা করতে পারেন, কিন্তু ঘৃণা করেন না। অন্যের ওপর নিজের মত চাপাতে যাবেন– এ আগ্রহ গড়ে উঠলেও তাকে তিনি দমন করেন।" তা হলে আপত্তি কোনখানে? আপত্তি এখানেই, রাজনীতির এই ধর্মচর্চা বুর্জোয়াদের ধর্মচর্চা। ধর্মব্যবহারকারীদের ধর্মচর্চা। এই ধর্মচর্চায় ধার্মিকতা নেই। ম্যাক্সওয়েবারের একটি দারুণ সামাজিক গবেষণা আছে, ইউরোপে পুঁজিবাদের শুরুতে সামাজিক বিকাশে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপরে। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। ধর্মকে এখন রাজনীতিকরা ব্যবহার করছেন সামাজিক বিকাশ প্রতিহত করতে। মানুষকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে নয়, ধর্মকে রাজনীতিকরা ব্যবহার করছেন রাজনৈতিক অপকর্মকে জায়েজ করতে, মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসনের জালে ফেলতে। কাজেই ধর্মের স্বার্থেই প্রয়োজন ধর্মকে রাজনীতিকে দূরে রাখা, যেমনটি করা হয়েছিল গণতান্ত্রিক ধারণা বিকাশের পুঁজিবাদী পর্বে। রাজনীতিতে ধর্ম যুক্ত করে যদি এ যুগে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো, তা হলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি পারত অমন হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাটে মেতে উঠতে? গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদরা কি পারত তাদের সহযোগিতা করার জন্যে রাজাকার, আলবদর আর আলশামস বাহিনী গড়ে তুলতে? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধারণাই কি তুলে ধরা হয় না রাজনীতিতে ধর্ম জুড়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার কথা বলে?

কিন্তু শেখ মুজিবের নাম মুখে নিয়েছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন– মইন উ আহমদের বিজয়যাত্রা তাই অব্যাহত রইল। তবে আন্তর্জালের পাঠকদের কাছে আগস্ট ২০০৭-এই একটি তথ্য পৌঁছে যায়। বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তারা জানতে পারেন, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে দারুণ সব বাণীপ্রদানকারী মইন উ আহমদের একটি রহস্যময় ব্যাংকঋণ রয়েছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অধ্যাদেশবিরোধী হলেও তারা দু ভাই একই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এমনকি সেনাপ্রধান চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অধ্যাদেশটি জানা থাকার পরও তার ভাইকে পুনর্নিয়োগ দেয়া হয়েছে! সেনাপ্রধান অক্টোবরে আমেরিকা যাওয়ার সময় ই-বাংলাদেশ ডট অর্গ ওয়েবসাইটে এ বিষয়গুলি আবারও প্রতিবেদন আকারে তুলে ধরলেন বগার মাশুকুর রহমান। মইন উ আহমেদ বললেন, 'এ সবই

অপপ্রচার। আমি যখন বিদেশে ঠিক তখনই বিভ্রান্তি তৈরির উদ্দেশ্যে বিষয়টি নিয়ে ইন্টারনেটে অপপ্রচার চালানো হলো।' যে বিষয়টি ইন্টারনেট পাঠকদের অনেকে আগস্ট মাস থেকেই জানে, মইন উ আহমেদ সেটিকে বললেন মাত্র কয়েকদিন আগের 'অপপ্রচার।' বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে তিনি যেসব কথা বললেন, তাতে বগারদের দাবিই আরও জোরালো হলো। ওয়েবসাইট থেকে ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রসপেক্টাস ঘেঁটে তারা দেখলেন, ডিসেম্বর ২০০৫-এ তিনি সেখান থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ৯৯,৬৯,২১৫ টাকা, মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি এ ঋণের সিংহভাগ শোধ করে দেন এবং ডিসেম্বর ২০০৬ নাগাদ ব্যাংকে তাঁর ঋণ থাকে মাত্র ৩৩,১৫,৩২৩ টাকা! তিনি কীভাবে ঋণ শোধ করেছেন তা তো পরের ব্যাপার, একজন ডিরেক্টর হিসেবে, তাঁর শেয়ারের অনুপাতে তিনি কি পারেন এত টাকা ঋণ নিতে? আর প্রসপেক্টাসের তথ্য যদি ভুল হয়ে থাকে, তা হলে সে ব্যাপারে ব্যাংক থেকে কোনও ব্যাখ্যাই বা এখনও দেয়া হয় নি কেন?

আসলে ওয়েবসাইটে নয়, বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চলছে মইন উ আহমদের মিডিয়াস্তাবকদের পক্ষ থেকে। যেমন, মিডিয়াগুলিতে ফুলিয়েফাঁপিয়ে বলা হলো, হাভার্ট ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে তিনি সেখানকার *জন কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট*-এ বক্তব্য রাখতে চলেছেন! এটি দেশের জন্যে, সশস্ত্র বাহিনীর জন্যে সত্যিই গৌরবময় ব্যাপার হতে পারত। কিন্তু দেখা গেল ঘটনা অন্যরকম। আন্তর্জালপাঠকরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ছাত্রদের অনুসন্ধান থেকে জানতে পারলেন, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচির কোনওটাতেই মইন উ আহমদের নামগন্ধও নেই। *জন কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট*-এর পাবলিক পলিসি বিভাগের শিক্ষক প্রভাষক ড. ডেভিড কিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বগার মাশুকুর রহমান আন্তর্জালপাঠকদের নিশ্চিত করলেন, 'মূল আমন্ত্রণপত্র কীভাবে গিয়েছিল সেটি ড. কিং-এর জানা নেই, তবে ড. কিং এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটি পাবলিক ফোরামে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। তবে সেটি কেনেডি স্কুলে নয়, বরং 'প্রাঙ্গণে'।' ড. কিং জানান, হাভার্ডে এমন কোনও একক কেন্দ্র নেই যেখান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বা অনুষ্ঠান করা হয়। অর্থাৎ কোন পাবলিক ফোরাম জেনারেল মইন উ আহমেদকে আমন্ত্রণ করেছিল, সেটির গ্রহণযোগ্যতা আদৌ আছে কি না তা তলিয়ে দেখা উচিত।

যাই হোক আমরা ড. কিং-কে অভিনন্দন জানাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সদিচ্ছায় মইন উ আহমেদকে তাঁর 'নির্বাচন সংস্কার' বিষয়ক ক্লাসে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে আমাদের মুখ বাঁচিয়েছেন বলে! মাশুকুর রহমানের কাছে ড. কিং লিখেছেন, 'তারপর আমি জানি না কেন এবং আমাকে তা জানানোও হয় নি, যে অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা ছিল সেটি বাতিল হয়ে যায়।' পাবলিক ইভেন্ট বাতিল হওয়ায় ড. কিং তাঁর ক্লাসে মইন উ আহমদের উপস্থিতির বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হন মইন উ আহমেদ তাঁর ক্লাসে যোগ দেয়াতে। সেখানে মইন উ আহমদের মূল বক্তব্য রাখার কোনও সুযোগ ছিল না। ড. কিং-এর ভাষ্য অনুযায়ী, 'জেনারেল মইন কথা বলার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিলেন, তবে ক্লাসে আলোচনার ফোকাস ছিল আমার ছাত্রদের উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ।' গাম্বিয়া, চিলি, ব্রাজিল, লেবানন, গ্রিস, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের মোট ১২ জন ছাত্র এখানে পাওয়ার পয়েন্টে 'ইলেকশন রিফর্ম ফর আ সাসটেইনঅ্যাবল ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক পত্রটি উপস্থাপন করেন। মইন উ আহমেদ তা শোনেন এবং তাদের আলোচনায় অংশ নেন। যেহেতু এটি একটি ক্লাস, তাই কারও জন্যে এটি উন্মুক্ত নয় এবং এর কোনও ভিডিও, অডিও, কিংবা ট্রান্সক্রিপ্টসও নেই! অথচ মইন উ আহমেদ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কেবল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রেখে দেশের সুনাম বাড়ানোর জন্যেই তিনি এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছেন!

হাভার্ডের পর মইন উ আহমেদের উলেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হলো ভারত সফর। সেখানে তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের সেনাপ্রধান দীপক কাপুরের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন দুটি ঘোড়া। যে বিশেষ তত্ত্বাবধানে তিনি সেখানে গেছেন, তা প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমেদের ক্ষমতা ও ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ছাড়া আর কোনও তাৎপর্য তৈরি করতে পারে নি। অনেকে অবশ্য এই সফরকে কেন্দ্র করে চেষ্টা চালাচ্ছেন ভারতবিরোধিতার রাজনীতি চাঙ্গা করে তোলার। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সৌদী মোলাতন্ত্র ও ভারতীয় আঞ্চলিক আধিপত্যের স্বপ্ন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন এক গাটছড়া তৈরি করেছে যে সেই ভারতবিরোধিতার সুফলও গিয়ে উঠছে ভারতের গোলাতে। বিশ্বপুঁজিবাদ যেহেতু এগিয়ে চলেছে বাজার মৌলবাদের পথে, সেহেতু ধর্মজ মৌলবাদও তার অন্যতম মিত্র। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে মইন উ আহমেদের পার্থক্য তাই এ টুকুই যে একজন শেখ মুজিবকে দূরে রেখেছিলেন, আরেকজন শেখ মুজিবকেও সঙ্গে রেখেছেন; একজন ভারতকে মুখে-মুখে বিরোধিতা করতেন, আরেকজন মুখে-মুখে বিরোধিতা করছেন না; একজন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যেতে পারতেন না, আরেকজন বইমেলায় দাড়িয়ে অটোগ্রাফও দিতে পারেন; একজন আজমির শরীফ যেতেন আরেকজন যান শান্তিনিকেতনে (বিশেষ দ্রষ্টব্য : গোলাম আযমও রবীন্দ্র সঙ্গীতের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে)। কিন্তু তাদের দু জনের মিল অসম্ভব মৌলিক : তারা দু জনেই বিশ্বাসী ধর্ম ও রাজনীতির সহাবস্থানে!

যুদ্ধাপরাধী গ্রহণযোগ্যকরণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উদারপন্থী ইসলামি চিন্তাধারাকে একসঙ্গে ধারণ করে জাতীয় সমঝোতা ও ঐক্য স্থাপন করতে হবে। ...সে সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধীরা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আমরা তাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি।

– সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল বীরপ্রতীক, জুলাই ২০০৭।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যে ইস্যুটি সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ রাজনীতির মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ভয়াবহ সাইক্লোন সিডর-এ আক্রান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাকে ঘিরেই ঘরোয়া রাজনীতি ও সংবাদপত্রগুলি আবর্তিত হতে থাকে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, আন্তরিকভাবেই সেনাপ্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা বলেছিলেন, আর তাতে অনেকেই আশাবাদী হয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার ও ভোটার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির জোর দাবিও তুলছিল। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যাচ্ছে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পাওয়ার মতো আইনসঙ্গত ফাঁকির দিকে। যত না যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশে, তারও বেশি যুদ্ধাপরাধীদের পাপের বোঝা হালকা, গোপন ও মুক্ত করতে বিশাল এক কুজ্ঝটিকা তৈরি করা হচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে উত্তেজক আলোচনা তৈরি করে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জনমনে সংশয় ও সন্দেহ তৈরির এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এখন কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই একটি মারাত্মক উপসর্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপরাধীদের বিশেষ আদালতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এটি যেমন ঠিক, তেমনি এটিও সুবিদিত, সুপরিকল্পিতভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গণহত্যাকে খাটো করে দেখার জন্যেও একটি চক্র সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে চলেছেন। এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ যারা নাড়াচাড়া করেন, তারা সকলেই একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত। প্রত্যয়টি হলো – জেনোসাইড ডিনাইয়াল বা গণহত্যা প্রত্যাখ্যান। বিভিন্ন গণহত্যার সমর্থক, অপরাধী ও উত্তরাধিকাররা এখন অলিখিত সমঝোতার ভিত্তিতে একে অপরের অপরাধের বোঝাকে হালকা করে চলেছে। গণহত্যাপ্রত্যাখ্যানবাদীদের তালিকায় রয়েছেন ডেভিড হগান, ডেভিড আরভিং, বার্নার্ড লুইস, গুন্টার লিউই, জাসটিন ম্যাককার্থি, সিমোন পেরেস, ব্র্যাডলি স্মিথ, স্যামুয়েল উইমস, শর্মিলা বোস প্রমুখ ব্যক্তিরা।

গণহত্যা প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়ো ধারাটি হলো হলোকাস্ট ডিনায়াল বা ইহুদি গণহত্যা। এ রকম আরেকটি ধারা হলো ডিনাইয়াল অব আমেরিকান জেনোসাইড। ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ পৃথিবীর একজন অন্যতম হলোকাস্ট ডিনায়ালিস্ট। কারণ হলোকাস্টের প্রধান শিকার ইহুদিরা। কেবল মাহমুদ আহমেদিনেজাদই নন, অনেক মৌলবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবীই মনে করেন, হলোকাস্টকে খাটো করতে পারার অর্থ একই সঙ্গে খ্রিস্টান ও ইহুদি উভয়কেই খাটো করা। শুধু মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই নন, এই দলে আরও অনেকেই রয়েছেন যারা মননে নাৎসিবাদী, ফ্যাসিবাদী।

হলোকাস্ট প্রত্যাখ্যানবাদীরা তিনরকম কথা বলে। তারা বলে, প্রথমত ইহুদি হত্যার পেছনে নাৎসিদের কোনও সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত নীতি ছিল না। তাই এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্যে কাউকে দায়ী করারও কোনও যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয়ত হত্যাগুলি ছিল নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যুদ্ধের সময় যা খুবই স্বাভাবিক। এই ধরনের হত্যায় তাই কোনও বিশেষ ইনটেনশন নেই। তৃতীয়ত এরকম হত্যাকাণ্ডও আসলে খুব বেশি নয়। গোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বড়জোর পাঁচ থেকে ছয় লাখ মানুষ এ ধরনের হত্যার শিকার হয়েছে। যেসব এক্সটারমিনেশান ক্যাম্প ছিল, সেগুলিতেও কোনও গণহত্যা চালানো হয় নি। সবই বানোয়াট প্রচারণা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এই মহাযুদ্ধে গণহত্যার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। নিত্য নতুন প্রমাণ উদ্ঘাটিত হচ্ছে। তারপরও হলোকাস্ট প্রত্যাখ্যানবাদীরা বারবার সন্দেহ প্রকাশ করে একই বিষয়ে এক বা একাধিক নতুন গবেষণার দাবি তুলছেন। এই সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এই ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য শেষে হলোকাস্ট সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, হত্যাকাণ্ডের মতো কিছু ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এখনকার পড়ুয়া ও গবেষণাকারীদের উচিত, 'ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিত' থেকে বিষয়টিকে বোঝার ও উপস্থাপনের চেষ্টা করা।' কী হতে পারে এই 'ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিত?' সেটির ব্যাখ্যা দেন আহমেদিনেজাদ ২০০৬ সালে হলোকাস্টসংক্রান্ত এক সম্মেলনে। সেখানে তিনি তাঁর মুখপাত্রের মাধ্যমে বলেন, 'আমি পূর্ব ইউরোপের নাজি ক্যাম্পগুলো প্রদর্শন করেছি, আমার মনে হয় এ গুলো অতিরঞ্জিত।' তার মানে আহমেদিনেজাদ চাইছেন, গবেষণা ও অধ্যয়ন করা হোক, তবে তার উদ্দেশ্য হোক গণহত্যার বিষয়টিকে খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করা।

আহমেদিনেজাদ ও তার মতো প্রত্যাখ্যানবাদীরা এ কাজটিই করে চলেছেন। প্রথমত তারা গণহত্যার পরিধি ও সংখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। দ্বিতীয়ত কিছু হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃতি দিলেও সে গুলিকে নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ও যুদ্ধকালীন অনিবার্য

হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তালিকায় স্থান দিচ্ছেন। অর্থাৎ গণহত্যাকে বাতিল করে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না তারা, অস্বীকার করছেন ঠাণ্ডা মাথায় এ রকম হত্যার কোনও পরিকল্পনাও।

বাংলাদেশেও এ রকম প্রত্যাখ্যানবাদী ছিলেন। প্রথম দিকে তারা মুখ বুজে ছিলেন। এখন মুখ খুলছেন। প্রথম দিকে এরা শাহাদত চৌধুরী আর মেজর অরোরাকে উদ্ধৃত করে বলতেন, ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আসলে এত মানুষ 'মারা' যায় নি। শেখ মুজিব আসলে ভানুর সেই কৌতুকের মতো ভুল করে ৩০ লাখ মানুষের কথা বলে ফেলেছেন। তারপর ধরেন, যা কইছি– কইছি, আর কমাইবার পারুম না।'' মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের নিয়ে এরচেয়ে আর কী নৃশংস ও অশীল উপহাস হতে পারে!?

বাংলাদেশে এখন এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী গজিয়েছেন, যারা যুদ্ধাপরাধী নিয়ে আলোচনা করছেন যুদ্ধাপরাধীদেরকে জনসমাজে ও রাজনীতিতে অঙ্গীভূত করে নেয়ার উদ্দেশ্যে। এরা বলছেন, 'অনেকদিনের ব্যাপার, এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়।' অনেকটা মাওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম (অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, বীরপ্রতীক)-এর ধারণার মতো, যাঁর কথার সূত্র ধরেই ২৭ মার্চ বর্তমান সেনাপ্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা বলেন এবং যিনি মনে করেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উদারপন্থী ইসলামি চিন্তাধারাকে একসঙ্গে ধারণ করে জাতীয় সমঝোতা ও ঐক্য স্থাপন করতে হবে। ...সে সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধীরা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আমরা তাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি (আমাদের সময়, ২৭ জুলাই ২০০৭)।' রাজনৈতিকভাবে কি সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে ধর্মতন্ত্রকে (হোক না তা যতই উদার) যুক্ত করা? তা হলে আসল মতলব কি? আসল মতলবই হলো যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে 'জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা' স্থাপন করা। আরেক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী এত 'নমনীয়' নন, তারা চাইছেন গণহত্যা, ধর্ষণ ও যুদ্ধাপরাধীদের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করতে।

এইসব বুদ্ধিজীবীরা, তাদের নিয়ন্ত্রক রাজনীতিকরা গোপন এক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। তারা একদল গবেষক মাঠে নামিয়েছে, যারা গবেষণা করে দেখাচ্ছেন, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনও যুদ্ধাপরাধ ঘটে নি। শেখ মুজিব কোন ধরনের অপরাধীদের ক্ষমা করেছিলেন কিংবা জিয়াউর রহমান কাদের পুনর্বাসিত করেছিলেন, সেসব তো অনেক পরের কথা– যুদ্ধাপরাধই যেখানে ঘটে নি, সেখানে যুদ্ধাপরাধী থাকবে কেমন করে? আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আর হান্নান শাহ্‌রা তাই ধৃষ্টতার সঙ্গে বলছে দেশে কোনও যুদ্ধাপরাধী নেই, আগেও ছিল না। বলছে, দেশে কোনও স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় নি, হয়েছে গৃহযুদ্ধ! গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ এরা একেকজন 'পুতপবিত্র দেশপ্রেমিক।' ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের ডিন ড. মাহবুবুল ইসলাম নতুন এক তত্ত্ব দিলেন এ বিষয়ে, 'যুদ্ধাপরাধী হতে হলে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে যুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। বাংলাদেশ সেই যুদ্ধের অংশ ছিল না। এ কারণে বাংলাদেশে কখনই যুদ্ধাপরাধী ছিল না।' ১৪ নভেম্বর দিলেন আরও এক তত্ত্ব, 'সংবিধান জারি হয়েছে ১৯৭২ সালে। কাজেই বাহাত্তর সালের পর থেকে কোনো নাগরিক যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে সংশিষ্ট হলেই কেবল তার বিচার করা যাবে। আগের হলে করা যাবে না।' আর পিআইবি'র চেয়ারম্যান সাদেক খান তত্ত্ব দিলেন, 'একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধ করেছে। বিচার করতে হলে দুই পক্ষেরই করতে হবে (প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০০৭)।'

এইসব গবেষকদের তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকেও। কেননা বাংলাদেশের স্বাধীনতা তো কেবল হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত পরাজয় নয়, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির তথা যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়। অতএব এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যত বিকৃত হয়, যত বিতর্কিত হয় তাদের ভূমিকাও যুক্তিসিদ্ধ হয়। ইদানিং তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা নিয়ে গবেষণার জন্যে আলাদা বিভাগও চালু করেছেন।

বাংলাদেশের গণহত্যা ও ধর্ষণপ্রত্যাখ্যানকারী গবেষক ও ইতিহাসবিদ হলেন শর্মিলা বোস। এই ভদ্রমহিলা আবার নেতাজি সুভাষ বোসের আত্মীয়া। ২০০৪ সালে তিনি যখন প্রথম বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে আসেন, তখন কেউ জানতেন না তাঁর গোপন মিশন কী। বাংলা একাডেমী থেকে *স্মৃতি '৭১*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজবইয়ের সম্পাদক রশীদ হায়দারও তাঁকে গবেষণার কাজে সহায়তা করেন। কিন্তু ফিরে গিয়ে শর্মিলা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার পরিধি নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রে প্রশ্ন তোলেন। ২০০৫ সালে 'পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনোমিক্যাল উইকলি অব ইন্ডিয়া'য় তার এই গবেষণাপ্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু শর্মিলা বোস সেইসব প্রতিবাদ গায়ে মাখেন নি। গত সেপ্টেম্বর, ২০০৭ মাসে তিনি একই পত্রিকায় আবারও একটি প্রতিবেদন লিখেছেন, 'লসিং দ্য ভিকটিমস : প্রবলেমস অব ইউজিং উইমেন অ্যাজ উয়েপনস ইন রিকাউন্টিং দ্য বাংলাদেশ ওয়র' শিরোনামে। এবারে তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশের যুদ্ধে (তাঁর মতে অবশ্য যুদ্ধ নয়, 'সংঘাত') নারী ধর্ষণের যে দাবি করা হয় তা অতিরঞ্জিত। লিখেছেন শর্মিলা বোস, 'সংঘাতের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাব্যক্তির সংখ্যা কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ২০,০০০ এবং

ডিসেম্বরের দিকে তা ৩৪,০০০এ উত্তীর্ণ হয়। এছাড়া আরও ১১,০০০ ছিলেন সিভিল পুলিশ ও ননকমব্যাট পার্সোনেল, যাদের হাতেও অস্ত্র ছিল।' শর্মিলা বোস দাবি করেছেন, এত কম সংখ্যক মানুষ কী করে এত নারীকে ধর্ষণ করতে পারে?

শর্মিলা বোস কী ভয়ানক তথ্যবিকৃতি ঘটাচ্ছেন, সেটি আগে দেখা যাক। তিনি দেখাচ্ছেন, যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে খুব বেশি পাকিস্তানি সেনা ছিল না। অথচ অনেক সেনাসদস্য নিরাপদে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরও যুদ্ধশেষে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যুদ্ধবন্দি নেয়া হয়েছিল ৯০,৩৬৮ জন পাকিস্তানিকে। এর মধ্যে ৫৪,০০০ হাজার ছিল সেনাসদস্য আর ২২,০০০ ছিল প্যারামিলিটারি ফোর্স।

এখন আসুন দেখা যাক, ৯০ হাজার সদস্যের একটি খুনি বাহিনী ৯ মাসে এতগুলি ধর্ষণ করতে পারে কি না। শর্মিলা বোস লিখেছেন, 'যদি ১০ শতাংশ সেনাও ধর্ষণ করে থাকে...', শর্মিলা বোসের উলেখিত ওই শতাংশ মেনে নিলেও এটি খুবই সম্ভব যে ৯০ হাজার সদস্যের একটি খুনি বাহিনী ৯ মাসে এতগুলি ধর্ষণ করতে পারে। শর্মিলা বোস কি জানেন না, রুয়ান্ডাতে মাত্র ১০০ দিনে আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ নারী ধর্ষিতা হয়েছে?

এ বিষয়ে সারা বাংলাদেশের কথা বাদ দিন, কেবলমাত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিবরণ দেখুন। আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনের ২৫ অক্টোবর ১৯৭১-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫৬৩ জন তরুণীকে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগের বয়সই ১৮-এর কম, ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক যৌননিপীড়ন আস্তানাতে। এদের প্রায় সবাই এখন তিন থেকে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এদের গর্ভপাত ঘটানোর জন্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালি গাইকনোলোজিস্টদের তালিকা তৈরি করে। কিন্তু মেয়েদের অনেকেরই গর্ভপাত ঘটানোর সময়ও পেরিয়ে গেছে। তাই সেনাসদস্যরা এই সব তরুণীদের এখন তাড়িয়ে দিচ্ছে সামরিক যৌননিপীড়ন আস্ত ানা থেকে, যদিও এদের গর্ভে রয়েছে এই সেনাসদস্যদেরই সন্তান।'

এইসব তথ্য মিসেস বোসদের জানা আছে। তারপরও তারা সংখ্যা নিয়ে এক অশীল খেলা শুরু করেছেন, যেন সংখ্যাই সব,– গণহত্যা ও ধর্ষণের সংখ্যা কম দেখানো গেলেই মনে হয় পাকিস্তানীদের গণহত্যা ও ধর্ষণ বৈধ হয়ে যাবে!

কিন্তু কেন শর্মিলা বোস এ রকম করছেন? সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে না, যদি আমরা আরও কয়েকটি তথ্য একই সঙ্গে খতিয়ে না দেখি। এইসব সূত্র ইঙ্গিত দিচ্ছে, বাংলাদেশের গণহত্যা ও ধর্ষণ প্রত্যাখ্যানের এই একাডেমিক অশীল ও নৃশংস মিথ্যাচারের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মতিউর রহমান নিজামীর মন্ত্রিত্ব ও টাটার বিনিয়োগ পরিকল্পনার এক পর্ব।

শর্মিলা বোস বিয়ে করেছেন অ্যানাল রোসলিং'কে। অ্যানাল রোসলিং হলেন টাটার ব্রিটিশম্যান, টাটা সনস-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, টাটা গ্রুপ সেন্টারের অন্যতম সদস্য। তিনি টাটা অটোকম্প সিস্টেমস ও টাটা ইন্টারন্যাশনালেরও ডিরেক্টর। টাটা গ্রুপকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার যাবতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। শর্মিলা বোসের একাডেমিক জ্ঞানচর্চা ও সাংবাদিকতার অনেকটাই নাকি হয়ে থাকে তাঁর স্বামী অ্যানাল'এর কোম্পানি স্বার্থে। জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী নিজামী কেন টাটার বিনিয়োগপ্রস্তাবকে সমর্থন করবেন না, যদি মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা ও ধর্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করার নিশ্চয়তা দেয়া হয় টাটার পক্ষ থেকে?

এ রকম সব 'একাডেমিক গবেষণা'র ধুম্রজালেই জামাতে ইসলামীর মতো দলটির নেতারা এখন জোর গলায় বলতে চাইছে, বাংলাদেশে কোনও যুদ্ধাপরাধী নেই! আবার খোদ প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদও উপসংহারে ঘোষণা করেন, যুদ্ধাপরাধী বিচারের কাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়!

টাটা বিনিয়োগের ভূত এই শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের কাঁধেও চেপে বসে আছে। কাজেই যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গ নিয়ে তারাও তামাশা করছেন। তামাশা করছেন ধর্মজ রাজনৈতিক দল করার অধিকার নিয়ে। এদের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও নীরব তত্ত্বাবধায়ক সরকার। উপদেষ্টা পরিষদের কমপক্ষে দু জন উপদেষ্টা বার বার প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি তাদের পক্ষপাত ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তারা জামায়াত নেতাদের কোনও দোষ খুঁজে পান নি। জামায়াত নেতাদের দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেই তারা এই বলে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, 'যদি তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয় বিচার হবে'। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তো একবার জামায়াতকে রক্ষা করা হচ্ছে কি না প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন শেষ করে চলে গেছেন (প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০০৭)। তিনি তাঁর এই বাণী প্রচার এখনও অব্যাহত রেখেছেন, 'যারা গত ৩৬ বছর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি, প্রথমে তাদের বিচার হওয়া উচিত।' একবারও তাঁর মনে হচ্ছে না, এখন যারা বিচার করতে চাইছে না তাদের দিয়েই সে বিচারের কাজ শুরু করলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতিবাজদের কারাগারে পুরছেন, অথচ যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্যি হওয়ার পরও তাদের গ্রেফতার করতে পারেন না। নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় সভায় দেশের গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার দাবি

তুলেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার দাবি তুলেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার) বলছেন, 'কে কে যুদ্ধাপরাধী, প্রমাণসহ তার তালিকা দেন।' মজার ব্যাপার হলো, সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হলে দৈনিক সমকালে বর্ণনা করা হয়েছিল কীভাবে তিনি দুর্নীতির দায়ে অবসর পেয়েছেন সামরিক বাহিনী থেকে। অন্যদিকে দৈনিক প্রথম আলো তাঁকে 'স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত' হিসেবে প্রমাণের জন্যে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে ছেপেছিল দায়িত্ব নেয়ার সময়েই তাঁর সম্পদের হিসেব দাখিল করার খবর। সারা দেশে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর মৌলবাদী জঙ্গিদের সবাই কঠোর শাস্তির দাবি জানালেও তিনি বলেছিলেন, জঙ্গিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হোক!

এই যখন অবস্থা তখন জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের দুর্নীতি সরকারের চোখে পড়বে কেমন করে? কী করে চোখে পড়বে রাজউক থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে, প্রতারণা করে, গোপনীয়তা বজায় রেখে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন সাবেক শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী আর সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ? ১৫ আগস্ট ২০০৭-এ এই অনুসন্ধানী খবর ছাপা হয় দৈনিক সমকালে : রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে জোট সরকারের আমলে গোপনে রাজধানী ঢাকায় পট দেয়া হয়েছে মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ ২২ জনকে। নিয়ম অনুযায়ী রাজউকের এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে ঘোষণা দেয়ার কথা থাকলেও সে নিয়ম মানা হয় নি। অন্য প-টপ্রাপ্তরা হলেন বিএনপির ১৬ জন মহিলা সাংসদ ও দু জন সাংসদ, একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বুয়েটে নিহত সনির মা। একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং নিহত সনির মা-এর প্রতি সহানুভূতিশীলতা আমাদেরও হৃদয় ছুঁয়ে যায়, কিন্তু আর কে কী এমন অবদান রেখেছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে তাদের এই পট দিতে হবে? কী 'গুরুত্বপূর্ণ' অবদান মতিউর রহমান নিজামী আর আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদের? তাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছেন, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছেন, এখনও এ রাষ্ট্রকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদল দেয়ার চক্রান্ত করছেন– এর চেয়ে বড় আর কোন অবদান রয়েছে তাদের? অথচ উত্তরার ১১ নং সেক্টরের ১০ নং রোডে নির্মিত হচ্ছে মোহাম্মদ মোজাহিদের *মিশন তামান্না* এবং বনানীতে ১৮ নং সড়কের ৬০ নং পটে নির্মিত হচ্ছে মতিউর রহমান নিজামীর *মিশন নাহার*। *তামান্না*তে মুজাহিদ ডেভেপলারস লিমিটেড-এর কাছ থেকে মোট অর্ধেক বা ৫টি ফ্ল্যাট পাবেন, যার মূল্য দাঁড়াবে ৩৫ লাখ টাকা হিসেবে পৌণে দুই কোটি টাকা। নিজামীর পট বনানীতে, তিনি পাবেন আরও বেশি টাকা। মানুষের চোখে চমক লাগানোর জন্যে সরকার র‍্যাংগস ভবন ভাঙতে পারে, কিন্তু মতিউর রহমান নিজামী বা আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদের এই অ বৈধ সুরম্য অট্টালিকা সরকার বা দুদকের চোখে পড়ে না।

নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটু দোষ খুঁজে বের করেছেন জামায়াতের সাবেক এমপি শাহজাহানের। গুণ্ডাপাণ্ডা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দুদক-এ গিয়ে তিনি তাঁর সম্পত্তির হিসেব জমা দিয়ে র‍্যাব-পুলিশ সবার 'চোখ এড়িয়ে' নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কত কুতুবকে খুঁজে পেল, কিন্তু শাহজাহান বাবাজিকে না কি আর খুঁজেই পেল না। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, শাহজাহান বাবাজি তার দলের নির্দেশে আবারও সেই পুরানো গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে আদালতে হাজির হলেন এবং আত্মসমর্পন করলেন!

এমনকি সরকারের নানা সাধারণ (!) কাজকর্মেও এই পক্ষপাতিত্বের ছায়া পড়ছে। বাংলাদেশ বিমানের নাম পাল্টানো হলো সেটিকে কোম্পানিকে করার অজুহাতে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি দেখা গেল, নৌবাহিনীর ফ্রিগেড বানৌজা বঙ্গবন্ধু-র নাম পরিবর্তন করে খালিদ বিন ওয়ালিদ নামে রিকমিশনিং করা হয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদের নিশ্চয়ই অনেক কৃতিত্ব আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃতি মানুষের কি এতই অভাব যে তাঁর নামে একটি ফ্রিগেড রিকমিশনিং করতে হবে? সরকারের কেউই এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ১৯৭৫ সাল থেকে খোন্দকার মোশতাক আর জিয়াউর রহমানরা নাম বদলের মধ্যে দিয়ে মগজ বদলের যে খেলা শুরু করেছেন সে খেলাই চালিয়ে যাচ্ছেন এই সরকার।

কালো, সে যতই কালো হোক...

মানুষের জীবনে চিরসত্য দুটি। একটি জন্ম নেয়া, আরেকটি কর পরিশোধ করা।
- অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, ২০০৭।

সংগোপনে আরও এক সন্ত্রাস চলছে দেশের অর্থনীতিকে ঘিরে। কিন্তু রাজনৈতিক তাণ্ডবে আর দুর্নীতিবিরোধী আশাজাগানিয়া কথাবার্তায় সরকার বাজার এত মাতিয়ে রেখেছিলেন যে এ সন্ত্রাস প্রথমে কারও চোখেই পড়ে নি।

প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল কালো টাকার বিরুদ্ধে মরণপণ এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। তাদের তর্জনগর্জনের চোটে আমরা ভুলে গেলাম বামপন্থী দলগুলিই প্রথম কালো টাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, কালো টাকার রাজনৈতিক ও অর্থ

নৈতিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে। মধ্যশ্রেণি তখন উটপাখি হয়ে বসেছিল। কিন্তু জলপাইরঙা বুটের লাথি এতই মধুর যে, সামরিকতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত উপদেষ্টাদের কথায় তারা আশান্বিত হল। এ রকম একটি মধ্যশ্রেণির কপালে দুর্ভোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং শেষমেষ তাই হলো। বাজেটের সময় এরা দেখল, তেনারা বলছেন কালো টাকাও শাদা করা যাবে!

কী ভাবে এটি সম্ভব হলো? বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ড. আবুল বারাকাত এ ব্যাপারে বললেন, 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পাঁচ শতাংশ জরিমানাসহ আয়কর দিয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার ঘোষণা দেওয়ার আগে সেনাবাহিনীপ্রধান এক বক্তৃতায় কালো টাকা ও অপ্রদর্শিত অর্থ যে দুটি পৃথক বিষয় তা উলেখ করেছিলেন।' তা হলে ঘটনা এই! সেনাপ্রধান যেহেতু বলেছেন, কালো টাকা আর অপ্রদর্শিত অর্থ তা হলে তো আলাদাই হওয়ার কথা! তা ছাড়া অর্থ উপদেষ্টা বাজেট, ২০০৭-এর কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, 'মানুষের জীবনে চিরসত্য দুটি। একটি জন্ম নেয়া, আরেকটি কর পরিশোধ করা।' তিনি সেই চিরসত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করের বিনিময়ে কালো টাকা সাদা করার বিধান ঘোষণা করলেন। নিয়মাবলী হিসেবে বলা হলো, কেবল বৈধভাবে অর্জিত কালো টাকাকেই শাদা করার সুযোগ দেয়া হবে!

এইভাবে উপদেষ্টারা বাংলাদেশকে পরিণত করলেন পৃথিবীর এমন একটি দেশে যেখানে বৈধভাবে কালো টাকা উপার্জন করা যায়! তাদের সেই বাংলাদেশে খালেদা জিয়া বৈধভাবে কালো টাকা উপার্জন করলেন, তারেক রহমান করলেন, সাইফুর রহমান করলেন, আরও অনেকেই করলেন। বোঝা গেল, রসুন কোয়া কোয়া, ওপরে সুন্দর আলাদা খোসা কিন্তু তাদের গোড়া একই জায়গায়। উপদেষ্টাদের, কথিত সুশীলদের আর চারদলীয় জোট সরকারের গোড়া আসলে একই জায়গায়। অর্থনীতি শাস্ত্র বলে, টাকা কালো হয়ে যায় দুটি কারণে। প্রথমত সব কিছু বৈধ পথে করার পরও, ধরা যাক, আমদানি শুল্ক ফাঁকি দিলে। দ্বিতীয়ত চোরাচালান, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপকর্ম করে। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. খলিকুজ্জামানের ভাষায় (১৪ জুন, ২০০৭), 'বৈধ বা অবৈধ যে পথে আয় করেই অপ্রদর্শিত বা অঘোষিত রাখা হোক, তা আসলে কালো টাকা। 'কালো' না বলে 'অপ্রদর্শিত' বলা হচ্ছে, যা আসলে শব্দের মারপ্যাঁচ। সরকার কীভাবে 'কালো' আর 'অপ্রদর্শিত' আয়ের মধ্যে পার্থক্য করবেন তা স্পষ্ট নয়।"

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তাদের পার্লামেন্ট মিডিয়াগুলির কী দায় পড়েছে কালো আর অপ্রদর্শিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করার? বিশেষত যখন সামরিক বাহিনীর প্রধান এর একটি পার্থক্য দাঁড় করিয়েছেন? অতএব কালো টাকা শাদা করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকল। দুর্নীতি দমন কমিশনের টিনের তলোয়ার ঘুরতে লাগল বাতাসের মধ্যে। মানুষজনের বুঝতে অসুবিধা হলো না কার টাকা কালো হলেও সাদা হবে, কার টাকা সাদা হলেও কালো হবে, কে কখন দুর্নীতিবাজ হবে তা আসলে নির্ধারিত হচ্ছে এবং হবে অন্য কোথাও থেকে। কাণ্ডকারখানা দেখে টিআইবি'র সাদা মুখ কালো হয়ে গেল, কালো মুখ নিয়ে তাদের লোকজন আর কালো টাকার বিরুদ্ধে কথা বলবে কোন মুখে? ওদিকে 'কোরামসংকটে' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সংসদ' প্রথম আলো আর ডেইলি স্টার-এও এ নিয়ে কোনও বিস্তর মন্তব্য প্রতিবেদন লেখা হলো না, গোল টেবিল কিংবা সংলাপ হলো না। অথচ ২০০৫ এবং ২০০৬ দু বছরই বাজেটের আগে-পরে এদের উদ্যোগেই সুশীল নাগরিকদের বলতে শোনা গেছে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করা হোক। বলতে শোনা গেছে, নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্যেই অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বারবার কালো টাকা শাদা করার সুযোগ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) সর্বোচ্চ ২০০ কোটি কালো টাকা শাদা করে দুর্নীতিবাজরা। জোট সরকারের শাসনামলে (২০০১-২০০৬) দুর্নীতি কী চরমে উঠেছিল তা বোঝা যায় ২০০৫ সালের বাজেটে কালো টাকা শাদা করার সুযোগ রাখার প্রথম ১০ মাসেই পৌণে ৯০০ কোটি কালো টাকা সাদা করার ঘটনাতে। এর বিপরীতে কর আদায় হয় প্রায় ৭০ কোটি টাকা। বিআইডিএস-এর পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত তখন বলেন, 'শাদা করার সুযোগ দেয়া নয়, বরং কালো টাকার উৎস বন্ধ করাই হলো সরকারের কাজ (দৈনিক সমকাল, ২৯ মে ২০০৬)।' কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কালো টাকার উৎস বন্ধ করার জন্যে যত লাফালাফিই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কর আদায়ের মরুভূমিতেই দৌড়াতে থাকলেন। তিন জুলাই ২০০৭-এ বিভাগীয় শহরে কর জরিপ কার্যক্রমের নির্দেশনামূলক সভায় এনবিআরের চেয়ারম্যান বদিউর রহমান বললেন, 'কর দেয়ার 'ট্যাবলেট' খান, ঘুম ভালো হবে। ...আয়কর অধ্যাদেশে কালো টাকা বলতে কিছু নেই, সব টাকাই সাদা টাকা। যারা অপ্রদর্শিত বৈধ আয় সাদা করতে আসবেন, বিনা প্রশ্নে তাদের টাকা নেয়া হবে (ইত্তেফাক, ০৪ জুলাই ২০০৭)।

অতএব কালো টাকা থাকল। বহাল তবিয়তে রইল কালো টাকাওয়ালা করদেনেওয়ালা ভালো মানুষেরা।

একদম দুর্নীতিমুক্ত মূল্যস্ফীতি ও আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দেনদরবার

সত্য ছড়িয়ে দাও – অর্থনীতির সূত্রগুলো প্রকৌশলের সূত্রের মতো – একসেট সূত্র সবখানেই খাপে খাপ কাজ করে।

– লরেন্স সামার্‌স, বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ, ১৯৯১ ।

এদিকে মূল্যস্ফীতি ঘটতে থাকল হু হু করে । ২০০১-এ জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে মূল্যস্ফীতি ছিল এক দশমিক ৯৪ শতাংশ । তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার সময় জানুয়ারি ২০০৭-এ মূল্যস্ফীতি ছিল পাঁচ দশমিক ৯৮ শতাংশ । কিন্তু জুন ২০০৭-এ গিয়ে সেই মূল্যস্ফীতি ঠেকল নয় দশমিক ২০ শতাংশে (ইত্তেফাক, ৩০ জুলাই ২০০৭) ।
অর্থ ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার সরকারি সামর্থ চিন্তা না করেই দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকার যে দূরত্ব তৈরি করেছিল, খুব দ্রুতই তার জন্যে মাশুল দিতে হলো সরকারকে । মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠল অসহনীয় দ্রব্যমূল্যের চাপে । সরকারি হিসেবেই একজন মানুষের আয়ের প্রায় ৫৪ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্য কিনতে । গ্রামে এই ব্যয় আরও বেশি, সাড়ে ৫৮ শতাংশ । মানুষ তাই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হলো চালের মূল্য বেড়ে চলাতে । জুলাই ২০০৭-এর দিকে দেখা গেল, পাঁচ সদস্যের পরিবারে সেই চাল কেনার জন্যে বাড়তি খরচ হচ্ছে ৩৬০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা । ওদিকে গ্রামে তখন কাবিখা, টেস্ট রিলিফ (টিআর), ভিজিডি ও ভিজিএফ সব ধরনের কর্মসূচিই বন্ধ । নীতিনির্ধারকরা বলেছিলেন, অপেক্ষা করুন, বোরো ধান উঠলেই চালের দাম কমে যাবে । কিন্তু বাস্তবে তা মোটেও কমল না । সরকার বোরো চাল-ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু করল । কিন্তু চাল-ধানের বাজারমূল্য সরকারের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি হওয়াতে কৃষকরা তা বিক্রি করতে লাগল হাটবাজারে । নভেম্বরে সাইক্লোন সিডর হওয়ার পর বাজারব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল । সরকার যেসব ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করেছিলেন, তাদের ছেড়ে দিতে শুরু করলেন ব্যবসা ও বাজারমন্দা দূর করতে!
গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রগুলি তছনছ করে দেয়া হয়েছে, পণ্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে, ব্যবসায়ীরা আস্থার সংকটে ভুগছেন, অগণিত মুদ্রাতারল্যে ব্যাংকগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে, কালো টাকা বাজারে খেলা করছে সাদা চেহারা নিয়ে, অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনেরই পাঁচ তলার একটি ছোট্ট কক্ষে বসে সারা দেশের অর্থনীতিকে তছনছ করে চলেছে আইএমএফ,– এই যখন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তখন ছয়মাস ধরে আশার জাল বোনা অর্থোডক্স অর্থনীতিবিদরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন । সরকারের তখনও ক্ষীণ আশা ছিল, নিশ্চয়ই তারা তাদের অনুকুল রাজনৈতিক শক্তি খুঁজে পাবে । আর সেই অনুকুল রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে এই অর্থনৈতিক সংকটকে আড়ালে ঠেলে দেবে । ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন তাই জুন ২০০৭-এ এসেও জোরগলায় বলছিলেন, 'সংস্কার শেষ হলেই ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে । কারণ রাজনীতিতে যারা সংস্কার চান তাদের আরও সময় দরকার ।'
কিন্তু অর্থনীতিবিদদের পক্ষে আর সময় দেয়া সম্ভব হলো না । দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ঢালঢোলক বাজিয়ে সরকার যে মানুষের আর্তচিৎকার চাপা দিচ্ছেন, সেটি তাদের চেয়ে আর কে ভাল বুঝবে! মুদ্রানীতিকে কেন্দ্র করে তাদের ক্ষোভ বেরিয়ে এলো । বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয়মাসের জন্যে নতুন এ মুদ্রানীতির ঘোষণা দিলেন ১২ জুলাই, ২০০৭-এ । জনগণকে অভয় দিলেন তিনি, 'এই মুদ্রানীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে দ্রব্যমূল্যকে সহনীয় করতে । তবে চট করেই মূল্যস্ফীতি কমে যাবে না (আমাদের সময়, ১৩ জুলাই) ।' তার মানে আমার-আপনার গায়ে এবার ফোস্কা পড়া বন্ধ হবে । কেননা এই নতুন নীতিটা এমন যে ফোস্কা না ফেলেই মালকড়ি আমার-আপনার পকেট থেকে হাতিয়ে নেয়া যাবে । তবে কবে থেকে সেই ফোস্কা পড়া বন্ধ হবে তাও তারা বলতে পারছেন না । কেননা, গভর্নরের মতে, মুদ্রানীতির বাস্তবায়ন অনেকটাই নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি ও রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয়ের ওপর । মানে বারো মন ঘি-ও জুটবে না, রাধাও নাচবে না । এ দু নীতির মধ্যে সমন্বয়ও হবে না, আমার-আপনার গায়ের ফোস্কা পড়াও বন্ধ হবে না । তবে আইএমএফ'এর দুশ্চিন্তা দূর হলো এ ঘোষণায় । কেননা এ রকম একটা মুদ্রানীতির জন্যেই তারা এতদিন ধরে দরবার করছিল ।
গভর্নর আমাদের আরও জানালেন, জুন ২০০৭ অবধি ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য ৯ হাজার ৫১৭ কোটি টাকা এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এ ধরনের তারল্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি । একমাত্র ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডেই উদ্বৃত্ত তারল্য ১৫৩২ কোটি টাকা (আমাদের সময়, ১৩ জুলাই ২০০৭) ।
ন্যূনতম সততা থাকলে জুন মাসে বাজেট ঘোষণার সময়েই সরকার এ মুদ্রানীতির ঘোষণা দিত । সে ক্ষেত্রে রাজস্ব কাঠামোর সঙ্গে এই মুদ্রানীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারতো । কিন্তু অর্থ উপদেষ্টা তাঁর বাজেট ভাষণের সময়ে একবারের জন্যেও বললেন না, ভবিষ্যতে এমন একটি মুদ্রানীতি আসছে । বাজেট ঘোষণার পর গভর্নরকে দিয়ে মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বলা হলো, এই মুদ্রানীতির সঙ্গে রাজস্বনীতি সমন্বয়ের ওপরেই নির্ভর করছে এ মুদ্রানীতির সফলতা! ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম, দুটো ঘোড়ার পেছনে একটি মোটরগাড়ি জুড়ে দিয়ে বলা হলো, এই ঘোড়াগুলিকে মোটরগাড়ির বেগে চালানোর ওপরেই নির্ভর করছে গন্তব্যে আপনি কখন যাবেন ।
আমন চাষের মৌসুমকে সামনে রেখে ঘোষিত এ মুদ্রানীতির অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব ছিল মারাত্মক । স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল, নতুন ও কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ব্যাংকঋণের সুদের হার বেড়ে যাবে । সুদের হার বেড়ে যাওয়াতে মূল্যস্ফীতি

ঘটবে। ফলে কৃষকরা সংকটাপন্ন হবে দু'দিক থেকেই। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঢাক বাজাচ্ছিল, নতুন অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ছয় শতাংশ থেকে সাত শতাংশের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হবে। কার্যত এ মুদ্রানীতির ফলে বেসরকারি বিনিয়োগে ভাটা পড়বে এবং সাত শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

এবার তত্ত্বাবধায়কমনস্ক অর্থনীতিবিদদের সাজানোগোছানো বাগান সিপিডিতে ঝড় দেখা দিলো। বছরের পর বছর ধরে একের পর এক সংলাপ, গোলটেবিল আর সেমিনার করে সিপিডি রাষ্ট্রক্ষমতায় সিভিল সোসাইটির অনিবার্যতার দর্শন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিল। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে বলে 'নতুন' এক রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টির জন্যে সিপিডির নাগরদোলায় চড়ে সুশীলগণ সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুঁজতে শুরু করেছিলেন। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বেড়ানো সুশীলদের অন্যতম সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবার মুদ্রানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলেন। সাংবাদিকদের জানালেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ মুদ্রানীতি সংকোচনমূলক (প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০০৭)।

তবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সিপিডি'র সংবাদ সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বললেন সেটি হলো, 'জাতীয় ঐকমত্য থেকে সরে গিয়ে আইএমএফ'এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে সরকারের নীতিব্যবস্থাপনা। স্বপ্রণোদিতভাবে হারিয়ে ফেলা হচ্ছে নীতি-স্বাধীনতা।' তাঁর কথা শুনে মনে হলো, এর আগে বিভিন্ন সরকারের নীতিব্যবস্থাপনায় ঐকমত্য ছিল! ধারাবাহিকতা ছিল! আর সেই ঐকমত্য ও ধারাবাহিকতায় আমাদের অর্থনীতি ফুলে ফুলে পলবিত হয়েছিল, কিন্তু এবার হঠাৎ হোঁচট খেলো।

যাই হোক, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যদের এসব কথাবার্তা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। আইএমএফ, অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কেউই দেরি করলেন না তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে। আইএমএফ-এর ঢাকা আবাসিক প্রতিনিধি জনাথন সি ডান পরদিনই সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হতে একটুও দেরি হলো না তাঁর। বললেন 'বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত মুদ্রানীতি অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ২০০৭)।' মুদ্রানীতির মতো একটি 'বড় ইস্যু'তে সিপিডি'র প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত হলো আইএমএফ। তা মুদ্রানীতি একটি বড় ইস্যুই বটে। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে যখন রয়েছে এ নীতির যৌক্তিক সম্পর্ক! কিন্তু এই যৌক্তিক সম্পর্ক উপেক্ষা করার অপচেষ্টা চালালো আইএমএফ। জনাথন সি ডান বললেন, 'বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি শুধু সরবরাহজনিত কারণে বাড়ে না, চাহিদাজনিত কারণেও বাড়ে।' তত্ত্বাবধায়ক সরকার লুকিয়ে কেবল আইএমএফ'কে জানিয়ে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ আর গ্যাসের দাম বাড়ানোর যে পরিকল্পনা করছিল তার পক্ষেও কথা বলল আইএমএফ, 'জ্বালানী তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ দাম নির্ধারণ করার কিংবা সার্বজনীন ভর্তূকি দেয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। এজন্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানীর দাম নির্ধারণ করা উচিত। ধনী লোককে ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই।'

আইএমএফ জোর গলায় বলল, 'সরকারকে চাপ প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করি মাত্র'। একটি কূটনৈতিক অবস্থান নিলো আইএমএফ, যার অর্থ সরকারের এ মুদ্রানীতির দায়দায়িত্ব তারা বহন করবে না, তবে সরকারের মুদ্রানীতির প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন রয়েছে।

আইএমএফ-এর পাশাপাশি মুখ খুললেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বললেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কারও পরামর্শে কাজ করছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা মোটেও সঠিক নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে অসহায় নয়। সিপিডি'র বক্তব্যের উত্তরে তিনি আরও বললেন, 'শুধু চাহিদা বেড়ে যোগান ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতি দেখা দিচ্ছে, আমরা এ রকম কোনও কথা বলি নি। বরং আমরা বলেছি, উৎপাদন খাতে বেশি ঋণ দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনীতির বাড়তি চাহিদা যোগানোর কথা। আমরা সংযত মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে। এ নীতির ফলে তাই ব্যাংক ঋণের সুদের পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে আমরা মনে করি না (ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই)।'

তবে ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই সিপিডি'র পাশে দাঁড়ালো। সামরিকতন্ত্র ও সামাজিক বাণিজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বাতক পরিস্থিতিতে রক্ষণশীল অবস্থান নেয়াটাই সুবিধাজনক মনে করল তারা। বিবৃতি দিল এফবিসিসিআই, 'নতুন মুদ্রানীতির ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। সংকুচিত মুদ্রানীতির দ্বারা দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না (আমাদের সময়, ১৭ জুলাই ২০০৭)।'

জুলাই মাসের শেষদিকেই বোঝা গেল, সিপিডি ও ব্যবসায়ীরাই ঠিক বলেছেন। এত কঠোর মুদ্রানীতি করেও কোনও জিনিসপত্রের দাম কমানো যাচ্ছে না। মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনও স্বচ্ছতা ছিল না, মূল্যস্ফীতি কমারও কোনও লক্ষণ তাই দেখা গেল না। রাজনৈতিক দলগুলোর চরমতম দুঃশাসনেও এত মূল্যস্ফীতি দেখা যায় নি। সুশীল, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে এ রকম একটি মিথ গড়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর শাসনামলের চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই না কি দেশের জনগণ দুধেভাতে থাকে! এবার সেই মিথের বাহারি পলেস্তরা খসে পড়তে

শুরু করল এবং দেখা যেতে লাগল পুঁজিতাড়িত রাষ্ট্র ও সমাজের মুখব্যাদানো প্রকৃত চেহারা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যে এবং আইএমএফ'কে তুষ্ট করার জন্যে যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা তৈরি করলেন তার মাশুল দিতে লাগল সাধারণ মানুষ। নীরবে বিক্ষোভ দানা বাধতে লাগল। কিন্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাসীদের সৃষ্ট 'পার্লামেন্ট' তথা গণমাধ্যম অবিরাম প্রচার চালিয়ে যেতে থাকল, দুর্নীতিবিরোধী এ সরকারের পেছনে জনগণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আর এই গণমাধ্যমের আলোয় আলোকিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিও আশায় বুক বাধলেন।

মধ্যশ্রেণির এই অপেক্ষাবাদী দেশপ্রেমের মুখে ঝাটা মেরে ২৬ জুলাই ২০০৭-এ বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ : অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বললেন, 'বিশ্বব্যাংকের সুপারিশের সঙ্গে সরকারের তেমন কোন বড় মতপার্থক্য নেই। যেসব পরামর্শ বা সুপারিশ বিশ্বব্যাংক করেছে, সে সব ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি নীতিগতভাবেও কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।' অথচ একই সময়ে সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এ তসলিম বিশ্বব্যাংকের দাওয়াই না মেনে জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে সংস্কার করার ওপর তাগিদ দিলেন। বিশেষ করে বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার পরামর্শ না মেনে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডবিউটিএ) নীতিমালা অনুসরণ করার ওপর জোর দিলেন তারা (প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০০৭)।

পরের মাস আগস্টের প্রথমদিনেই আইসিসি আইসিসি, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই-সহ ১২টি ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা সংবাদপত্র অফিসে এমন একটি বিবৃতি পাঠালেন যেটির নিচে তাদের নাম লেখা না থাকলে সাংবাদিকরা বিবৃতিটিকে বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলির পাঠানো এক গতানুগতিক বিবৃতি বলেই ধরে নিতেন। এতদিন বামপন্থী সংগঠনগুলি যে সত্য প্রচার করে এসেছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি এ দিন সেই সত্যের কাছে মাথা নোয়ালেন। বিবৃতিতে তারা বললেন, ''সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির নীতি-পরিকল্পনায় সরকারের প্রতি আইএমএফের বিভিন্ন নির্দেশনা অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। ...সরকারের উচিত আইএমএফসহ এ ধরনের সব আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যবস্থাপত্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবেশী ও এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা। ...উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হয়েও উলেখযোগ্যভাবে বাণিজ্য উদারীকরণ করেছে, যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডবিউটিএ) আওতায় বাংলাদেশের এতটা না করলেও হতো। এটা খুবই বিস্ময়কর যে আইএমএফের ব্যবস্থাপত্র খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ দুই অঙ্কের মূল্যস্ফীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হতে যাচ্ছে। ...গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির জন্যে আইএমএফ সরকারকে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা হবে অর্থনীতির জন্যে আত্মঘাতীমূলক (প্রথম আলো, ০২ আগস্ট ২০০৭)।''

আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন *ইকনোমিস্ট* (১২ আগস্ট ২০০৭) লিখল, সরকার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে পরিস্থিতির আরও খারাপ করেছে। দীর্ঘদিন আগে থেকে গড়ে ওঠা ও চালু থাকা বাজারগুলির উচ্ছেদ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাতে ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে গরীব মানুষদের। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে আন্ত র্জাতিক বাজার। কমপক্ষে ৭০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বাংলাদেশে আমদানি করতে হয় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে। কিন্তু প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই দাম বেড়ে গেছে কমপক্ষে ২০০ ডলার থেকে ৩০০ ডলার। ভোগ্যপণ্য আমদানিকারকরা এ জন্যে দোষারোপ করছিলেন সরকারকেই। তারা বলছিলেন, সরকার যদি মার্চ মাসেও উদ্যোগ নিতো তা হলে চাল ও গমের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দুটি অন্তত পক্ষে ১৫০ ডলার থেকে ২০০ ডলার কম দামে কেনা যেতো।

ইকনোমিস্ট পত্রিকায় এ প্রতিবেদন প্রকাশের দুদিনের মাথায় ১৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক পরিপত্র জারি করল, যাতে বিভিন্ন পণ্যের বাজারমূল্যের অসহনীয় উর্ধ্বগতি কমানো যায়। চাল, গম, চিনি, ভোজ্যতেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), ডাল, পিঁয়াজ, ছোলা, মটর, মসলা ও খেঁজুর আমদানিতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হলো। ঋণ ও আমদানিতে সুদের হার এর আগে ব্যাংকগুলিই নির্ধারণ করত। এই পরিপত্র জারি করা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকে আমদানিপণ্যে সুদের হার ছিল ১৪ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিপত্রের প্রতিক্রিয়ায় অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ নাসের বখতিয়ার আহমেদ বললেন, 'এর সুবিধা ভোক্তাদের কাছ পর্যন্ত নাও পৌছাতে পারে। সুদহার কমিয়ে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করে দেয়ায় ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। অন্যদিকে আমদানিকারকরা লাভবান হবেন। কিন্তু যাদের উদ্দেশে এ ব্যবস্থা তারা হয়তো উপকৃত হবে না (প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০০৭)।'

১৫ আগস্ট আইসিসি বাংলাদেশ, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ঢাকা চেম্বার, চট্টগ্রাম চেম্বার সহ ১৩টি বাণিজ্যিক সংগঠনের নেতারা যৌথ বিবৃতি দিলেন। বললেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বব্যাংকের নীতি আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি কৃষিখাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যেমনটি আমাদের সোনালী আঁশ পাটের ক্ষেত্রে হয়েছে। ...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও অন্যান্য উন্নত দেশ এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশ কৃষকদের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উচ্চহারে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশে আমরা বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় না এনে বিপরীতধর্মী কাজ করছি, যার প্রভাব বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় পড়বে।' তাঁরা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষিঋণের সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে 'আত্মবিধ্বংসী' বলে উলেখ করে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার দাবি জানালেন। বললেন, 'মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্যে সব ধরনের বিনিয়োগের ওপর সুদের হার কমানো হোক। ...বিদেশী সাহায্য আমাদের জিডিপি'র ৩ শতাংশেরও কম, যার বিরাট অংশই হচ্ছে ঋণ এবং এ ঋণ পরিশোধের দায়ভার বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের ঘাড়েই বর্তায় (প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট ২০০৭)।"

১৬ আগস্ট বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সংগঠন এবিবি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গৃহীত কয়েকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এক বিবৃতি দিলো। এবিবি'র বিবৃতিতে বলা হলো, আমদানি ঋণে সুদের ১২ শতাংশ নির্ধারণ করায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারমূল্যে কোনও প্রভাব পড়বে না, কিন্তু ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা থেকে বঞ্চিত হবে। ঋণপত্র (এলসি) ও বিভিন্ন ধরনের গ্যারান্টি ও স্বীকৃতি বিলের বিপরীতে এক শতাংশ হারে সঞ্চিতি (প্রভিশন) সংরক্ষণের বিধান জারির ব্যাপারে আপত্তি তোলা হলো। অর্থঋণ আদালত-৩ এর বিভিন্ন কার্যক্রমেও অসন্তোষ জানালো হলো (প্র.আ. ১৭ আগস্ট ২০০৭)। কয়েকদিন পর ২৭ আগস্ট বিশ্বব্যাংক আয়োজিত এক কর্মশালায় অর্থনীতিবিদ হোসেন জিলুর রহমানকে বলতে শোনা গেল, 'বাংলাদেশে যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা দরিদ্রকেন্দ্রিক নয়, তা ছাড়া সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডও দরিদ্রবান্ধব নয়। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে কিছু ভুল দার্শনিক ভিত্তি ছিল। ঢালাওভাবে গ্রামীণ হাটবাজার ভাঙার কারণে দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য ব্যবসায়ীমহলও আস্থার সংকটে পড়েছেন (যুগান্তর, ২৮ আগস্ট ২০০৭)।'

এই আস্থার সংকটের ছাপ পড়তে লাগল অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। নীতিপরিকল্পনার বিষয়গুলি নিয়ে দ্বন্দ্ব তীব্র হলো। ছয় সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ *বিআইডিএস* আয়োজিত 'নীতিপ্রণেতা ও নীতি : অতীত থেকে ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গোলটেবিলে দেশের অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদরা টেকসই উন্নয়ন কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিলেন। তাঁরা বললেন এ কৌশলের স্বার্থে জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্বাধীনভাবে নিজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়ার কথা। পথিকৃৎ অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বললেন, 'নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। নির্বাচনের সময় তারা জনগণের কাছ থেকে গণতান্ত্রিকভাবে যে সমর্থন পায়, এর মাধ্যমে তাকে সম্মান জানানো হবে। নীতি প্রণয়নের জন্যে আপনাদের অবশ্যই জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন পড়বে। এটা কোনো তামাশা নয়।'

আবারও সেই রাজনৈতিক দল! সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের গায়ে ফোস্কা পড়ল রেহমান সোবহানের কথায়। তিনি বললেন, 'বিশ্ব-অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির ওপরই অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত নীতি স্বাধীনতার বিষয়টি আপনা থেকেই খারিজ হয়ে যায় (প্রথম আলো, সাত সেপ্টেম্বর ২০০৭)। ওদিকে মূল্যস্ফীতি কমল না কিছুতেই। আট সেপ্টেম্বর সিপিডি আয়োজিত সেমিনারে মূল্যস্ফীতির কারণ নিয়ে আবারও বিতর্ক হলো অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির প্রবণতা বিশেষণ ও নীতি বিকল্প' শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধে যুক্তরাজ্যের আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এস আর ওসমানী বললেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়া মূল্যস্ফীতির একটি বড় কারণ। তবে যেসব দেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করা হয়, সেসব দেশের মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশের টাকার অবমূল্যায়ন বেশি হওয়ায় মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ পড়েছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। বললেন, 'বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের সঙ্গে মূল্যস্ফীতির একটি সম্পর্ক থাকলেও, পরিসংখ্যান অনুযায়ী দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদে তাৎপর্যপূর্ন কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।' কারণ যাই হোক না কেন, কয়েকদিনের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া গেল মূল্যস্ফীতি দু সংখ্যার কোঠায় যাওয়ার আশংকা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জানালো, জুলাই মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ১০ শতাংশ। খাদ্যসূচকে এই মূল্যস্ফীতি ১২ দশমিক ৪৫ আর খাদ্যবহির্ভূত সূচকে আট দশমিক ৫৪ শতাংশ (যুগান্তর, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭)! এই মূল্যস্ফীতি দ্রুত একের ঘরে নেমে আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কেননা সর্বশেষ ডিসেম্বরেও গভর্নর জানিয়েছেন, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে অক্টোবর মাসেও মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ছয় শতাংশ (প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০৭)।

এরই মধ্যে প্রকাশিত হয় ২০০৭-এর জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তার ওপর পিপিআরসি'র একটি সমীক্ষা। 'বাজার ও পণ্যমূল্য' শীর্ষক এই সমীক্ষায় অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিলুর রহমান দেখালেন, 'দীর্ঘ সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপাইচেইন) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ।' ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ *পিপিআরসির* সেমিনারে এই গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম দ্বিমত পোষণ করে বললেন,

'উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যেকার তফাৎ মূল্যবৃদ্ধির কারণ।' তার মানে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কোনও সংকট নেই! শুধু তাই না, তিনি আরও বললেন, 'আলার নামে শপথ করে বলছি, আইএমএফ-এর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি (প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।'

মূল্যস্ফীতির এই ভেলকিবাজি এখনও চলছে। গত ১০ জানুয়ারি ২০০৮-এ জানুয়ারি-জুন সময়কালের জন্যে আগাম মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তার আগের দিন জানা গেছে, বাংলাদেশে এখন মূল্যস্ফীতির হার ১১ দশমিক ২১ শতাংশ, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। মূল্যসূচক সবচেয়ে বেশি খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। জানুয়ারি ২০০৭-এ খাদ্যপণ্যের মূল্যসূচক ছিল সাড়ে ছয় শতাংশ; নভেম্বর ২০০৭-এ তা উঠে এসেছে ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশে। তার মানে সরকারি হিসেবেই বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম সমন্বিতভাবে এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। অন্যদিকে নভেম্বর ২০০৭-এ খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে মূল্যসূচক বেড়ে উন্নীত হয়েছে সাত দশমিক ২৫ শতাংশে (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০৭)।

মাসখানেক পরে ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ পৃথিবীর অন্যতম গ্রহণযোগ্য পত্রিকা দি ইকনোমিস্ট-এর ইকনোমিস্ট ইনটেলিজেন্ট ইউনিট ইআইইউ জানায়, বাংলাদেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতি গত নয় বছরের সর্বোচ্চ এবং এ বছর তা আরও বাড়বে। যদিও বিনিয়োগ বাড়বে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও আর চাইছে না তাদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে। কারণ, কেউ না বললেও, খুবই পরিষ্কার : দেশে রাজনৈতিক সরকার নেই। একটি রাজনৈতিক সরকারের গুরুত্ব কত তা বোঝা যায় দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করলেও। ইআইইউ-এর হিসেবে, চলতি অর্থ বছরের (২০০৭-০৮) প্রথম পাঁচ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। অথচ গত অর্থ বছরের (২০০৬-০৭) একই সময়ে তা ছিল ২০ শতাংশ! সুশীল সামরিকতন্ত্র আমাদের আমলাতন্ত্রকে করেছে আরও মন্থর! ইআইইউ-এর হিসেবে, গত নভেম্বর ২০০৭ অবধি সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক দুই। খাদ্যসূচকে মূল্যস্ফীতি ছিল ১৩ দশমিক আট, তবে শহরে তা ছিল ১৫ দশমিক পাঁচ। আর চলতি অর্থ বছরে দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) হবে পাঁচ দশমিক আট শতাংশ।

অন্যদিকে জানুয়ারি ২০০৮-এ মুদ্রানীতি তুলে ধরার সময় বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, চলতি অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) হবে ছয় থেকে ছয় দশমিক দুই শতাংশ পর্যন্ত। তার আগে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ। অনুমানের এই হেরফের নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, 'বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ তো দেশ চালায় না। আমরা বাস্তবতার কাছাকাছি থাকি (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০৮)।' তিনি আরও জানান, আগামী ছয়মাসে জিনিসপত্রের দাম কমবে। মূল্যস্ফীতির হার বছর শেষে আট থেকে আট দশমিক দুই শতাংশে নেমে আসবে। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য দেয়ার পরও জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য বলছে দাম বাড়ছে পাঁচ কারণে : উচ্চ ঋণ প্রবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়, বাজারে অসাধু ব্যবসায়িক চক্র ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কারণে ব্যবসায়ীদের আস্থার সংকট (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০৮)। কিন্তু এর বাস্তব কারণ নিহিত আরও গভীরে। বাস্তবতা হলো, ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে ধ্রুপদী মুক্ত বাজারের দিকে। প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো এই ধ্রুপদী মুক্ত বাজার বাণিজ্যবাদীদের স্বার্থের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়, বরং তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসায় এ প্রচেষ্টায় আরও জোরালো হাওয়া লেগেছে। ফলে বাংলাদেশের ভাগ্য আরও ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের অনুকুলতা ও প্রতিকুলতার সঙ্গে। যেমন, গত আট ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ ভারত আন্তর্জাতিক বাজারে বাসমতি ছাড়া অন্য সব চালের রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করে। এ ঘোষণাকে কাজে লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম বাড়িয়ে দেয় ব্যবসায়ী চক্র। বাংলাদেশের শাসকচক্র এখন অপেক্ষা করছে আরও একটি সুযোগের, বাজারব্যবস্থা পুনর্গঠন করার মতো সুযোগের। আর তাদের জন্যে সেই সুযোগ নিয়ে আসছে লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য, লাগামছাড়া অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

অর্থনীতিসঞ্জীবনী সুরা এবং গণতন্ত্রহীনতা বনাম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত আমাদের আতংকিত করে। কিন্তু অর্থনৈতিক যুদ্ধ সশস্ত্র সংঘাতের চেয়ে ভালো কিছু নয়। এটি হলো অস্ত্রোপচারের মতো। অর্থনৈতিক যুদ্ধ হলো প্রলম্বিত নির্যাতন। এবং এর ধ্বংসলীলা যুদ্ধের সাহিত্যে ঠিক যেভাবে বর্ণিত হয় তার চেয়ে কম ভয়াবহ নয়।

–মহাত্মা গান্ধী, অহিংস – সবচেয়ে বড় শক্তি, ১৯২৬।

একদিকে মূল্যস্ফীতি ঘটছে, অন্যদিকে রপ্তানি কমছে, বিদেশি বিনিয়োগের কোনও দেখা নেই। যদিও সরকার বলছিলেন, রপ্তানি আয় ক্রমাগত বাড়ছে। প্রকৃতার্থে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের দু হাত খুলে সুবিধা দিতে হচ্ছিল সরকারকে। এই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। আর তাই দেশের মানুষ না পেলেও সেই সুবিধার সুবাদে নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্য রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। এমন কিছু পণ্য আছে, যা রপ্তানি হয়ে যাওয়ার পর চোরাপথে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে! আগেকার সরকারগুলোর এই ঐতিহ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বহাল রেখেছেন।

তা ছাড়া চূড়ান্ত হিসেবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রপ্তানি খাতে আয় কমে গেছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম আয় হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট এক হাজার ২৫০ কোটি মার্কিন ডলারের সমান (৮৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) মূল্যের পণ্য। কিন্তু জুন ২০০৭ পর্যন্ত রপ্তানি হয় এক হাজার ২১৭ কোটি টাকা ৭৮ লাখ ৬০ হাজার ডলারের সমমূল্যের পণ্য। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩২ কোটি ২১ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারের সমান মূল্যের কম পণ্য রপ্তানি হয়। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার ৫২ কোটি ৬১ লাখ ৬০ হাজার ডলার মূল্যের পণ্য। রপ্তানিমাত্রার বিচারে সরকার ঠিকই বলেছেন– আগের বছরের চেয়ে এই অর্থবছরে রপ্তানি আয় বেশি হয়েছে। কিন্তু সরকার বলছেন না, আমদানি খাতে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় এ সময় বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৩৪ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার বা ২৫ হাজার ৫৫৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। যা এই সাফল্যকে ম্লান করে দিয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মোট এক হাজার ৫৯৭ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার (এক লাখ ১১ হাজার ৭৯৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা) মূল্যের পণ্য আমদানি করা হয়। আগের বছর ২০০৫-০৬ সালে এই আমদানির পরিমাণ ছিল, এক হাজার ৩৯৪ কোটি ৯৯ লাখ ডলার মূল্যের পণ্য। তার মানে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ২০২ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি বেশি হয়েছে। এই বিপুল আমদানি ব্যয় রপ্তানির সাফল্যকে ম্লান করে দিয়েছে। এমনকি ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দেয়া সবশেষ হিসেবেও দেখা যাচ্ছে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ প্রান্তিকে রপ্তানিতে ছিল ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি– পাঁচ দশমিক চার শতাংশ (প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০৭)!

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিতে চলছে ভয়াবহ মন্দা। যা ছিল এবারের দাভোস সম্মেলনের আলোচনার প্রধান বিষয়। এ বছর মার্কিন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দুই দশমিক এক থেকে কমে নেমে আসবে এক দশমিক পাঁচে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রবৃদ্ধি নেমে আসবে দুই দশমিক ছয় শতাংশ থেকে এক দশমিক নয় শতাংশে। বাংলাদেশের জন্যে দুঃসংবাদ হলো, এ দুটি বাজারই তার প্রধান রপ্তানিপণ্য বাজার।

একদিকে আমদানিরপ্তানির এই হাল, অন্যদিকে ব্যাংকগুলিতে জমে উঠেছে অলস টাকা। দেশের তফলিসি ব্যাংকগুলিতে পড়ে রয়েছে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এমন কোনও সম্ভাবনাময় খাত না কি পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে এ সব টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। এ সত্যিই এক সংকটজনক পরিস্থিতি– সারা বিশ্বে যেখানে ২০০৬ সালে বিদেশি বিনিয়োগ আগের সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেড়ে গেছে, বাংলাদেশে সেখানে ছয় শতাংশ কমে গেছে! ২০০৭ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিনিয়োগ বোর্ডে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ৩০ শতাংশ কমে গেছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে ২৬টি দেশের বিনিয়োগকারীরা। এর মধ্যে চীন, হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারতসহ ১০টি দেশের বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ বিনিয়োগকারীর পছন্দের খাত হলো গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সেবাখাত। ২০০৬ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হয় চীনে। আর বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বব্যাংকিং-এ আরও দু ধাপ পিছিয়ে ১২১তম স্থানে নেমে যায়। সারা পৃথিবীতে এ বছর মোট এক হাজার ৩০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ হলেও বাংলাদেশ খুব কমই সুবিধা করতে পারে। শুধু বাংলাদেশ কেন, পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিদেশি বিনিয়োগের ৯২ শতাংশই যাচ্ছে বিশ্বের ১০টি দেশে। এ ১০টির মধ্যে আবার পাঁচটি দেশেই বিনিয়োগ হচ্ছে ৬৬ শতাংশ। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু দেশ যে একচেটিয়াত্ব তৈরি করেছে তা কি কেবল তাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে আমাদের নীতিনির্ধারকরা অবশ্য বার বার দোষ চাপিয়েছেন এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর!

বিনিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে জাতিসংঘের আঙ্কটার্ড রিপোর্ট ২০০৭-এর ওপর ভিত্তি করে 'বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট ২০০৭' প্রকাশ উপলক্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন আশঙ্কা করলেন, চলতি বছর বিদেশি বিনিয়োগ আরও কমে যেতে পারে! বলা হলো, গেল বছর বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়েছেন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণে। আর এ বছর না কি বিনিয়োগ হবে না আইনি জটিলতা ও বিভিন্ন অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে!

বাংলাদেশে ২০০৫ সালে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৭৯ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারে। যা আগের বছরের চেয়ে পাঁচ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ছয় শতাংশ কম। প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে 'বেটার কনফিডেন্স ফোরাম' গঠনের উদ্যোগ

নিয়েছেন– এ ছাড়া ওই সংবাদ সম্মেলনে আর কোন আশার আলোই দেখাতে পারলেন না নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন। বরং আরও একটু হতাশা ছড়ালেন পাইপ লাইনে থাকা প্রায় এক হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগের কথা উলেখ করে। বিশাল অংকের এই বিদেশি বিনিয়োগ পাইপ লাইনে পড়ে থাকার একটাই মানে, নতুন কোনও বিদেশি উদ্যোক্তার এখানে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই। সাংবাদিক সম্মেলনে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম. ইসমাইল হোসেন জানান, দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ভারতে– এক হাজার ৬০৯ কোটি মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান– যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪০৩ কোটি মার্কিন ডলার। আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ– ৭৯ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যেখানে গণতন্ত্র নেই, রয়েছে গণতন্ত্রের অধিক সামরিকতন্ত্র ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ হয় না। সে কারণেই দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানে বিদেশি বিনিয়োগ সবচেয়ে কম,– মাত্র ২০ লাখ মার্কিন ডলার। কিন্তু সরকার ও অর্থনীতিবিদরা সোজাসুজি গণতন্ত্রহীনতাকে দায়ী না করে, সামরিকতন্ত্র ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে দায়ী না করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বিদেশি বিনিয়োগ না হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকতে পারে, দেখা দিতে পারে। ভারতই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদিও গণতন্ত্রচর্চার প্রতি তাদের দৃষ্টান্তমূলক অঙ্গীকার থাকায় রাষ্ট্রটিতে থেমে নেই বিদেশি বিনিয়োগপ্রবাহ।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এখানকার নীতিনির্ধারকরা গণতন্ত্রহীনতা আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে একই মনে করেন। তাতে সুবিধা এই যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে রক্ষা করা যায়, সামরিকতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতা ও বিত্তের ভাগবাটোয়ারা করা যায় এবং কাগজেকলমে দেখানো যায় যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সামরিকতন্ত্র নয়, বরং রাজনৈতিক দলগুলিই গণতন্ত্রচর্চার সবচেয়ে বড় হুমকি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তাই করছেন। বছরের প্রথম আট মাস তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাণমন দিয়ে চেষ্টা করেছেন পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রাজনৈতিক দুর্বত্তপণার বায়োস্কোপ দেখানোর পাশাপাশি গোপনে গোপনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'এর বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন অনুমোদন করে, দেশকে পঙ্গু করে একটি সুন্দর অর্থনৈতিক রেডলাইট এলাকায় পরিণত করার দরজা খুলে দিতে। এই দেশে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর রয়েছে, ফুলবাড়ির কয়লাখনি রয়েছে, সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর রয়েছে, গ্যাস-তেল-খনিজ সম্পদ রয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের কাছ থেকে তো এইসব দিয়ে অর্থনৈতিক রেডলাইট এলাকা গড়ে তোলার অনুমোদন পাওয়া যাবে না। তাই তারা হুড়োহুড়ি করতে লাগলেন।

সরকার হয়তো ভেবেছিলেন, পিএসআই ব্যাপারটা তো আর তেল-গ্যাস-কয়লাখনি নয়। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি'র সরকার তা বুঝতে পারে নি, তাই চুক্তিটা ঝুলিয়ে রেখেছে! আমরা বরং ওটা দিয়েই শুরু করি। পাবলিক কিছু বোঝার আগেই চুক্তি হয়ে যাবে। পরে যদি টেরও পায়, কোনও অসুবিধা নেই– ততদিনে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে। তারা বলবে, আগের সরকার এ চুক্তি করে রেখে গেছে, কাফকোর মতো এ চুক্তি আমাদের এখন আজীবন টানতে হবে।

কিন্তু জরুরি অবস্থা থাকার পরও প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি হলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রতিবাদ এলো অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকেই। মুদ্রানীতি নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিতর্ক তাদের ভয় কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার তারা আরও উচ্চকিত হয়ে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। প্রতিবাদে উচ্চকিত হলো বামপন্থী দলগুলো। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে দুটি প্রধান দলকে রাজ নৈতিকভাবে মৃত বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন সেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ ব্যাপারে মুখই খুলল না। একটি উদাহরণ রেখে দিল তারা,– ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'এর তাবেদারিতে তারাও পিছপা হবে না।

তবে *আইএমএফ* প্রতিনিধিরা বুঝতে পারছিলেন, সরকার গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। ঢাকায় তারা এসেছিলেন *আইএমএফ*এর দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের উপদেষ্টা থমাস রামবাউয়ের নেতৃত্বে *পিএসআই* (পলিসি সাপোর্ট ইন্সট্রুমেন্ট) চুক্তি সম্পাদন করতে। কিন্তু চুক্তিসম্পাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক শেষ করে ১২ সেপ্টেম্বর তাই থমাস রামবাউ বললেন, এ মুহূর্তেই বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও চুক্তি নয়, বরং আইএমএফ সম্পর্কে বাংলাদেশের মনোভাব জানতেই তাদের সব কথা শুনতে এসেছি। আর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা বললেন, 'আইএমএফ-এর সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী কোনও চুক্তি হবে না। তবে ভবিষ্যতে যদি কোনও চুক্তি হয়, তবে তা জনগণকে জানাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও আপত্তি নেই (আমাদের সময়, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।'

অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা বা অর্থমন্ত্রীর পদাধিকারী একজন যখন বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও আপত্তি নেই' তখন বোঝা যায় সামষ্টিকভাবে তিনি কী চাপের মুখে আছেন। তবে ১৫ সেপ্টেম্বর অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদ *আইএমএফ*এর তীব্র সমালোচনা করলেন। এক সেমিনারে তিনি *আইএমএফ* ও *পিএসআই*এর সমালোচনা করে বললেন, 'আইএমএফ যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। কেবল আইএমএফ নয়, নিজের ঘর দেখতে হবে। আইএমএফ থেকে ঋণ নেব কি না সে ব্যাপারে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ দেশে অর্থনীতিবিদদের সাথে আলোচনা

ছাড়াই যে কোনও নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন আমলারা। এরশাদ আমলে যারা মন্ত্রী ছিলেন তাদের অনেকে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। তাই দাতাদের মন মানসিকতা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে নি।' আর অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান বললেন, 'আইএমএফকে বিদায় করে দেয়া যায় কি না তা বিবেচনা করার সময় এসেছে। আরেকটি পিআরজিএফ চুক্তির দরকার নেই (ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।

পিএসআই চুক্তি করা হলে নতুন কোনও ঋণ না পেলেও বা ঋণ করা না হলেও বাংলাদেশকে আইএমএফ-এর দেয়া নানা শর্ত পূরণ করতে হতো। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তাই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মেসবাউল ইসলাম বাদী হয়ে আইএমএফ-এর সঙ্গে সরকারের এ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। আবেদনে বলা হলো, সংবিধানের ৫৮(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীতিনির্ধারণী কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। পরের দিন ১৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা ও বিচারপতি মোঃ আবু তারেকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শুনানি শেষে *আইএমএফ*এর সঙ্গে নীতিসমর্থন কৌশল (পিএসআই) চুক্তি করা থেকে সরকার কেন বিরত থাকবে না দু সপ্তাহের মধ্যে তার ব্যাখ্যার জন্যে কারণ দর্শাও নোটিশ দিলেন। এইদিন আরও এক ঘটনা ঘটল। *আইএমএফ*এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো বাজার থেকে মুদ্রা সরবরাহ নীতি অর্থাৎ মুদ্রা সংকোচন নীতি আর অনুসরণ করবে না তারা। তার বদলে উদ্যোগ নেবে মুদ্রা সম্প্রসারণমূলক নীতি অনুসরণের। আলোচনা শেষ করে সাংবাদিকদের কাছে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালাহউদ্দিন আহমদ বললেন, 'আমরা এখন নিজেদের মতো নিজেরা চলব। আইএমএফ তাদের মতো তারা বলেছে। কিন্তু আমরা আমাদের মতো চলব।'

পরের দিন ১৮ সেপ্টেম্বর *আইএমএফ* প্রতিনিধিরা জানালেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আপাতত নীতিসমর্থন কৌশল (পিএসআই) বা অন্য কোনও চুক্তি আপাতত করা হচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ চাইলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন করে দারিদ্র দারিদ্র বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক (পিআরজিএফ) চুক্তি হতে পারে (প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭)!

এইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার *আইএমএফ*এর চুক্তিতে সই দিয়ে অর্থনীতিতে মহাসন্ত্রাসের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা থেকে পিছু হটলেন। হতে পারে, আমরা কোনওদিনই জানতে পারব না কেন আরও আগেই সরকার পিএসআই চুক্তিতে স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ায় নি। জানতে পারব না, কেন হঠাৎ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের এত বেশি বোধোদয় হলো যে তিনি বললেন, আমরা এখন নিজেদের মতো চলব! জানতে পারব না, এর আগে নিজেদের মতো চলতে কে তাদের বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এ টুকু আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারলাম, একটি মহাসন্ত্রাসের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা এবং অন্য সব সন্ত্রাসের কথা বাদ দিলেও কেবলমাত্র এই সন্ত্রাসের জন্যেই তারা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরঅপরাধী হয়ে থাকবেন।

*আইএমএফ*এর সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদনের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে সরকার আগস্ট ২০০৭ থেকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টাও জোরেশোরে শুরু করে। মুখে অবশ্য তারা বলছিলেন, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের কোনও দূরত্ব নেই। কিন্তু গোপনে গোপনে চলছিল সমঝোতার প্রচেষ্টা। চার সেপ্টেম্বর আইএমএফ-এর রাজস্ব পরামর্শক নেইল উইলিয়াম ব্রকের সঙ্গে বৈঠকের পর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ''দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ফলে দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের কোনও দূরত্ব তৈরি হয় নি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনও আস্থাহীনতা দেখা দেয় নি। অর্থনীতির সাম্প্রতিক সূচকগুলো অনাস্থার ব্যাপারটিকে নির্দেশ করে না। বরং কেয়ারটেকার সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও কঠোর আইনী প্রয়োগ আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো সুসংগঠিত করবে (ইত্তেফাক, ০৫ সেপ্টেম্বর)।'' কিন্তু এরপরই আবার বলেন, 'তবে কিছু কিছু বিষয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সে বিষয়গুলো সরকার চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।'

অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা যত হালকা করে দেখার চেষ্টাই করুন না কেন, পরের দিন পাঁচ সেপ্টেম্বর হোটেল র‍্যাডিসনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ আর সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ দু জনই উপস্থিত থাকার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দিলেন, 'সরকারের নেয়া বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কারণে ব্যবসায়ীদের সাময়িক অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত তারাও এর সুফল পাবেন। ...ব্যবসায়ীদের আস্থা ফেরাতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সরকারের আগ্রহ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের হয়রানি ও অনিশ্চয়তা দূর করতে সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করবে। বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপের ব্যাপারে ব্যবসায়ী মহলের প্রতিক্রিয়া জানতে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি ফোরাম গঠন করা হবে।' অন্যদিকে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ 'মূল প্রবন্ধ' উপস্থাপন করলেন। বললেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই, কোনও ব্যবসায়ীকেই অযথা হয়রানি করা হবে না (সমকাল, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।' ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে মূল প্রবন্ধে ১১ দফা ফর্মুলা দিলেন তিনি। এর অর্থ ছিল খুবই সহজ,– দেশের রাজনীতির মতো অর্থনীতিকেও

সামরিকতন্ত্র তাদের ছক অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চায় এবং আগামী নির্বাচনে যে সরকারই আসুক না কেন, এই ছকই অনুসরণ করতে হবে তাদের। আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বৈঠক করলেও এই ছক উপস্থাপন করে সামরিকতন্ত্র ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দিল, কী করলে আস্থা ফিরিয়ে দেয়া হবে।

ব্যবসায়ীদের সংগঠন ও ব্যবসায়ীদের তা না বোঝার কথা নয়। তারা তাই সবাক হলেন। দাবি উঠল দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে আটক ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দেয়ার। সরকারও মুখ খুললেন। ২৩ সেপ্টেম্বর সরকারের পক্ষ থেকে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বললেন, 'কোনও ব্যবসায়ী তার অপরাধ স্বীকার করে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি ফেরৎ দিতে চাইলে তার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে। ...যারা বড় বড় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিচারের প্রশ্ন জড়িত থাকার পরও সরকার এটাও চিন্তাভাবনা করছে যে, অর্থনীতিকে সচল করার জন্যে ব্যবসায়ীদের কতটা ভিন্নভাবে দেখা যায় (আমাদের সময়, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।'

এইভাবে সমঝোতার একটি কথিত আইনসম্মত পথ তৈরির কাজ শুরু হলো। অক্টোবরের প্রথম দিকেই ঘোষণা এলো ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির দায় থেকে রেহাই দিতে ট্রুথ কমিশন করা হচ্ছে। ছয় অক্টোবরে ব্যবসায়ীদের স্বস্তির স্বর ভেসে এলো তাদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মীর নাসির হোসেনের কণ্ঠ থেকে। তিনি আরও একটু এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'বিভিন্ন দেশেই ট্রুথ কমিশন গঠন করে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের দুর্নীতিমুক্ত করার নিয়ম প্রচলিত আছে। তাই সরকারের উচিত দেশের অর্থনীতির স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব এ ধরনের কমিশন গঠন করা (সমকাল, সাত অক্টোবর ২০০৭)।'

ব্যবসায়ীরা ট্রুথ কমিশনের মাধ্যমে রেহাই পেতে চলেছে দেখে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরাও নড়েচড়ে বসল। তাদের কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বের হতে লাগল, খালি ব্যবসায়ী নয়, সবাইকেই এই সুযোগ দেয়া উচিত!

৯ মার্চ ২০০৮-এ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এপ্রিল ২০০৮ থেকেই কার্যকর হবে ট্রুথ কমিশন। আর এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশের বাংলা নাম হবে – স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ ২০০৮। দেখা গেল, দুদক বা দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। অবসর জীবনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে এ ব্যাপারে আর কোনও কিছু বলতে শোনা গেল না। তা ছাড়া সরকার অধ্যাদেশ জারির আগেই ঘোষণা দিলেন, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানকারীর সামাজিক মর্যাদা অনুসারে কমিশন সহানুভূতিশীল আচরণ করবে। এমনকি প্রয়োজনে গোপনীয়তাও রক্ষা করা হবে, ভদ্র শ্রেণির এই দুর্নীতিবাজকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং রক্ষা করা হবে সব ধরণের ভয়ভীতি থেকে!

কিন্তু সত্যিই কি পৃথিবীর কোনও দেশে ট্রুথ কমিশন এইভাবে দুর্নীতির দায় থেকে কাউকে রেহাই দিয়েছে? ইতিহাস কি তাই বলে? সে রকম বলে না। আর্জেন্টিনা, চিলি, এল সালভেদর, ফিজি, ঘানা, গুয়াতেমালা, লাইবেরিয়া, মরক্কো, পানামা, পেরু, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব তিমুর, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে ট্রুথ কমিশন আদলের বিভিন্ন কমিশনগুলোর সব ক'টিরই প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল মানবাধিকারজনিত অপরাধ। এবং এ সব বিচার হয়েছে প্রকাশ্যে, এ গুলো নিয়ে অনেক প্রামাণ্যচিত্রও রয়েছে। ট্রুথ কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্ক ও সমালোচনাও রয়েছে। তবে দুর্নীতিকে বৈধতা দেয়ার জন্যে পৃথিবীর কোনও দেশেই ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো একেবারেই আলাদা এক সরকার। তারা ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার নামে পৃথিবীতে নতুন এক উদাহরণ সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেন!

আস্থার সংকট অবশ্য কেবল ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই ছিল না। আস্থার সংকট সরকার সৃষ্টি করেছিলেন সকলের সঙ্গেই। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যেহেতু অর্থনৈতিক পরিকেন্দ্রে প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করছেন, সেহেতু তাদের সঙ্গেকার সংকটই সবার চোখে পড়ছিল বেশি-বেশি করে। ১১ জানুয়ারিতে সিভিল সোসাইটি, কর্পোরেট ব্যবসায়ী ও সামরিকতন্ত্রের সমঝোতা ও আপাতঐক্যের একটি গ্রন্থি ছিল এই যে, সমস্ত দুর্নীতি ও অস্থিতিশীলতার দায় দু নেত্রী, তাদের পারিবারিক সদস্য ও রাজ নৈতিক দলগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের জন্যে একটি স্থিতিশীলতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলবেন; এই স্থিতিশীলতার আড়ালে তারা প্রতিষ্ঠা করবেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দুর্নীতির রাজত্ব, যা সাধারণ, বিশেষত মধ্যশ্রেণির মানুষকে পারতপক্ষে স্পর্শ করবে না এবং তাই তারা আর এগুলো নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলে নিজেদের নিরুপদ্রব জীবনকে উপদ্রুত করতে যাবে না। হিটলারের একটি কথা আছে, 'সরকারের সৌভাগ্য এই যে জনগণ কোনও চিন্তা করে না।' তত্ত্বাবধায়ক সরকারও চাইলেন রাজনীতির এমন এক পরিসর, যেখানে থিতু হয়ে বিবিধ সামাজিক স্তরের মানুষরা আর সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, সমালোচনা চাইবে না নিজেদের স্থিতিশীলতা নড়বড়ে করতে। কিন্তু এই কাজটি তত সহজ ছিল না। অচিরেই বিশেষত ব্যবসায়ী শ্রেণি উপলব্ধি করল, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডল থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনর্বিন্যস্ত হবে সিভিল প্রতিনিধি ও সামরিকতন্ত্রীদের মধ্যে। এই পুনর্বিন্যস্ত ক্ষমতা তারা ভোগ করবেন রাজনীতিকদের ঢাল হিসেবে রেখে। সিভিলতন্ত্রী ও সামরিকতন্ত্রীরা কর্পোরেট স্বার্থ দেখার যত প্রতিশ্রুতিই

দিক না কেন, ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে লাগল। কেননা রাজনীতি থেকে ব্যবসায়ীদের বিদায় করে দিয়ে সুশীল ও সামরিকতন্ত্রীরা কীভাবে কর্পোরেট স্বার্থ দেখবেন তা তারা পরিস্কার করতে পারছিলেন না। উপরন্তু সামরিকতন্ত্রের প্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ে রাজনীতিকদের ঢালাওভাবে দায়ী করে উপদেষ্টা পরিষদ নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার পথও রুদ্ধ করে ফেলছিলেন। ব্যবসায়ীরা তাই চাইলেন এদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে।

ট্রুথ কমিশনের প্রতিশ্রুতি সেই দূরত্ব অনেকটাই কমিয়ে আনল। দূরত্ব আরও কমল নভেম্বরের মাঝামাঝি ভয়াবহ সাইক্লোন সিডর হওয়ার পর। ব্যবসায়ীরা মুক্ত হতে শুরু করলেন। রাজনৈতিক সরকার ছাড়া, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার ছাড়া যে দুর্নীতিবাজদের বিচার করা সম্ভব নয়, দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়, কেবল দুর্নীতি দমনের নামে সাময়িক চমক তৈরি করা সম্ভব সেই সত্য আবারও প্রমাণিত হলো।

সরকার অবশ্য আরও একটি চমক তৈরি করেছিলেন। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের বিদেশে পাচার করে দেয়া টাকা ফিরিয়ে আনার চমক। রীতিমতো মিথের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এই চমক। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম অনেকটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনা অত সহজ সহজ নয়। তবে চেষ্টা অব্যাহত রাখা রয়েছে।' এই অব্যাহত চেষ্টার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট জেনারেল) আজ গ্রেট ব্রিটেনে তো কাল নিউইয়র্কে ছুটে বেড়ালেন; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। কেননা গোয়েন্দাদের কাছে অর্থপাচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য থাকলেও আইনী জটিলতা দেখা দিল। বিশ্বব্যাংকের কাছে সহায়তা চেয়ে সরকার চিঠি পাঠালো। কিন্তু সে চিঠির জবাবই এলো না। মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সহায়তার জন্যে চিঠি পাঠিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না। বাস্তবত আইনি প্রক্রিয়ায় পাচার হওয়া অর্থের এক টাকাও ফেরৎ আনা গেল না। কারণ বাংলাদেশের কোনও নাগরিকের বিদেশে পাচার করা অর্থ বা সম্পদ উদ্ধার করতে হলে সে দেশের সরকার পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি থাকতে হবে। অথচ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনও দেশেরই এ রকম চুক্তি নেই। বাংলাদেশ দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় ওই চুক্তিটিই বিবেচিত হতে লাগল সবেধন নীলমণি হিসেবে। তবে দুর্নীতিবাজ কয়েকজন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক চাপে পড়ে নিজেরাই পাচার করা অর্থের খানিকটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেন। কয়েক হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেলেও পাচারকারীদের ফেরৎ দেয়া সামান্য অর্থের কথাই বড় করে প্রচার করতে লাগলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যেমন, ১৬ অক্টোবর সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ লন্ডনে জানালেন, পাচার হওয়া অর্থের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২ কোটি ৯০ লাখ ডলার সরকার ফিরিয়ে এনেছে। আরও সাত কোটি ডলার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

অক্টোবরের ১৮ তারিখে অর্থ উপদেষ্টা চ্যানেল আইতে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে হাজির হলেন। আবারও অভয় দিলেন, দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্যে কোনও অশনি সংকেত নেই। বললেন, বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ আর জিডিপি প্রবৃদ্ধি দুটোই এগুচ্ছে স্বাভাবিক গতিতে। অথচ একই সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে শোনা গেল, 'দেশে এখন অলস টাকার পরিমাণ গত বছরের চেয়ে ৫ হাজার কোটি টাকার চেয়েও বেশি।' তিনি আরও বললেন, 'অভ্যন্তরীণ ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়া এবং বছরের প্রথম দিকে সরকারের ব্যাংকঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াকেই অনেকে অর্থনীতির স্থবিরতার জন্যে দায়ী করছেন।' স্থবির অর্থনীতির কারণ দর্শানোর চেষ্টা করলেন তিনি, 'বন্যার কারণে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে তা সাময়িক এবং খুব শিগগিরই দেশের অর্থনীতি গতিশীল হয়ে উঠবে (আমাদের সময়, ১৯ অক্টোবর)।'

অর্থ উপদেষ্টা এই ভাষ্য দেয়ার এক মাস যেতে না যেতেই বোধকরি তিনি যাতে আবারও অর্থনীতির বিপর্যয়ের নতুন একটি কারণ দর্শাতে পারেন সেজন্যে ১৪ নভেম্বর দেশে ভয়াবহ সাইক্লোন সিডর হলো। এই ভয়াবহ সাইক্লোন নতুন করে অর্থ উপদেষ্টাকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ দর্শানোর সুযোগ তৈরি করে দিল।

জানুয়ারি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সামরিকতন্ত্রনিয়ন্ত্রিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ যে ভয়াবহ সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, বার বার প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে সেই সন্ত্রাসের দায় থেকে রক্ষা করছে তাদের। শাপেবর আর কাকে বলে!

রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ

যদি কেউ কাউকে কোনও নির্দেশনা দিয়ে থাকে, তাতে তো দোষের কিছু দেখি না।

– মইনুল হোসেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে মোবাইল মেসেজে শেখ হাসিনার সংবাদ না ছাপানোর নির্দেশ দেয়া মেজর প্রসঙ্গে, এপ্রিল ২০০৭।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ সন্ত্রাস চালাতে সক্ষম হলেও গণমাধ্যমের ওপর সে কায়দায় সন্ত্রাস চালানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি সুশীল সামরিকতন্ত্রের পক্ষে। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও সময় বিবিধ সন্ত্রাসের জন্যে গণমাধ্যমকেও

ব্যবহার করা হচ্ছে; কোনও কোনও গণমাধ্যম সানন্দে নিজেরাই ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সরকারের 'সংসদ' হওয়ার আত্মরতিতে উন্মাদ হয়ে গেছে এরা।

ক্ষমতা দখলের পর প্রধান উপদেষ্টা তাঁর নীরবতার মধ্যে দিয়ে এবং তার সুযোগ্য তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন চাপাবাজি চালিয়ে এ কথাটি প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন, সরকার গণমাধ্যমগুলির ওপর কখনও কোনও হস্ত ক্ষেপ করতে যাবে না। কিন্তু এই ঘোষণার আবরণের নিচে চলছিল ইরাক যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করতে যাওয়া এমবেডেড সাংবাদিকদের মতোই একটি অনুগত গণমাধ্যমবাহিনী তৈরির প্রক্রিয়া। জরুরি অবস্থা জারির পরপরই এক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার টক-শো'তে অংশ নিয়েছিলেন দেশের প্রধান সারির একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাঁর মন্ত ব্য ছিল, 'এই সরকার আমাদের, এই সরকারকে আমরা এনেছি!' বিষয়টি আর গোপন ছিল না, সামরিকতন্ত্র ও সুশীলতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্যে নিজেদের রুচিসম্মত রাজনৈতিক দলগঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কিন্তু ক্রমশ সরকারের নগ্নতা বাড়তে লাগল। শুধু সরকারের নগ্নতাই নয়, সামরিকতন্ত্রও হাজির হতে লাগল নগ্নভাবে। এপ্রিল ২০০৭-এ শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। একদিন রাতের বেলা এক মেজরের মোবাইল মেসেজ এলো বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসগুলোয়। মেসেজে তিনি লিখলেন, এখন থেকে কোনও পত্রিকায় শেখ হাসিনার কোনও বক্তব্য ছাপা যাবে না! জনগণের ট্যাক্সে সরকারি বেতনভোগী এক মেজরের কী অধিকার আছে গণমাধ্যমে নির্দেশনা পাঠানোর? জেনারেল মইন উ আহমদের দেশপ্রেমিক এই মেজর এ জন্যে কী কোনও শাস্তিভোগ করেছেন? আমাদের জানা নেই। আমরা কোনওদিন জানতে পারবও না। কেননা আমরা হলাম 'বাডি সিভিলিয়ান', আর তারা হলেন 'দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী'। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পরদিন তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বললেন, 'যদি কেউ কাউকে কোনও নির্দেশনা দিয়ে থাকে, তাতে তো দোষের কিছু দেখি না'।

একজন মেজরের এই কাণ্ডে একজন ব্যারিস্টার দোষের কিছুই দেখতে পেলেন না! এরকম ব্যারিস্টারে দেশটা ভরে গেছে বলেই সামরিক বাহিনীর অবৈধ ক্ষমতাদখলকে বৈধতা দেয়ার মতো বিচারকের অভাব ঘটে না, এরকম আর্মি অফিসারে দেশটা ভরে গেছে বলেই কথায়-কথায় সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। এবং এই ব্যারিস্টার সাহেবও এগিয়ে গেলেন সামরিক কর্মকর্তার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে। বললেন, 'কেউ ভালোর জন্যে নির্দেশনা দিতেই পারে, তবে তা আমার জানা নেই।' ব্যারিস্টার মইনুলের একবারও মনে হলো না, দেশে একটি সরকার আছে; সেই সরকারের মাধ্যমে কোনও নির্দেশনা না গিয়ে যদি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সাংবাদিকদের কাছে এ রকম সব যুগান্তকারী নির্দেশনা পাঠাতে থাকে তা হলে পরিস্থিতি কোনদিকে যেতে পারে। এ রকম তাঁর মনে হয় নি, কেননা তিনি জানতেন এ রকম নির্দেশনা অনুমোদন না করলে তাঁর তথ্য উপদেষ্টার চাকরি চলে যাবে। তিনি তাই ওই মেজর সম্পর্কে কোনও খোঁজ না নিয়ে উল্টো ভয় দেখালেন, ''সবাইকে বুঝতে হবে, এখন সংকটময় মুহূর্ত যাচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ কম। স্বাধীন আছি ঠিকই, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার স্বাধীনতা এটা নয়''।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে সরকার যে প্রেসনোট জারি করলেন তাতে প্রথমেই কয়েকটি বাক্য জুড়ে আসলে জানিয়ে দেয়া হলো, দেশে জরুরি অবস্থা জারির জন্যে সামরিকতন্ত্র ও সুশীলতন্ত্র নয়, মূলত দায়ী রাজনীতিকরা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ ও কিছু রাজনৈতিক দল (এবং সরকারের এই তালিকায় বিএনপি-জামাতের মতো দল নেই)! প্রেসনোটের ভাষায়, ''নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সরকার অবগত হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র সফররত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৩ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। উলেখ্য যে, সাম্প্রতিক অতীতে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বহীন লাগাতার আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিতে দেশের জন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত ও নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে।''

কী মনে হয় এ প্রেসনোট পড়ে? এই প্রেসনোট কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক) মোঃ মুজিবুর রহমানের লেখা? না কি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীনের উপদেষ্টা, সাংবাদিক মোখলেসুর রহমানের লেখা? এই প্রেসনোট পড়ে কি মনে হয় না দেশে জরুরি অবস্থা এলেও পরিস্থিতি আসলে বিএনপি ও জামাতপন্থীদের নিয়ন্ত্রণেই আছে?

এদিকে দ্রব্যমূল্যকে ঘিরে দেশে অসন্তোষ বেড়েই চলছিল। এ ব্যাপারেও নির্দেশনা এলো। তবে এবার আর কোনও মেজর নয়, খোদ সামরিক বাহিনী প্রধানই এই নির্দেশনা দিলেন। ২৩ মে ২০০৭-এ দেশের উলেখযোগ্য প্রায় সব সম্পাদক-সাংবাদিকই সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করতে গেলেন। তাদের সামনে তিনি 'দ্রব্যমূল্যসম্পর্কিত সামরিক তত্ত্ব' তুলে ধরলেন। ভারত আর বাংলাদেশের বাজারে ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের মধ্যেকার চাল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, আটা ও সয়াবিন তেলের দামের তফাৎ তুলে ধরে মইন উ আহমেদ দাবি করলেন তাঁর প্রিয় দেশবাসী অনেক কমদামে কেনাকাটা করে। তাঁর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে যে চালের দাম ছিল কেজিপ্রতি ১৮ টাকা, ভারতে সেই চালের দাম

ছিল বাংলাদেশী টাকায় ২০ টাকা ৫৮ পয়সা। মে মাসে বাংলাদেশে চালের দাম, তাঁর দাবি অনুযায়ী, কেজিপ্রতি ২২ টাকা। ভারতে সেই চালের দাম বাংলাদেশী টাকায় ২৪ টাকা ৭৮ পয়সা।

মইন উ আহমেদ এইসব তুলনা করার সময় ভুলে গেলেন, ভারতে মানুষের মাথাপিছু আয় ৮২০ ডলার আর বাংলাদেশে ৪৮২ ডলার। ভুলে গেলেন বাংলাদেশ আর ভারতের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একরকম নয়। সরবরাহ আর বিপণনব্যবস্থাও বাংলাদেশে অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। এসব দিকে না তাকিয়ে সংবাদপত্রগুলিকে দায়িত্বশীল হওয়ার, তার মানে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার খবর না ছাপানোর পরামর্শ দিলেন মইন উ আহমেদ।

একদিকে সামরিক বাহিনীপ্রধান দ্রব্যমূল্যসম্পর্কিত এইসব জ্ঞান দিলেন, অন্যদিকে তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলতে লাগলেন, এ সরকারের পার্লামেন্ট সংবাদপত্র। অতএব এ সরকারের ব্যর্থতা মানে সংবাদপত্রগুলোর ব্যর্থতা!

জুন ২০০৭-এ আরও স্পষ্ট হলো, কোনও কোনও গণমাধ্যম গোয়েন্দাসংস্থার 'এমবেডেড জার্নালিস্ট'-এর আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এ দেশের সাংবাদিকরা অনেকদিন হলোই তথ্যপ্রবাহের অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছেন। যদিও কোন তথ্য উন্মোচিত হবে, প্রকাশ পাবে তা নির্ধারণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা পুরোপুরিই পত্রিকার মালিক ও সম্পাদকের। তাই তথ্যপ্রবাহের অধিকার সুনিশ্চিত হলেই যে মানুষ তথ্য পাবে, সেটি সবসময় বলা যায় না। উল্টো তথ্যের অপব্যবহারও হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। কয়েকটি সংবাদপত্র আর সাপ্তাহিক পত্রিকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের ইন্টারোগেশনের বিবরণী ছাপালো। এ সব পত্রিকার কোনও কোনও সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের ভাবসাব আর কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল তারা দেশউদ্ধার করেছেন। বাজারে ইন্টারোগেশনের সিডি এলো। কিন্তু ফালু, তারেক, মামুন, বাবর, মওদুদ, নাজমুল হুদা, আবদুর রহমান, বাংলাভাইদের কারও স্বীকারোক্তিই পাঠকের সামনে এলো না। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিলো জনমনে। যেমন, সংবাদপত্রগুলো জলিলের স্বীকারোক্তি পেল, কিন্তু আর কারও স্বীকারোক্তি পেল না কেন? যারা জলিলের স্বীকারোক্তি সরবরাহ করল তারা আর আরও স্বীকারোক্তি সরবরাহ করল না কেন? না কি তারা ঠিকই সরবরাহ করেছে, কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পার্লামেন্টই তা আলোচনার জন্যে উত্থাপন করল না? এ সব প্রশ্ন থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল, যারা আবদুল জলিলের স্বীকারোক্তি ফাঁস করেছে এবং যেসব সংবাদপত্রগুলি তা ছাপিয়েছে তারা খুব হিসেব করেই তা ছাপিয়েছে। যদি এরা সাংবাদিকতার নৈতিকতার কথা চিন্তা করত, তা হলে হয় সবার স্বীকারোক্তিই পর্যায়ক্রমে ছাপত, না হয় দুঃখপ্রকাশ করত সকলের স্বীকারোক্তি তারা সংগ্রহ করতে না পারাতে।

যে সরকার গণমাধ্যমকে 'এমবেডেড জার্নালিস্ট'দের আখড়ায় পরিণত করতে চায়, যে সরকার রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভকে তার একদলীয় পার্লামেন্টে পরিণত করতে চায়, সে সরকার কী করে জনপ্রিয় হয়? কে বলে এই সরকার জনপ্রিয়?

এমবেডেড জার্নালিস্ট হতে না চাইলে সেই সাংবাদিকের পরিণতি কী, তার দুটি উদাহরণ তাসনিম খলিল আর জাহাঙ্গীর আলম আকাশ। ডেইলি স্টারের তাসনিম খলিলকে ডিজিএফআই-এর কর্মকর্তারা তুলে নিয়ে যায় বাসা থেকে। কারণ তিনি চলেশ রিছিল হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। পত্রিকার প্রকাশকের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়, তাঁর গ্রেফতারের সঙ্গে পত্রিকার কোনও সম্পর্ক নেই। তাসনিম খলিলের সৌভাগ্য, ছাড়া পেয়ে দেশের বাইরে চলে যেতে পেরেছেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর আলম আকাশের ভাগ্য অত ভালো নয়। তিনি দেশের মধ্যেই পালিয়ে বেড়ান। ডিসেম্বর ২০০৬-এ দুর্গাপুরে র‍্যাবের হাতে ছাত্রলীগ নেতা আহসান হাবীব বাবু হত্যার রিপোর্ট করেন তিনি। ২৪ মার্চ ২০০৭ থেকে সিএসবি চ্যানেল তাদের সম্প্রচার শুরু করার পর আকাশ সেখানে কাজ শুরু করেন। দুই মে রাজশাহীর এক স্থানীয় নেতা বেনজির আহমেদকে তার বউ মিনা ও মেয়ে প্রিয়াঙ্কার সামনেই র‍্যাব গুলি করে ফেলে রাখে। আধঘন্টা পরে আকাশ পৌঁছান সেখানে। তারপর সরাসরি একটি সংবাদ সম্প্রচার করেন। বিষয়টি রাজশাহীর স্থানীয় র‍্যাব কমান্ডার মেজর রাশিদুল হাসান রশিদের জন্যে সুখকর ছিল না। সেদিনই আকাশকে হুমকি দেন তিনি। ১৬ মে'তে র‍্যাব নির্যাতন করে জেলগার্ড শাহেবুলকে। ১৮ মে'তে র‍্যাব হত্যা করে রাজশাহীর বনগ্রামের মঞ্জু শেখকে। আকাশ এ গুলো নিয়েও রিপোর্ট করে। অতএব শুরু হয় আকাশ এবং তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শারমিনের যন্ত্রণাকর দিন। আকাশকে হয়রানি করার জন্যে মামলা করানো হয় রাজশাহীর এক স্থানীয় ঠিকাদার মাহফুজুল আলম লোটনকে দিয়ে। লোটনকেই যোগ্য বাদী হিসেবে বেছে নেয়া হয়,– কেননা এই লোটনের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে পরপর তিনবার রিপোর্ট করেছিল আকাশ।

এরই মধ্যে ছয় সেপ্টেম্বর সাত মিলিয়ন বা ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সিএসবি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়। আর দুর্নীতিবাজ লোটনের মামলাকে সম্বল করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সরকার হাইকোর্ট থেকে দেয়া ২৮ অক্টোবর থেকে আগাম জামিনের আদেশ উপেক্ষা করে ২৪ অক্টোবর জরুরি আইনের আওতায় গভীর রাতে গ্রেফতার করে আকাশকে। চার মাসের শিশু ও স্ত্রীর সামনেই তাকে পেটাতে থাকে যৌথ বাহিনী। বাড়িওয়ালার ছেলে লিটন এসে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তাকেও পেটানো হয়। এ ছিল শুরু, র‍্যাব-পাঁচের অফিসে নিয়ে আকাশকে তোয়ালে দিয়ে মুখ বেধে সিলিং-এর সঙ্গে

ঝুলিয়ে পেটানো হয়। বাংলাদেশের কোনও গণমাধ্যমই পারে নি এ খবর ছাপতে। টিপু সুলতানের ওপর গডফাদার জয়নাল হাজারীর নির্যাতন থেকে এ নির্যাতন ছিল একেবারে আলাদা। কারণ এটি ছিল রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় এ সন্ত্রাসের নমুনা অবশ্য আগস্টের গণবিক্ষোভের সময় আরও উলঙ্গভাবে দেখা গিয়েছিল। দায়িত্বপালনকারী সাংবাদিকদের ইচ্ছে মতো নির্যাতন করেছিল নিরাপত্তা সেনারা, নির্বিচারে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল থানায় গভীর রাতে। কারফিউয়ের মধ্যে তাদের অফিসে যেতে দেয়া হয় নি বলে বেশ কয়েকটি পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয় তখন। এ রকম ভয়াবহ নির্যাতন চালানোর পর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সাংবাদিকদের পিঠে মলম ঘষেন এই বলে, 'আমি বারে বারে সম্পাদকদের বলার চেষ্টা করেছি যে, অবস্থা যত জটিল হবে সরকার ও সম্পাদকদের মধ্যে সম্পর্ক তত ঘনিষ্ট হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যাতে আমরা এই দেশে সুন্দর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনতে পারি (প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০৭)।'

ঠিকই বলেছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল। অবস্থা যত জটিল হলো, সরকার আর সম্পাদকের মধ্যে সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ হলো। একটি কার্টুন প্রকাশকে কেন্দ্র করে *প্রথম আলো* আক্রান্ত হলো, মৌলবাদীদের কাছে নতজানু হলো। প্রয়াত খতিব উবায়দুর রহমানের হাত ধরে মতিউর রহমানের ক্ষমাপ্রার্থনার সেই কণ্ঠস্বর ছিল এতই কাতর ও নতজানু যে ব্যারিস্টার মইনুল ইসলামের মতো 'সব সময়েই স্বাভাবিক' মানুষটি পর্যন্ত অন্যরকম চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন (বিশ্বাস না হয়, সেইসময় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মতিউর রহমান, উবায়দুর রহমান ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনদের ছবিটি দেখুন)। কৌশলে দায় চাপানো হলো কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের ঘাড়ের ওপর। বিভাগীয় সম্পাদককে ছাটাই করে তাকে এবং নিজেদের রক্ষা করল *প্রথম আলো*। অন্যদিকে কারাগারের অন্ধকারে পচে মরতে লাগল আরিফুর রহমান।

মৌলবাদীরা সারা দেশে আস্ফালন দেখাতে লাগল। কিন্তু এবার আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সামরিকতন্ত্র ও সুশীল সমাজের মনে হলো না জরুরি অবস্থাকে ভঙ্গ করছে তারা। মনে হলো না দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে তারা। *প্রথম আলো* সত্যিই প্রথম আলো হয়ে উঠতে পারত জনগণের কাছে, আহ্বান জানাতে পারত সবার কাছে, 'আমাদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে ভুল স্বীকার করার পরও একটি রাজনৈতিক চক্র সেটি নিয়ে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়ান।' শুধুমাত্র এই একটি আহ্বানেই তারা জাগিয়ে তুলতে পারত দেশের সব প্রগতিশীল মানুষ, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে। ১৯৯৪ সালে *জনকণ্ঠ* যে কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিল, ২০০৭ সালে *প্রথম আলো* সে কাজটি ইচ্ছে করেই করল না। 'সূর্য কেন ওঠে' প্রশ্নের উত্তর জানা অথচ 'সাঁতার না জানা' সুশীলদের নিয়ে তারা প্রতিবাদ করা দূরে থাক, সমঝোতাও করতে পারল না যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে। দেশের সমস্ত অগ্রসর মানুষকে একই মঞ্চে নিয়ে আসার সুবর্ণ সুযোগ হারালো তারা। শেষ পর্যন্ত কর্পোরেটস্বার্থ আর 'সংসদ হওয়ার স্পৃহা'ই বড় হয়ে উঠল তাদের কাছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও একটি দারুণ নতজানু পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ হেলায় হারালেন না। তাই রাস্তায় মৌলবাদীরা আস্ফালন দেখাতে লাগল, হিজবুত তাহরির জীবনবাজি রাখল, কিন্তু *প্রথম আলো*র কিছু হলো না। কেবল কারাগারের অন্ধকারে ঘানি টানতে লাগল আরিফ নামের এক তরুণ,– যে একটি কার্টুন জমা দিয়েছিল *প্রথম আলো*য়, যে কার্টুনটি অমনোনীত হয়েছিল এবং ছাপার কোনও কথাই ছিল না, কেনই বা আবার কার্টুনটি ছাপা হলো তাও তার জানা নেই। তা ছাড়া এ ধরনের কার্টুন এর আগেও ছাপা হয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পত্রিকাতেই, সাহসী সাংবাদিক সুজন তা আন্তর্জালের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন পুরো পৃথিবীকে। প্রথম আলোয় এ কথাগুলিও লেখা হলো না যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতিতে সরকার ও সম্পাদকের ঘনিষ্ঠতার ভালো উদাহরণ আর কি হতে পারে!

এই দাঁড়ালো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সংসদের' অবস্থা! *অধিকার*এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে নয় মাসে ৩২ জন সাংবাদিক আহত হলেন, ১১ জন সাংবাদিক গ্রেফতার হলেন, ৩১ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হলেন, ৭৫ জন সাংবাদিককে হুমকি দেয়া হলো, ১২টি মামলা করা হলো তাদের বিরুদ্ধে এবং একজন সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা চালানো হলো। একজন সাংবাদিককে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদস্যরা তুলে নিয়ে গিয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করল, তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও সংবাদ ছাপানো হবে না। আগস্টে দুটি টিভি চ্যানেলকে 'উস্কানিমূলক ও আপত্তিকর' সংবাদ পরিবেশন করার দায়ে হুশিয়ার করে দেয়া হলো, টক শো ও আলোচনা অনুষ্ঠান বন্ধ করা হলো। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পার্লামেন্ট নীরবে এ সব অনুমোদন করে চলল।

কিন্তু একদলীয় এই সংসদকে অগ্রাহ্য করে, এমবেডেড জার্নালিজমের দুর্নাম ঘুচাতে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় নেমে এলেন সকল সাংবাদিক। প্রতিবাদ জানালেন সরকারের কর্মকাণ্ডের। পরিষ্কারকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে কেউ দেখতে চায় না উপদেষ্টা হিসেবে।

কেবল গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়, তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন চেষ্টা চালাচ্ছেন তথ্যপ্রবাহকে নিজেদের সপক্ষে রাখতে। গণবিক্ষোভ চলার সময় কোনও রকম ঘোষণা ছাড়া, কারণ না দেখিয়েই ২২

আগস্ট বিকেল থেকে সবগুলো মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়। রহস্যজনক কারণে বারবার চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিটিটিবি'র ফাইবার অপটিক কেবল কাটা পড়তে থাকে। সাবমেরিন ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ বার বার বিচ্ছিন্ন হতে হয়ে পড়তে থাকে। র‍্যাব এবং বিটিআরসি'র কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষ একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশে, যারা বিভিন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে প্রোফাইল সংগ্রহ করছে দ্রুতগতিসম্পন্ন আন্তর্জালসংযোগ ব্যবহারকারীদের। সেপ্টেম্বরে ভিওআইপি ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার অজুহাতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বাসায় বাসায় তলাশি করে র‍্যাব ও বিটিআরসি সদস্যরা র‍্যাব ও যৌথবাহিনী ঝটিকা অভিযানে বের হয়। বাড়ি বাড়ি তলাশি চালাতে থাকে তারা। দেখতে থাকে ব্যক্তিগত ই-মেইল থেকে শুরু করে সব কিছু। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে গ্রাহকদের তালিকা ছাড়াও পাসওয়ার্ড দাবি করে তারা। এটি এখন পরিষ্কার, পাকিস্তান ও ইরানের মতো বাংলাদেশেও গুগল ও জি-মেইল অথবা অন্য যে কোনও ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। বুশ-বেয়ার টেলিফোনে আড়িপাতার অধ্যাদেশ অনুমোদন করছে দেখে আমাদের সুশীল ও মধ্যশ্রেণির চোখ কুঞ্চিত হয়। কিন্তু তারা কি চিন্তা করে দেখেছেন, একই ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে? আর ফখরুদ্দিন আহমদ এবং মইন উ আহমেদ বুশ-বেয়ারের চেয়ে কম যান না?

কোথাও কোনও বিক্ষোভ নেই!

এখন অনেকেই বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দেশের মানুষের উৎসাহ বা আস্থা কমছে। কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে।
- মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো, জুলাই ২০০৭।

নির্বাচন অনুষ্ঠান করাটাই ছিল এই সরকারের মুখ্য দায়িত্ব। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে তা হল,– গত ৬ মাসে ওই মুখ্য কাজটি ছাড়া সকল কাজেই তারা হাত দিয়েছেন। তাদের মুখ্য কাজটিতে যে দেরি হচ্ছে তা স্পষ্টতই ইচ্ছাকৃত
– আসফউদ্দৌলা, সম্পাদক, বাংলাদেশ টুডে, জুলাই ২০০৭।

ছয়মাস ধরে দুর্নীতি দমন অভিযান চলছে। এখন এর পর্যালোচনা করা দরকার। ...মানুষ এখন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকার খবর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারের কিছু জিনিস জনগণের গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ...যাদের শাস্তি দেবেন তাদের সম্পর্কে জনমনে ঘৃণা তৈরি করতে হবে। ...আইনের চোখে ১৭ বছরের ছাত্রীকে জেলে নেয়া হয়তো উচিত আছে। কিন্তু এর মানবিক দিকটি দেখা দরকার। তা ছাড়া কেউ যদি তার স্ত্রী বা মেয়ের নামে টাকা রাখতে চায় তা হলে তারা প্রশ্ন তুলবে না এটাই আমাদের সংস্কৃতি।
সাদত হুসাইন, চেয়ারম্যান, পিএসসি, জুলাই ২০০৭।

এত শান্ত, এত নিরপেক্ষ ও এত সশস্ত্র সন্ত্রাসী সরকারের বিরুদ্ধে কি কারও অসন্তোষ থাকতে পারে? কেউ এ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে? এ তো অসম্ভব ব্যাপার,– তত্ত্বাবধায়কপন্থীদের তাই মনে হয়। এ জন্যেই যখন আগস্ট ২০০৭-এ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের খেলার মাঠে সেনাসদস্যদের হাতে ছাত্রনিপীড়নের একটি 'সামান্য' ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগুন জ্বলে উঠল, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তা বিশ্বাস হলো না, সামরিকতন্ত্রের তা বিশ্বাস হলো না, বিশ্বাস হলো না সুশীল সমাজের। অথচ এ দেশের ইতিহাসে দীর্ঘদিনের অন্যায়, অত্যাচার ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এ রকম 'সামান্য' ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণজাগরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন, ১৯৬৯ সালে পূর্ববাংলায় গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয় ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানে চোরাচালানের জন্যে প্রসিদ্ধ এলাকা ল্যান্ডিকোটাল থেকে ফেরার সময় ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

জানুয়ারিতে ক্ষমতা দখলের পর সামরিকতন্ত্র রাজনৈতিক একনায়কত্ব চালিয়ে যাওয়ার ও সামাজিক বাণিজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দেশকে বিকিয়ে দেয়ার যে প্রচেষ্টা শুরু করে মূল্যস্ফীতি তাতে প্রথম বাগড়া বসায়। মার্চ থেকেই মানুষের অসন্তোষ পূঞ্জীভূত হতে শুরু করে। এ সময় পাটকলগুলি বন্ধ করে দেয়ার মিশন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় শিল্প, পাট ও বস্ত্র, সমাজকল্যান এবং নারী ও শিশুকল্যাণবিষয়ক উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে। জরুরি অবস্থাকে উপেক্ষা করে খুলনার শিল্পাঞ্চলে পাটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু তাদের দাবিকে উপেক্ষা করে পাটকলগুলি বন্ধ করে দেয়ার মিশন অব্যাহত রাখে সরকার। সাংবাদিকদের ডেকে নির্লজ্জ কণ্ঠে গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী সাফাই গান, 'আমি জুটের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেছিলাম। এই জেহাদে মনে হচ্ছে আমরা কিছুটা হলেও সফল

হয়েছি। বাকিটুকু আমার মনে হয় আলাহর রহমত থাকলে এবং আমাদের সবার প্রচেষ্টা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই পারব। আই অ্যাম হোপফুল (ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৭)।' মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে। অথচ পাটশিল্পের বিপর্যয়ের জন্যে শ্রমিকদের কোনও ভূমিকা নেই বললেই চলে। গীতিআরা সাফিয়া নিজেই বলেছেন, '২০০৬ সালের জুন পর্যন্ত সরকারি পাটকলগুলোতে লোকসানের পরিমাণ ৪ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা। প্রতি বছর ২২টি পাটকল ৪২১ কোটি টাকা লোকসান দেয়। এর মধ্যে ১৪০ কোটি টাকা লোকসান হয় যথাসময়ে পাট কিনতে না পারার কারণে। আর শ্রমিক অসন্তোষের কারণে লোকসান হয় ৩০ কোটি টাকা (ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৭)।' বিচারপতি গোলাম রব্বানী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সিমিন হোসেন রিমির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রমিকদের জন্যে লঙ্গরখানা চালু করার চেষ্টা চালান। কিন্তু প্রশাসন তাদের সে প্রচেষ্টা নসাৎ করে দেয়। সরকার মরিয়া হয়ে ওঠেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়ন করতে, পাটকলগুলি বন্ধ করে দিতে। একই পরিস্থিতি দেখা দেয় গার্মেন্টস শিল্পে। ঠিকমতো বেতনভাতা না দেয়ায়, কাজের পরিবেশ না থাকায় এবং কথায় কথায় কোনও কারণ ছাড়াই কারখানা বন্ধ করে দেয়ায় বিভিন্ন ইপিজেড ও গার্মেন্ট কারখানাগুলোতে শুরু হয় অসংগঠিত চরম শ্রমিক অসন্তোষ। যদিও গার্মেন্ট সেক্টর নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা ছিল খোদ সেনাপ্রধানের। ২৭ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় মইন উ আহমেদ বলেছিলেন, 'আমি শুধু একটি কথা ইমার্জেন্সী হওয়ার পরে আইজিপিকে বলেছিলাম, আমি দেখতে চাই না, কোনো গার্মেন্ট শিল্পে আগুন লাগুক বা ধ্বংস হোক বা ক্ষতি হোক। শুধু এই একটি কথা বলাতে আজ ২ মাসের ওপরে হলো একটা গার্মেন্টে কেউ হাত দেয়নি (সমকাল, ২৮ মার্চ ২০০৭)।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই আত্মতৃপ্তি তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। বিশেষত দ্রব্যমূল্য এত লাগামছাড়া হারে বাড়ছে যে শত লাগামেও সম্ভব হয় নি গার্মেন্ট শ্রমিকদের দমিয়ে রাখা।

একদিকে এ সময় কর্মসংস্থানের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে সরকারি খাতে শুরু হয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাটাই। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত। কিন্তু নির্মম হলেও সত্য, ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই 'কী চমৎকার দেখা গেল' মার্কা দেশগঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সামরিক সুশীলায়তন হাটবাজার ও হকার উচ্ছেদ করে সেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে তছনছ করে দেয়। জুলাই-আগস্টে দেশব্যাপী বন্যা হওয়ার পর এদের দল ভারী করে বিপুলসংখ্যক কৃষিশ্রমিক। বাংলাদেশে মোট কর্মজীবীর মধ্যে ৪৪ দশমিক আট শতাংশ স্ব-নিয়োজিত এবং ১৮ দশমিক চার শতাংশ নিয়োজিত পারিবারিক কাজে, যার জন্যে কোনও মজুরি মেলে না। তার মানে কর্মসংস্থানের বাজারে রয়েছে মূলত মোট শ্রমশক্তির ৩৭ শতাংশ। এ শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ আবার কাজ করে দৈনিক মজুরির বিনিময়ে। কাজেই শ্রমমজুরির বাজারও এখানে স্থিতিশীল নয়। এই অবস্থার পাশাপাশি চলে পাটখাত থেকে ১৪ হাজার শ্রমিক ছাটাই, বিমান থেকে এক হাজার ৮৭৭ জন কর্মী ছাটাই, বিটিটিবি থেকে প্রায় পাঁচশ'র বেশি কর্মচারী ছাটাই। এ সবই তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে থাকে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে। অর্থনীতিবিদ ও সাবেক উপদেষ্টা ড. আলী আকবর খান এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বর্তমানে যে সব সংস্কার হচ্ছে, তা অস্থায়ী ভিত্তিতে। সরকারের কাছ থেকে আমরা পরিষ্কার কোনও ধারণাই পাচ্ছি না এই সংস্কার করে কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সরকার। যাদের চাকুরিচ্যুত করা হচ্ছে তাদের বিকল্প কোনও কাজ না দিয়ে ছাঁটাই করা হলে তারা আসলে কোথায় যাবে? সরকার বা বিশ্বব্যাংকের তথ্য মেনে নিলে বাংলাদেশের বেকারত্ব পরিস্থিতি উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ব্রিটেনের চেয়ে ভালো (প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০০৭)।

আর আগস্টের আগে তো বটেই, এখনও সারা দেশে চলছে সরব ও নীরব কৃষক অসন্তোষ। সারা দেশে প্রকটিত সার সমস্যা এর অন্যতম প্রধান কারণ। সারের দাবিতে জুলাই-আগস্টের বিভিন্ন সময়ে নাটোরের নাচোল, চুয়াডাঙ্গা সদর ও জীবননগর, ভোলার মনপুরা, রাজশাহীর গোদাগাড়ি, নওগাঁ, নওগাঁর নিয়ামতপুর, পাবনার টেবুনিয়া বাজার, রংপুরের গঙ্গাচড়া, ময়মনসিংহের ফুলবাড়ি, লালমণিরহাটের পাটগ্রামসহ দেশের অসংখ্য জায়গায় ছোটবড় বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ হয়। কোথাও কোথাও টিএনও এবং কৃষি অফিসারসহ বিভিন্নজন লাঞ্ছিত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে অনেক জায়গায় র‍্যাব, যৌথ বাহিনী ও দাঙ্গা পুলিশ পাঠাতে হয়। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'সংসদ' থেকে প্রচারণা চলতে থাকে, কোথাও কোনও অসন্তোষ নেই।

দেশে সারা বছরের জন্যে সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৮ লাখ ১৪ হাজার টন ইউরিয়া, সাড়ে চার লাখ টন টিএসপি, তিন লাখ টন এমওপি ও দেড় লাখ টন ডিএসপি সার। ডিলারদের মাধ্যমে ইউরিয়া সার সরকারই কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়। এক জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত বিসিআইসি প্রায় চার লাখ ১৬ হাজার টন ইউরিয়া সরবরাহ করে। গত বছর এ মৌসুমে এই সময় বিসিআইকে সার সরবরাহ করতে হয়েছিল তিন লাখ টন। আগের বছরের চাহিদার তুলনায় এক লাখ ১৫ হাজার টন ইউরিয়া বেশি সরবরাহ করেও সরকার ব্যর্থ হয় সারের চাহিদা মেটাতে। বেসরকারিখাতে তিন লাখ ১০ হাজার টন টিএসপি, আড়াই লাখ টন এমওপি সার আমদানির জন্যে সরকার অনুমতি দিলেও আমদানিকারকদের এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ ছিল না। কারণ গেল দু বছর ধরে তাদের আমদানি করা প্রায় একশ কোটি টাকার ফিউজড ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (এফএমপি) সার গুদাম থেকে বেরিয়ে বাজারের মুখ দেখতে পারছিল না সরকারের সিদ্ধান্তহীনতায়

(ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ২০০৭) । সারা দেশ সারের অভাবে জ্বলছিল, আর কৃষিসচিব মোঃ আবদুল আজিজ বলছিলেন, সার ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার নতুন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কৃষি মন্ত্রণালয় নতুন নিয়ম ঠিক করছে, সে নিয়ম দ্রুত উপদেষ্টা পরিষদে পেশ করা হবে, উপদেষ্টা পরিষদ তা অনুমোদন করলে কার্যকর করা হবে (ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ২০০৭)!

এই সার সংকট এখনও চলছে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেও সার নিয়ে তীব্র কৃষক অসন্তোষ দেখা গেছে ঝিনাইদহের শৈলকূপায়, কালিগঞ্জে, যশোর সদর উপজেলার চূড়ামনকাঠিতে, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আব্দালপুরে, ফরিদপুরের মধুখালীতে, বরগুনার পাথরঘাটার কালমেঘা গ্রামে, শেরপুরে । তবে আগের মতোই এর সমাধানের প্রক্রিয়া উপেক্ষিত । অ্যাডকমের গুলশানের অফিস নিয়ে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ভবনমালিক অধ্যাপক মাহবুব ও তার স্ত্রীকে অপদস্থ ও নির্যাতন করার আনন্দে উলসিত উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী নভেম্বর ২০০৭-এ এই সার সংকট সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সার ক্রাইসিস আসলে মিডিয়ার সৃষ্টি একটি মিথ এবং কৃষকরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু নিতে আগ্রহী নয়!' এটি সত্যিই একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার, উপদেষ্টারা তাদের যে 'সংসদ' গত কয়েকমাস ধরে গড়ে তুলেছেন সেই 'সংসদ'ই এখন সার সংকটের 'মিথ' 'সৃষ্টি' করছে!

এর পাশাপাশি ছিল বা এখনও রয়েছে এক শ্রেণির সেনাসদস্যের তাণ্ডবে সৃষ্ট অসন্তোষ । এই সেনাসদস্যদের আচরণ সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তারাই এ দেশের প্রতিপালক । গণমাধ্যমের সেলফ-সেন্সরের মধ্যে দিয়েও দু'একটি খবর মানুষের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিলো আর মানুষজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল । দু জুলাইয়ে চট্টগ্রামের স্থানীয় এরিয়া কমান্ডার হিসেবে কর্মরত এক মেজর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন এবং একটি বিভাগে পাঁচজন শিক্ষককে নিয়োগের ব্যাপারে নির্দেশ দেন । পরে উপাচার্য সেই নিয়োগ দিতে বাধ্য হন এবং এরপরই রহস্যজনকভাবে তিনি পদত্যাগ করেন (মুহম্মদ জাফর ইকবাল/ সাদাসিধে কথা, প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৭) ।

১৫ আগস্ট ২০০৭ কুমিলার সেনানিবাসে নিয়ে হত্যা করা হয় রাজমিস্ত্রী আলমগীর হোসেন (৩৩)কে । তাঁর প্রতিবেশী আবুল কালাম (২৮)কেও এ ঘটনায় পিটিয়ে শরীর থেতলে দেয়া হয় । কুমিলার আদর্শ সদর উপজেলার আলেখার চরের আলমগীর সকাল দশটার দিকে বৃষ্টির সময় এক উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীর ছাতার নিচে ঢুকে পড়ে । এ নিয়ে মহিলার সঙ্গে থাকা আরেকজনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় । পরে তাকে সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়ে মারপিট করা হয় । আহত অবস্থায় তাকে জেলা পরিষদে যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আবারও মারপিট করা হয় । বেলা তিনটার দিকে কোতয়ালী থানার এস আই শাহাবুদ্দিন তাকে আহত অবস্থায় কুমিলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসার আধঘন্টা পর তাঁর মৃত্যু ঘটে । যৌথবাহিনীর প্রধান লে. কর্নেল আনোয়ার হোসেন রাতে বলেন, ছিনতাই করতে গিয়ে আলমগীর গণপিটুনিতে আহত হয় । পরে তাকে পুলিশ দিয়ে থানায় পাঠানো হয় । সেখানে তার মৃত্যু ঘটে (প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট) ।

এ রকম মৃত্যু খুব সহজলভ্য হয়ে উঠতে থাকে, যদিও তা গণমাধ্যমে খুব কমই আলোচিত হওয়ার সুযোগ পায় । যেমন গণমাধ্যমে আলোচিত হয় নি নারী পুলিশ কন্সটেবল আঞ্জুমান আরা, যিনি এক সেপ্টেম্বর মোবাইলে উচ্চস্বরে কথা বলতে মানা করায় পঙ্গু হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ সেবিকা গুলশান আরাকে মারধর করতে করতে বলেছিলেন, 'এই হাত দিয়ে হাসিনাকে অ্যারেস্ট করেছি । তোকেও অ্যারেস্ট করব (প্রথম আলো, দুই সেপ্টেম্বর ২০০৭) ।' আলোচিত হন নি র‍্যাবের এএসআই কামরান যিনি ১৩ সেপ্টেম্বর মীরপুরের বিআরটিএ-এর সামনে তার মোটর সাইকেল দিয়ে পথযাত্রী গার্মেন্টস মালিক আলী হক ও তার চার বছরের প্রতিবন্ধী শিশু শাহেদকে বহনকারী মোটর সাইকেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর পর উল্টো গালিগালাজ করেন । তারপর র‍্যাবের বাহিনী ডেকে তীব্র নির্যাতন চালায় তাদের ওপর । আর এলাকাবাসী ফেটে পড়ে বিক্ষোভে (আমাদের সময়, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭) । এ রকম অজস্র বিক্ষোভঅসন্তোষ আগেও ছিল আর প্রতিদিন বাড়ছে ।

শ্রমিক অসন্তোষ ছিল, কৃষক অসন্তোষ ছিল, হকার অসন্তোষ ছিল, ছিল জনঅসন্তোষ; জুলাইয়ে এসে দেখা গেল সরকারসমর্থক অর্থনীতিবিদদের আখড়া সিপিডি-ও আর সরকারের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না । গণমাধ্যমের একটি অংশ শুরু থেকেই বাকস্বাধীনতা রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন । জুলাইয়ে তা আরও তীব্রতর হলো । তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছয় মাস পূর্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিবিসি বাংলা বিভাগকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ১২ জুলাই ২০০৭ বাংলাদেশ টুডের সম্পাদক আসফউদ্দৌলা খোলাখুলি বললেন, 'বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি প্রশ্নবিদ্ধ সরকার । বোরখার আড়ালে এটি একটি সামরিক সরকার । এই সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে । ...নির্বাচন অনুষ্ঠান করাটাই ছিল এই সরকারের মুখ্য দায়িত্ব । এখন যেটা দেখা যাচ্ছে তা হল,– গত ৬ মাসে ওই মুখ্য কাজটি ছাড়া সকল কাজেই তারা হাত দিয়েছেন । তাদের মুখ্য কাজটিতে যে দেরি হচ্ছে তা স্পষ্টতই ইচ্ছাকৃত (আমাদের সময়, ১৩ জুলাই ২০০৭) ।'

ওপর থেকে যত নিস্তরঙ্গই মনে হোক না কেন, মাত্র ছয়মাসেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু ধারা সামরিকতন্ত্র ও সুশীলতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠল । খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল সামরিকতন্ত্র । অন্যদিকে কোনঠাসা কথিত সুশীল সমাজও চেষ্টা চালালো ঘটনার ধারাক্রম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে । এই দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন ঘটলো ১৫ জুলাই *প্রথম*

আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের এক মন্তব্য প্রতিবেদনে। তিনি লিখলেন, ''দেশের সব পরিবর্তনের পেছনে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, তা হলো সশস্ত্র বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগই এখন পর্যন্ত প্রধান। এসব পরিবর্তনের পেছনে রাজনৈতিক শক্তি বা নাগরিক সমাজের ভূমিকা বড় নয়। যদিও কয়েক বছর ধরে এ ধরনের পরিবর্তনের পেছনে জনমত সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ ও প্রচার মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

' ...বর্তমান সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হলেও সরকার বা উপদেষ্টারা তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং সামনের দিনগুলোতে করণীয় নিয়ে একক বা সমষ্টিগতভাবে তেমন কিছুই বলছেন না। শুধু মাঝেমধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ বা উপদেষ্টারা কোনো কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেন। প্রধান উপদেষ্টা বিদেশি প্রচারমাধ্যমে দুবার (বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা) সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। দেশি প্রচারমাধ্যমকে তিনি তেমন বিবেচনায় নিচ্ছেন না। যদিও তিনি বলেছিলেন, সংসদের অনুপস্থিতিতে প্রচারমাধ্যমই সংসদের কাজ করছে।

'...দুর্নীতি প্রতিরোধ বা দেশের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এগিয়ে নিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সরব সম্মিলিত ভূমিকা ও নেতৃত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এসব বিষয়ে তাঁরা তেমন কিছু করছেন বলেও শোনা যায় না। এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর ওপর অনেক কিছু ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এটা সেনাবাহিনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কারো জন্য ভালো নয়।

'...গত ১১ ও ১২ জুলাই রাজধানীতে আয়োজিত দুটি সেমিনারে সেনাপ্রধান বেশ কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অতিথিদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাতে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় উঠে এসেছে। এসব বিষয়ে আমরা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টাদের মতামত-অভিমত জানতে বুঝতে চাই। এটা তাঁদের দায়িত্বও বটে।

'...এখন অনেকেই বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দেশের মানুষের উৎসাহ বা আস্থা কমছে। কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে।

'...বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর গ্রহণযোগ্য পরামর্শ শুনতে আপত্তি নেই, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেদের মতো করে। এমন একটি ধারনা প্রচলিত আছে যে বর্তমান প্রশাসন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ বা শর্ত মেনে সাহায্য নিতে বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়।''

১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হলো। প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে আইনকে তার নিজের পথে চলতে দেয়ার পাশাপাশি এ অভিযোগও করা হলো, 'গত পাঁচ বছর লুটপাটের রাজত্ব করলেন খালেদা জিয়া, আর গ্রেপ্তার হলেন শেখ হাসিনা। এর জবাবও সরকারকে দিতে হবে।' খালেদা জিয়ার প্রতি সামরিকতন্ত্রের নমনীয় মনোভাব এবার সুশীলকাণ্ডারী *প্রথম আলোর* কাছে সত্যিই উদ্বেগজনক হয়ে উঠল এবং 'মাইনাস টু ফর্মুলা'র সঙ্গে এই গ্রেফতারের সম্পর্ক কতটুকু সে বিষয়ে মনযোগী হলো তারা। শেখ হাসিনার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে কোথাও যেন কোনও বিক্ষোভ না হয় তা নিশ্চিত করতে যৌথ বাহিনীও নামানো হলো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের আচরণ ছিল এতই ঔদ্ধত্যপূর্ণ যে কবি মোহাম্মদ রফিক ১৮ জুলাই *প্রথম আলোর* মাধ্যমে সবার প্রতি 'কার এই অপমান!' শীর্ষক খুবই ছোট এক প্রতিক্রিয়া জানালেন। ওই ছোট প্রতিক্রিয়া থেকেই উঠে এলো সারা দেশে নীরব সামরিকতন্ত্র কী ভয়াবহ কাল ডেকে নিয়ে এসেছে। তিনি লিখলেন, 'যৌথবাহিনীর এ ধরনের চলাফেরা বা আচার-আচরণ যদি যথেষ্ট পরিমাণে উস্কানিমূলক হয়ে দেখা দেয়, তা হলে আইন রক্ষা করবে কে। আমি জানতে চাই বর্তমানে এমন অবস্থায় আমার অপমানিত বোধ করার বা সে কথা বলার মতো স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকারটুকু অবশিষ্ট আছে কি না। না, তা-ও ইতিমধ্যে খুইয়ে বসে আছি!'

একই দিনে বিবিসি'র সংলাপে কয়েকজন শ্রোতা অভিযোগ করলেন, 'সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর ঘটনা মানুষের মধ্যে বিরূপ সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পেছনে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।'

কয়েকদিন পর ২১ জুলাই ২০০৭ প্রথম আলোর উদ্যোগে 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ' শীর্ষক গোলটেবিলে অর্থনীতিবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলী খান বললেন, 'সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন আসবে না। দুর্নীতির এই জঞ্জাল সংস্কারের ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। একে বিপবের আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। চলমান অভিযান অতীতের জঞ্জাল সরাতে ব্যস্ত। তবে এই অতীত কত বছর আগের তা নির্দিষ্ট করতে হবে।' পিএসসি'র চেয়ারম্যান সাদত হুসাইন বললেন, 'ছয়মাস ধরে দুর্নীতি দমন অভিযান চলছে। এখন এর পর্যালোচনা করা দরকার। তবে এই অভিযান ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। ...মানুষ এখন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকার খবর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারের কিছু জিনিস জনগণের গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ...যাদের শাস্তি দেবেন তাদের সম্পর্কে জনমনে ঘৃণা তৈরি করতে হবে। ...আইনের চোখে ১৭ বছরের ছাত্রীকে জেলে নেয়া হয়তো উচিত আছে। কিন্তু

এর মানবিক দিকটি দেখা দরকার। তা ছাড়া কেউ যদি তার স্ত্রী বা মেয়ের নামে টাকা রাখতে চায় তা হলে তারা প্রশ্ন তুলবে না এটাই আমাদের সংস্কৃতি (প্রথম আলো, ২২ জুলাই ২০০৭)।"

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকেও বলতে শোনা গেল, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হতে পারে!' সামরিকতন্ত্র ও সিভিল সোসাইটির মধ্যে দ্বন্দ্ব যে ক্রমশ অমীমাংসেয় হয়ে উঠছে তা আরও স্পষ্ট হলো আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ১১ আগস্ট হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ আয়োজিত 'বিচার বিভাগের সংস্কার ও স্বাধীনতা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন বললেন, "দেশের যে-কোনো ক্রান্তিকালে অতীতের মতোই এগিয়ে আসবে সুপ্রিম কোর্ট। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অতীতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে শিক্ষা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করা যায়। সংবিধান যারা লংঘন করে, তারাই আবার পরবর্তীতে সংবিধানের ব্যাপারে বেশি সোচ্চার হয় (ইত্তেফাক, ১২ আগস্ট ২০০৭)।" শুনে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি মাহফুজ আনাম ১৩ আগস্ট এক মন্তব্য প্রতিবেদনে লিখলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট কখনও কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে নি।' একদিন পর ১৫ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সিভিল সোসাইটির পাঁচজন প্রতিনিধি ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, ব্র্যাকের সদস্য মঞ্জুরুল আহমেদ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখার আহমেদকে যেতে দেখা গেল (আমাদের সময়, ১৬ আগস্ট ২০০৭)।

কী আলাপ হয়েছিল সেখানে? কী ঘটছিল পর্দার অন্তরালে জুলাই-আগস্ট জুড়ে? সেটি এখনও জানার বা বলার কোনও অবকাশ নেই। আমরা শুধু বলতে পারি, একদিকে তীব্র জনঅসন্তোষ অন্যদিকে সামরিকতন্ত্রের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির দ্বন্দ্বের এই নাজুক প্রেক্ষাপটে একটি গণউত্থান ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ২০ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে ছাত্রদের সঙ্গে সামরিক সদস্যদের 'সামান্য ঘটনা'র সূত্র ধরে সেই ঘটনাই ঘটে। সামরিক বাহিনীর আস্তানা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবি তোলে ছাত্রসমাজ। সরকার এ দাবি মেনে নেয়। কিন্তু সেনাক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার পাশাপাশি ছাত্রদের ওপর সহিংস ও নৃশংস হামলা চালানোর কাজটি অব্যাহত রাখা হয়। ২২ আগস্টেই এ বিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে এবং কারফিউ জারি করা হয়। আগস্টের ছাত্রবিক্ষোভে শিক্ষকরা উস্কানি দিয়েছেন এবং 'সরকারকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তে' তারা যুক্ত রয়েছেন বলা হলেও বাস্তবে আমরা দেখতে পাই এ ঘটনার রাশ টেনে ধরার মধ্যে দিয়ে সামরিকতন্ত্র সিভিল সোসাইটিকে বাগে এনে রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সুমতিপ্রাপ্ত *প্রথম আলো* এবার তাদের সম্পাদকীয়তে লেখে, 'নৈরাজ্য সৃষ্টির এসব অপচেষ্টার বিপরীতে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে আমাদের এক হয়ে কাজ করতে হবে (২৪ আগস্ট ২০০৭)।' শুধু সম্পাদকীয় নয়, কয়েকদিন পর একটি জরিপ করেও প্রথম আলো প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অন্যখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

গণবিক্ষোভ দমনের জন্যে সরকার যে নিষ্ঠুরতা দেখায়, ঢাকার আজিজ মার্কেটের ঘটনা তার সামান্য উদাহরণ। সেনাসদস্যদের বর্বরতম নির্যাতন চালানোর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঘরের মধ্যে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে এসে সাধারণ কর্মজীবী ও গৃহিনীরা পর্যন্ত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, এভাবে ওদের পিটানো হচ্ছে কেন! এবং একটি স্বাধীন দেশের সেনাসদস্যরা উত্তরে গালিগালাজ ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনরা অবশ্য সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা চালান, 'একটা রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সেজন্যে দেখা যায় যে, কারফিউয়ের একদিনের ভিতরে আর কোনো আন্দোলন নাই এবং কারফিউয়ের সময় তেমন কোনো শক্তিও প্রয়োগ করা হয় নাই, কোনো রেজিস্টেন্ট আসে নাই। অর্থাৎ, কিছু লোক এটা অর্গানাইজড ওয়েতে করার চেষ্টা করেছে। ...তো এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না (ইত্তেফাক, ২৬ আগস্ট ২০০৭)।'

তার আগের দিন শরীয়তপুরে গিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান মইন উ আহমেদ বলেন, রাজপথে নাকি গত ২৪ ঘন্টায় কোটি কোটি টাকা ছড়ানো হয়েছে। *ইত্তেফাক* ও *আমাদের সময়*-এর মতো 'সংসদ'গুলিতে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে খবর ছাপা হতে লাগল, কে কে গত কয়েকদিনে এই বিক্ষোভ সংঘটনের চেষ্টা চালিয়েছে, টাকা ঢেলেছে। যদিও তারপর কয়েকমাস চলে গেলেও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখনও সেইসব 'টাকা সরবরাহকারীদের' চিহ্নিত করতে পারে নি। ধরতে পারে নি। কেননা এ গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর আনুকুল্য ছাড়াই। সে কারণেই সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নিষ্ঠুরতা দিয়ে বিক্ষোভকারীদের খুব স্বল্প সময়েই ছত্রভঙ্গ করা। সে কারণেই এ রকম একটি নিষ্ঠুর দমনযজ্ঞ চালানোর পরও বাংলাদেশে এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক ঐক্যমোর্চা গড়ে ওঠে নি। আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকেন্দ্র থেকেও কোনও ঐক্যবদ্ধতার উদ্যোগ নেয়া হয় নি। কারণ সুশীলরা এ ধরনের পরিকেন্দ্রগুলি ত্যাগ করে অনেক আগেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল। তাই একের পর এক শিক্ষক গ্রেফতার হলেন, সুশীলরা নিরাপদ দূরত্বে

অবস্থান করতে লাগলেন। আর কোনও প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের সময়ও যা হয় নি, এবার সেটিই হলো– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হলো শিক্ষক ও সামরিক কর্মকর্তাদের মতবিনিময় কেন্দ্রে।

আগস্টবিক্ষোভের সময় ছাত্রনির্যাতনের প্রতিবাদকারী শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে বিপদগামী করতে, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম আলোর প্রথম পাতায় ছবিসমেত দেখা দিলেন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী ড. আনিসুজ্জামান। তিনি লিখলেন : "এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ সঙ্গত হয়েছে। তবে সমিতির বক্তব্য ঘটনার প্রতিবাদ অতিক্রম করে রাজনৈতিক অবস্থান সূচিত করেছে। এর দায়দায়িত্ব সমিতিকেই বহন করতে হবে। সমিতির পক্ষে এরকম রাজ নৈতিক অবস্থান অবশ্য নতুন নয়, অতীতেও এমন হয়েছে। তবে সান্ধ্য আইন জারির পর ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ অমান্য করতে যদি শিক্ষক সমিতি আহ্বান জানিয়ে থাকে, তবে তা যথার্থ হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা যদি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে থেকে যেতো এবং পরিণামে আইনশৃঙ্ক্ষলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানির সম্মুখীন হতো, তার দায়িত্ব কে বহন করতো? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে এমন হয়রানির ঘটনা যে ঘটছে তা তো আমরা জানতেই পারছি।" কী চমৎকার ব্যাপার! সেনাসদস্যদের নির্যাতনকে নির্যাতন বলার মতো সাহসই হলো না ড. আনিসুজ্জামানের, তিনি বরং মোলায়েমভাবে সামরিক সেনাদের গায়ে তেল-মলম মালিশ করে সেটাকে 'হয়রানি' বানিয়ে দিলেন (অথবা আদর্শিক ও নৈতিকভাবে তিনি সেরকমই মনে করেন)। এবং 'যদি' শব্দটির ওপর নির্ভর করে শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে ড. আনিসুজ্জামান তাঁর ক্ষোভ উগড়ে প্রতিনিধিত্ব করলেন নির্যাতক সামরিক কর্মকর্তাদের। কথার কথা, ধরা যাক, ছাত্রছাত্রীরা সেদিন রাতে সরকারের আদেশ অমান্য করে ছাত্রাবাসেই রয়ে গেল। কী হতো তা হলে? আরও একটি ২৫ মার্চ ১৯৭১? তার মানে আমাদের সামরিক শাসকদের সেই যোগ্যতা রয়েছে, যেমন ছিল পাক-সামরিক বাহিনীর? সোজাভাবে আনিসুজ্জামান সেটি আমাদের জানিয়ে দিলেই পারতেন, এত ঘুরিয়ে বলার দরকার কী, বলুন? নাকি মঈন উ আহমেদের মতো তিনিও দুঃখ পান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করতে? আমাদের জানা নেই। তবে আমরা আরও কিছুদিন পর দেখতে পেলাম, শিক্ষক-ছাত্র ও সচেতন মহল যখন জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ছাড়াই ফ্রান্সে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পাঠানোর বিরোধিতা করছেন তখন ড. আনিসুজ্জামান আবারও আবির্ভূত হয়েছেন, সংবাদসম্মেলনে সাফাই গাইছেন,– গিমে জাদুঘরের প্রদর্শনীতে প্রত্নতত্ত্ব পাঠানো উচিত! সেখানে তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন এবং এদের কারও ভূমিকাই স্বচ্ছ নয়।

তারপর ড. আনিসুজ্জামান প্রদর্শিত পথ ধরে অপপ্রচার চলতেই থাকল। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের সম্পর্কে অদ্ভূত সব তথ্য প্রচার করা হলো। এ শিক্ষকদের অনেকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তার মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখার মতো কাজটি তারুণ্যেই সম্পন্ন করেছেন তাঁরা। আটক শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার মতো বয়স ছিল না, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় চেতনা বলে মনে করেন। এ ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে তাঁদের। কিন্তু অপপ্রচার অব্যাহত থাকল। যেমন, ড. আনোয়ার হোসেন সম্পর্কে কোনও কোনও সংবাদপত্রে লেখা হলো তিনি আরবান গেরিলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; যেন তিনি এই প্রশিক্ষণের জোরেই সারা ঢাকা শহর আগস্ট মাসে অস্থিতিশীল করে তুলেছিলেন! তাঁরা ভুলে গেলেন, ড. আনোয়ার হোসেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। শুধু তিনি নন, তাঁদের গোটা পরিবারই প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আরবান গেরিলার প্রশিক্ষণ নেয়া এবং অস্ত্র, বোমা, গোলাবারুদ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়াকে কি আমরা অপরাধ মনে করব? না কি তা গৌরবের বিষয়? বাংলাদেশের আনাচেকানাচে এরকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অজস্র মানুষ ছড়িয়ে আছেন এবং কোনও কারণে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত এলে এই মানুষরাই হয়ে উঠবেন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। অথচ কোনও পত্রিকাতেই লেখা হলো না, ড. আনোয়ার হোসেন মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন এবং তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাণরসায়নবিদ!

অপপ্রচারের সঙ্গে তাল মেলালেন বিদেশি কূটনীতিকরাও। ২৬ আগস্ট ২০০৭-এ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর দেয়া ব্রিফিং-এ ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এতই কনভিন্সড হলেন যে সাংবাদিকদের কাছে সাফাই গাইলেন, 'সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের প্রথম কয়েক ঘন্টা ছিল প্রকৃত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এরপর এতে ইন্ধন যোগানো হয় এবং প্রচুর টাকা ঢালা হয়।' টাকা ঢালা হয়েছে! কী সহজই না বাংলাদেশে কোনও আন্দোলন চলার সময় এই কথাটি বলা! ওয়ার্কার্স পার্টি আর জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ছাড়া আর কাউকেই ব্রিটিশ হাই কমিশনারের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না।

আমরা কি কখনও জানতে পারব, রাতের অন্ধকারে শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? সূর্যসেনকে যদি বৃটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনী নাগরিক অধিকারের সৌজন্যতাবশত সারা রাত বাড়ির চারদিক ঘেরাও করে রাখার পর সকাল বেলা গ্রেপ্তার করে থাকে, তা হলে এই স্বাধীন দেশের সামরিক বাহিনী, যৌথবাহিনী কিংবা র‍্যাবের কী এমন প্রয়োজন পড়েছিল যে রাত ১২টায় তারা শিক্ষকদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন? গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে যেসব

অহেতুক গালগপ্পো বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপানো হয়েছে, সেগুলো কে সরবরাহ করেছে? এই সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার যোগসাজশ কী কারণে, কোন প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে?

আমরা কি জানতে পারব, আগস্টবিক্ষোভকে সরকার সত্যিই কতটুকু আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন? ৮২ হাজার মানুষের নামে মামলা হয়েছিল এবং বিভিন্ন মামলা পরস্পরগ্রন্থিত করে না কি এই সংখ্যা ১০/১২ হাজারে নামিয়ে আনার কথা ছিল। যে আন্দোলনে ১০ হাজার মানুষের নামে মামলার আলামত থাকে, এটি খুব সাধারণ ব্যাপার, সেই আন্দোলনে কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। ১৫ কোটি মানুষের একটি দেশে একদিন যখন একসঙ্গে ৫০ হাজার মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে জ্বলে ওঠে, তখন নিঃসন্দেহে সেই আন্দোলনের যৌক্তিকতা রয়েছে; এটি খুব সাধারণ জ্ঞানের কথা।

অথচ আমাদের নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এ আন্দোলন হাসিনা আর খালেদার রাজনৈতিক স্বার্থে করা হয়েছে এবং এতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সংগঠন দুটি নেতৃত্ব দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আন্দোলন-বিক্ষোভ গড়ে তোলার মতো শক্তি সামর্থ্য রয়েছে,– এ কথা বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কেননা মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, ভূমিকা রেখেছে প্রধানত জাসদ ও বাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী একটি অবস্থান ছিল বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর। নব্বইয়ের শেষে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তারপরও ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদল এককভাবে কোনও আন্দোলন গড়ে তোলার মতো সংঘবদ্ধতা নিয়ে হাজির হতে পারে নি। যেমন, ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কোনও ভূমিকা ছিল না। আওয়ামী লীগের শাসনামলে সেখানে ছাত্রদল যেমন দাঁত বসাতে পারে নি, তেমনি বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে ছাত্রলীগও সেখানে আঁচড় দিতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সরকারভেদে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রমাস্তানদের দাপট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে দাপট ভেঙে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত আন্দোলনেও ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদলের কোনও মুখ্য ভূমিকা ছিল না।

আগস্টবিক্ষোভ সংঘটিত হয় আরও মুক্তভাবে, আরও স্বাধীনভাবে এবং প্রচলিত ছাত্রনেতৃত্ব ছাড়াই। এই ছাত্রবিক্ষোভকে যদি সরকার আমলে না নেন, তা হলে ভবিষ্যতে তা নতুন এক সাংগঠনিক কাঠামোয় অবশ্যই দানা বেধে উঠবে এবং আগেকার অসন্তোষগুলোর একটি ন্যায্য প্রতিকার দাবি করবে।

অপপ্রচার চলল প্রবাসেও। সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসি'তে *হেরিটেজ ফাউন্ডেশন*এর সেমিনার *বাংলাদেশ ডেমোক্র্যাসি অ্যাট দ্য ক্রস রোড*এ যোগ দিতে গিয়ে সাবেক এক কূটনীতিক প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভ্রান্ত করার যারপরনাই চেষ্টা চালালেন। তাঁর এই তৎপরতা নিয়ে অনিরুদ্ধ আহমেদ একটি কলাম (বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, বিস্ময়কর বিশেষণ এবং অতঃপর) লিখলেন দৈনিক সমকালে। অনিরুদ্ধ আহমেদ লিখলেন, এই কূটনীতিক দাবি করেছেন তিনি এমন কিছু 'ফুটেজ' দেখে এসেছেন, যেখানে রাজনৈতিক সংশিষ্টতার প্রমাণও রয়েছে এ ঘটনায়। তিনি দেখেছেন ওই ভিডিও ফুটেজে টাকা আর খাবার বিতরণেরও দৃশ্য রয়েছে। তাঁর এ কথা শুনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও একটি সংবাদমাধ্যমের একজন সাংবাদিক জানতে চান, এদের বিরুদ্ধে সরকার কেন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কূটনীতিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। কেবল বললেন, তিনি অনেকদিন দেশের বাইরে আছেন, সবশেষ পরিস্থিতি বলতে পারবেন না!' কে এই অপপ্রচারক কূটনীতিক? *হেরিটেজ ফাউন্ডেশন*এর ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, ওই সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে মাত্র একজনই সাবেক কূটনীতিক অংশ নিয়েছিলেন, তিনি *বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স*এর ডিরেক্টর ওয়ালিউর রহমান।

কিন্তু এসব অপপ্রচার জনমনে দাগ ফেলতে খুব কমই সক্ষম হয়েছে। তাই বিক্ষোভ ছত্রখান করার সময়েই বিবিসি-বাংলাদেশ সংলাপে কয়েকজন শ্রোতা ও প্যানেল বক্তাকে খুব সাহসিকতার সঙ্গে বলতে শোনা গেছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে অপশক্তির ষড়যন্ত্র বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ...পাঁচজন শিক্ষককে গ্রেফতার করে সরকার খুবই খারাপ কাজ করেছে। ...কয়েকজন উপদেষ্টাকে পরিবর্তন এনে সরকারের মধ্যে সংস্কারের প্রয়োজন। ...গণমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করায় সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে (প্রথম আলো, ২৬ আগস্ট ২০০৭)।'

গণমাধ্যমগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং কোনও কোনও গণমাধ্যমকে একদলীয় সংসদে পরিণত করে জনঅসন্তোষকে গোপন করা সম্ভব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ বিকল্প পন্থায় জানতে শুরু করেছে দেশের প্রকৃত অবস্থা। তারা দেখছে স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলার মিথ মোটেও সত্য নয়। সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী শুধু পাটকলগুলি বন্ধ করার 'জেহাদের' কারণে নয়, সারসংকটজনিত মন্তব্যের কারণেই নয়, আলোচিত হন ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত কারণে অপব্যবহার করায়। আন্তর্জালে তিনি অভিধা পান 'গডমাদার।' তাঁর স্বামী ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও

সাবেক সাংসদ নাজিম কামরান চৌধুরীর নেতৃত্বে গুলশান-দুই-এর একটি বহুতলবিশিষ্ট ভবন বেদখল করে রাখার চেষ্টা চালিয়েছেন গত অক্টোবরে। এ ভবনে রয়েছে গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীর বিজ্ঞাপনী সংস্থা *অ্যাডকম*, রয়েছে নাজিম কামরান চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান *সাইন এজ* এবং *মেগাভিশন*। ৩০ সেপ্টেম্বর ভবন ভাড়ার চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও ভবনটিতে অফিস চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তারা। ভবনমালিক ভবন থেকে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, নাজিম কামরান চৌধুরীরা তাই জেনারেটর বসিয়ে অফিস চালু রাখার উদ্যোগ নেন। তারও আগে, ভাড়া নেয়ার পর থেকেই বিভিন্নভাবে ভবনের নকশা পরিবর্তন করেন তারা। এই বেআইনি ভবনসজ্জা বাতিল করা র‍্যাংগস ভবন ভাঙার চেয়ে অনেক সহজ। কিন্তু তা ভাঙতে যাবে কে? বরং ২২ অক্টোবর শারিরীকভাবে অপদস্থ করা হয় ভবনের মালিক ফারহানা ইসলাম ও তার স্বামী অধ্যাপক মাহবুবুল ইসলামকে। আর যে দেশে গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী সরকারের উপদেষ্টা এবং তারই আত্মীয় ফখরুদ্দিন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা, সে দেশে ফারহানা ইসলাম আর মাহবুবুল ইসলামকে অপদস্থ করলে আর কী আসেযায়! অপদস্থরা ২৫ অক্টোবর ২০০৭ সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়েছিলেন। অ্যাডকম থেকে টেলিফোন করে গণমাধ্যমগুলিকে বলা হয়েছিল, সংবাদ সম্মেলনে না যেতে। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে কে যাবে সংবাদ সম্মেলনে? অতএব সেই সংবাদ সম্মেলনে প্রধান সারির কোনও গণমাধ্যমের কোনও সাংবাদিককে দেখা গেল না।

তবে এতো খুবই সামান্য সন্ত্রাস; অনেকেই এখন জানেন আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলের মৃত্যুর কথা। নির্মমভাবে নির্যাতন করে তাকে যৌথ বাহিনী হত্যা করেছে, কেননা তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের নেতা। মানুষ জানে র‍্যাবের হাতে গুলিবিদ্ধ বেনজিরের কথা। সারা পৃথিবী জানে কী প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়েছে আকাশকে। কী অবর্ণনীয় নির্যাতননিপীড়ন চালানো হয়েছে আগস্টের শেষ দিনগুলোতে। না, এদের কারও গায়েই খালেদা-ফালু-তারেক-মামুন-কোকোদের মতো দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছিল না, এদের কারও ছিল না সাইফুর-মান্নানদের মতো কথিত সুনাম, ছিল না হাসিনা-জলিল-সেলিমদের মতো দুর্নীতির কোনও আলামতও। কিন্তু তারপরও গত এক বছরে অসংখ্য মানুষ বিনা বিচারে খুন হয়েছে এ সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীগুলির হাতে। *অধিকার* নামের একটি বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক জরিপে দেখা যাচ্ছে, ২০০৭-এর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫৭ জন মানুষ নিহত হয়েছেন এ সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে। এদের মধ্যে ৮৩ জন নিহত হয়েছেন র‍্যাবের হাতে, ৫২ জন নিহত হয়েছেন পুলিশের হাতে, সাতজনকে খুন করেছে সেনাবাহিনী, সাতজন খুনকে করেছে যৌথবাহিনী, তিনজনকে খুন করেছে নৌবাহিনী, তিনজকে যৌথভাবে খুন করেছে পুলিশ ও র‍্যাব, আর 'মাত্র' একজন করে মানুষ হত্যা করেছে যথাক্রমে জেল পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এদের মধ্যে ১০৭ জনকে খুন করা হয়েছে ক্রসফায়ারে, ২৯ জন নিহত হয়েছেন নির্যাতন করার সময় আর বাদবাকিরা নিহত হয়েছেন বিভিন্ন ঘটনার সময়ে। ২০০৬ সালের জোট সরকারের একই সময়ের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে এ রকম মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশি, মৃত্যুর প্রকরণও অনেক নিষ্ঠুর। মৃত্যুর এই মিছিল দেখে হিউম্যান রাইট ওয়াচের এশিয়া ডিরেক্টর ব্রাড অ্যাডামস বলেছেন, 'বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন সরকারের ডেথ স্কোয়াডে পরিণত হয়েছে। এর পদ্ধতি আইনবহির্ভূত এবং তা বিশেষত সেই জাতির জন্যে খুবই লজ্জাজনক, যার এক নাগরিক কেবলই শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।' তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, শুরুতে এই নতুন সরকার যে সুনাম অর্জন করেছিল তা দ্রুতই তারা হারাতে চলেছেন। এটি পরিস্কার যে দেশ চালাচ্ছে সামরিক বাহিনী। এবং অচিরেই তাদের চলে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই (ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, চার জুন ২০০৭)।

এই লজ্জার দায় কে নেবে? বাংলাদেশের পরিস্থিতি তাই ভেতরে ভেতরে বিস্ফোরন্মুখ হয়ে রয়েছে। সরকার তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ নিয়ে যেসব রহস্যময় আচরণ করে চলেছে তাতে শুধু ফুলবাড়ির জনগণই নয়, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে গোটা বাংলাদেশ। গরিবের রক্তমাখা বহুজাতিক কোম্পানি এশিয়া এনার্জিকে সরকার যেভাবে প্রটেকশন দিয়ে চলেছেন তা বিস্ময়কর। ফুলবাড়ী চুক্তি অনুযায়ী উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি বাতিল করে অবিলম্বে এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। কিন্তু সাংবিধানিক ক্ষমতা না থাকার পরও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গোপনে সেই চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সরকারকে এ ব্যাপারে ইন্ধন যোগাচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সামান্য কিছু অর্থ পাওয়ার জন্যে কোনও কোনও গণমাধ্যম, বিদেশ ভ্রমণ ও পকেট ভারী করার জন্যে কোনও কোনও সাংবাদিক সমর্থন দিয়ে চলেছেন এশিয়া এনার্জিকে! এরা বুঝতে পারছেন না ভয়ানক এক পাহাড়ী খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা এবং যে কোনও সময় জনগণের ধাওয়া খেয়ে সেই খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ছাড়া তাদের অন্য কোনও পথ নেই, অন্য কোনও উপায় নেই।

অত্যাসন্ন স্থায়ী অস্থিতিশীলতা

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগুন নিয়ে খেলছে। ...সরকারের ধরে নেয়া উচিত হবে না যে তাদের সব কাজেই ভোটারদের সায় আছে। ...তিন মাসের জন্য যে সরকারের জন্ম, তারা যদি মনে করে যে তাদের অন্তত দুই বছর ক্ষমতায় থাকা উচিত তা হলে বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবে একটি সাংবিধানিক সংকটের জন্ম হবে।
– ডন ম্যাককিনন, কমনওয়েলথ মহাসচিব, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

জনগণকে বন্দি করে রাখা হয়েছে যাতে দ্রব্যমূল্য মুক্ত থাকতে পারে।
– এদুয়ার্দো গালিয়ানো, ১৯৯০।

আগস্টে যে গণবিক্ষোভ নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে, তা অনিবার্যভাবেই সুশীল সমাজকে সামরিকতন্ত্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে ফেলেছে। এখন আর এই সামরিকতন্ত্র সুশীলমনস্ক সামরিকতন্ত্র নয়, এখন এই সুশীল সমাজই সামরিকতন্ত্রমনস্ক। আগস্ট গণবিক্ষোভের পর তাই 'সামরিক বাহিনীর কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই' কথাটি বলার দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। গণবিক্ষোভকে তুচ্ছ প্রমাণ করার জন্যে মাত্র দু সপ্তাহের মাথায় আট সেপ্টেম্বরেই প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে বললেন, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ঢিলে করা হচ্ছে। কিন্তু কার্যত ঢাকা ছাড়া অন্য কোথাও ঘরোয়া রাজনীতির কোনও সুযোগ রাখা হলো না। বিবিসি বাংলা বিভাগের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বললেন, রাজনৈতিক কোনও ভূমিকাই নেই সামরিক বাহিনীর। প্রেসের না কি স্বাধীনতা রয়েছে। এবং সামরিক বাহিনী প্রধান আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণের পর পরিস্থিতির আরও 'উন্নতি' ঘটল। গণবিক্ষোভের দায়ে যে শিক্ষকদের তারা কারাগারে নিয়ে গিয়েছিল, সেই শিক্ষকদের একদিকে মুক্তি দেয়া হলো, অন্যদিকে অপপ্রচার চালানো হলো, ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

যেহেতু এই সরকারের কোনও সাংবিধানিক বৈধতা নেই, সেহেতু তারা প্রথম থেকেই তৎপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বৈধতা আদায়ের ব্যাপারে; তৎপর প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসন্নতার অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু কাজের কাজ খুব কমই হয়েছে। যেমন, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে আফ্রিকার মালিতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিশ্বের ১৬৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালো হলেও বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। কারণ বাংলাদেশ 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার সংগ্রামে ব্যর্থ হয়েছে (আমাদের সময়, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।' ২০০০ সালে এ ফোরামটি গঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাসি কোয়ালিশন প্রজেক্ট, জার্মানির বার্টেলসম্যান স্টিফটাং, ঘানার সেন্টার ফর ডেমোক্রেটিক ডেভেলপমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউজের গবেষণা ও বিশেষণমূলক পরামর্শ অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি এ ফোরামের সম্মেলনের জন্যে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নির্ধারণ করে। ২০০৫ সালেও চিলির সান্টিয়াগোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছিল। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে তার নাম কাটা গেল গণতান্ত্রিক দেশের তালিকা থেকে!

কমনওয়েলথ-এর পক্ষ থেকেও ভারত সফরের সময় মহাসচিব ডন ম্যাককিনন তাঁর সাক্ষাৎকারে নেতিবাচক ধারণা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ সম্পর্কে। বলেছেন, '...বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগুন নিয়ে খেলছে। ...সরকারের ধরে নেয়া উচিত হবে না যে তাদের সব কাজেই ভোটারদের সায় আছে। ...তিন মাসের জন্য যে সরকারের জন্ম, তারা যদি মনে করে যে তাদের অন্তত দুই বছর ক্ষমতায় থাকা উচিত তা হলে বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবে একটি সাংবিধানিক সংকটের জন্ম হবে (আমাদের সময়, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭)।'

এমনকি বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, যিনি আগস্টে সরকারি অপপ্রচারণার মুখপাত্র হয়েছিলেন, তিনিও ১৯ ডিসেম্বর ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ডগলাস আলেকজান্ডারের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশে কবে জরুরি আইন প্রত্যাহার করা হবে সে ব্যাপারে তারা সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন।'

এমনকি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের দাভোস সম্মেলনে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের যোগদানের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ইমেজসংকট আরও বেড়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতেও আমরা দেখেছি এএফপি'র মিচেল ইউলারের তোলা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ছবি : ২৪ জানুয়ারিতে বিঅফো'র অধিবেশনে যোগ দেয়ার ঠিক আগে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ পরস্পরের হাত ধরে সারিবদ্ধভাবে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অপার্থিব এক প্রশান্তির ছাপ তাদের তিনজনের চোখেমুখে, যে প্রশান্তি ফুটে ওঠে কেবল পরম কোনও মিত্রের সঙ্গে দেখা হলে। বাংলাদেশে এখন কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় শাসন চলছে, তা বোঝার জন্যে এই একটি ছবিই যথেষ্ট; যথেষ্ট বিঅফো'র ওই অধিবেশনটির শিরোনাম এবং তাতে অংশগ্রহণকারী সবার নাম।

এ অধিবেশনটির শিরোনাম ছিল : শান্তি ও স্থিতিশীলতার সন্ধানে। আর তাতে অংশ নেন আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই, পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ এবং ইরাকের উপপ্রধানমন্ত্রী বারহাম সালেহ। আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি ইহাম আলিয়েভেরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল এ অধিবেশনে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি আর যোগ দেন নি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের উদ্যোক্তা ক্লাস এম স্কোয়াবের প্রয়োজন হয়েছিল এই অধিবেশনটির জন্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি নেয়ার; কেননা বাংলাদেশে 'শান্তি' নেই, 'স্থিতিশীলতা' নেই এবং ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এখানকার কথিত সিভিল সোসাইটি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে সামাজিক বাণিজ্য ও কর্পোরেটমার্কা শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার। ১১ জানুয়ারির অনেক আগে থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের সামাজিক উদ্যোক্তারা সুশাসন, স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের নামে যেসব ভেলকিবাজী দেখাতে শুরু করেছেন তাতে বাংলাদেশ যদি এবার বিঅফো'র ফোরামে আমন্ত্রণ না পেতো তা হলে তা হতো খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। ২০০৬-এ ড. ইউনূসের গায়ে নোবেল পুরস্কারের ছাপ এঁটে দেয়া হয়। বিশ্বপুঁজিবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠার লক্ষ্যে মুহম্মদ ইউনূসকে প্রধান সামাজিক উদ্যোক্তার মর্যাদা দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এখন। কাজেই এবারের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে সবচেয়ে দ্রষ্টব্য গিণিপিগ ছিল ইউনূস-ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধানকৃত বাংলাদেশ। যার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক মর্যাদা হয়ে উঠেছে কৌতূহলদ্দীপক হাস্যকর।

তবে এতে অন্তত একটি কাজ হয়েছে; এই সুশীল সামরিকতন্ত্র বুঝতে পারছে, সুশীল পাদুকা সামনে রেখে আর বেশিদিন শাসন করা যাবে না; শিকাগো অর্থনৈতিক স্কুলের ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক তত্ত্ব কার্যকর করার জন্যে তারা প্রাণপাত করলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়া যাবে না। তাই কারাগারে রাখা পরিবারতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সব নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সমঝোতার জন্যে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন কী বলেছিলেন মনে করা যাক, 'আমরা তো চেয়েছিলাম ওনারা (সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী) দেশের বাইরে থাকুন। এসব ঝামেলার মধ্যে ওনারা না আসুন। কিন্তু ওনারা তো আমাদের সেই সুযোগ দিলেন না (ভোরের কাগজ, আট সেপ্টেম্বর ২০০৭)।' এখন সামরিকতন্ত্র যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়ে এবং মৌরিতানিয়ার মতো এখানেও যাতে সামরিকতন্ত্রের পছন্দসই সরকার নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করতে পারে সেজন্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়িয়ে এমন একজনকে এ পদে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যিনি সামরিকতন্ত্রের কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য, যিনি গায়ে আর খাকী পোশাক না থাকলেও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর স্বার্থই দেখবেন। এবং তিনি যাতে সেই স্বার্থ দেখতে পারেন, সেজন্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে। সবাই ভুলে যেতে বসেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে আসলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটুকু থাকে, কতটুকু থাকা উচিত। সামরিকতন্ত্র পরিচালিত রাজনৈতিক সংস্কারের পরিধি ছোট হয়ে এখন তা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসংস্কারে সীমিত হয়েছে এবং ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দু সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ আদালতে লিখিতভাবে আইনজীবীর মাধ্যমে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেছিলেন, 'দেশকে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিতে একটিমাত্র সংস্কারের প্রয়োজন। আর সেটি হলো, দেশের সেনাপ্রধানকে পদাধিকার বলে দেশের রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা এবং সে লক্ষ্যে জাতীয় সংলাপ শুরু করা (ইত্তেফাক, তিন সেপ্টেম্বর ২০০৭)!' পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সামরিকতন্ত্র নিশ্চিত হয়েছে উর্দিপরানো রাষ্ট্রপতি বসানো ঠিক হবে না। তাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে, যাতে উর্দি খুলে বসলেও ক্ষমতা ব্যবহারে কোনও অসুবিধা না হয়। এসব কাজে সহায়তার জন্যে এগিয়ে আসছেন এক জাতীয় রাজনীতিকও। আশির দশকে সামরিক শাসনের সময় রাজনৈতিক ভাড় ছিলেন আ স ম আবদুর রব, এখন সেই দায়িত্ব স্বপ্রণোদিতভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ড. কামাল হোসেন। আশির দশকে ছিল একজন আনোয়ার জাহিদ, আর এখন জন্ম হয়েছে বেশ কয়েকজন আনোয়ার জাহিদের। সরকার যদি গণতান্ত্রিক নাও হয়, অন্তত নির্বাচিত হয়,– তা হলে আমাদের বোঝার উপায় থাকে, সেটি গণতান্ত্রিক কি না; আমাদের প্রশ্ন তোলার অধিকার তাকে সেটি কনফুসিয়াসের বাঘের চেয়েও ভয়ংকর কি না। কিন্তু যদি জরুরি অবস্থা থাকে, নিয়ন্ত্রিত অনির্বাচিত রাষ্ট্রীয় শাসন থাকে তা হলে আমরা হঠাৎ করেই সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারি। কেননা গণমাধ্যম সেখানে এত বেশি অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আঘাত না পেলে টেরই পায় না যে সে কনফুসিয়াসের বাঘের চেয়েও ভয়ংকর এক জানোয়ারের খপ্পরে পড়েছে, বুঝতে পারে না যে সে বাস করছে চরমতম অগণতান্ত্রিক পরিবেশে। আবার টের পেলেও তার পক্ষে সম্ভব হয় না তা সবার কাছে প্রচার করা। এই সামরিক সুশীলায়তন এখন এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে, যাতে আগামী সংসদ তাদের সংজ্ঞানুযায়ী সচল থাকে। খোলাখুলি প্রচার চালাচ্ছে তারা, আগামী সংসদ যাতে সচল থাকে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এতই হাস্যকর এই দাবি যে এ সম্পর্কে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, ''আগামী সংসদ কি রোবট দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে? তাঁদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা আপনি কোনো রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চান? ভালো হোক, মন্দ হোক তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।''

আমাদের জন্যে এই পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ। কেননা আমাদের সামনে এখন আশি ও নব্বই দশকের রাজনৈতিক মানের প্রশ্নবিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলিও নেই, যারা রাজপথে সংগ্রাম করবে। সবাই পরিণত হয়েছেন হয় রাজনৈতিক ভাড়ে, না হয় সামরিক গোয়েন্দাদের হয়রানির ভয়ে রাজনৈতিক সংস্কারবাদীতে। আর আরও আগেই নষ্ট করা হয়েছে ছাত্র রাজনীতি,– যার ফলে এই রাজনৈতিক ভাড় ও পুরানো নেতৃত্বের স্থান পূরণ করার মতো কেউ আছে বলেও মনে হয় না!

তাই স্থিতিশীল রাজনীতি, দুর্নীতি দমন আর গতিশীল অর্থনীতির কথা যতই বলা হোক না কেন,– এই শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অচিরেই দেশ স্থায়ী এক অস্থিতিশীলতার দিকে ছুটে চলেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এখানে দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিচার বিভাগের কর্মকাণ্ডে এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই স্বাধীনতা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা বাড়িয়ে এখানে প্রকৃতার্থে দ্বৈতশাসন চালু করা হচ্ছে, সামরিকতন্ত্রকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার অংশীদার করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। একদা সামরিকজান্তা এরশাদ যে চক্রান্ত করেছিলেন, সুশীলদের সহায়তায়, তাদের গণমাধ্যম নামের 'সংসদ'-এর সুবাদে সেই চক্রান্ত এবার সফল হতে চলেছে। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে, ইচ্ছা করেই বাড়ানো হচ্ছে, যাতে একটি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরকারের পূর্বনির্ধারিত বিকল্প এজেন্ডাগুলি দারুণ সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়। বাংলাদেশ পরিণত হতে চলেছে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে, যেখানে অলংকারের মতো শোভা পাবেন সুশীল ভাইবোনরা, আর 'চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল-নুন-লাকড়ি পাচ্ছি' বলতে বলতে ঝাঁকের কইয়ের মতো ঝাঁকে মিশে যাবেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা, কোনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দেখলেও মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষরা অনিশ্চয়তার ভয়ে আর কোনও প্রতিবাদের মধ্যে যাবেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন গড়ে তোলা হয়েছে নতজানু এক নাগরিক শ্রেণি, যারা ভবিষ্যতঅনিশ্চয়তার ভয়ে রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির দিক থেকে চোখ সরিয়ে চেয়ে থাকে নিজেদের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে, ঠিক তেমনই নাগরিক শ্রেণি তৈরির আয়োজন চলছে এখন বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র জুড়ে। আর এই নাগরিক শ্রেণি গঠন ও পরিচালনার কাজ সুসমন্বিত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলছে একদম নতুন এক 'বিএনপি' গড়ে তোলার কাজ,– যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবে, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলবে কিন্তু বাজার মৌলবাদকে বিকশিত করবে এবং বিশ্বাস করবে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে। হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধেও বিশ্বাস করবে তারা, তবে অতীতের একটি পর্ব হিসেবে।

কিন্তু এ প্রচেষ্টাও যদি ব্যর্থ হয়?

তখন অস্থিতিশীলতার চেয়েও শক্তিমান হয়ে উঠবে গণতন্ত্রহীনতা। তবে তাতে কোনও কিছুই আসে যায় না। কেননা মূল এজেন্ডা তো সব কিছু খোলা বাজারে ছেড়ে দেয়ার মতো বিভিন্ন বিকল্প পথ তৈরি করা। সংকট যত ঘনীভূত হবে, জনগণ যত আকস্মিক আঘাতে হতবিহ্বল হবে ওই সব বিকল্প পথের প্রয়োগ হবে ততই সহজ। ততই সহজ হবে বাজার মৌলবাদের বিকাশ। এর জন্যে কয়েকজন ক্ষমতাধর রাজনীতিক কিংবা কয়েক কোটি জনগণকে বলি দেয়া কী আর কঠিন কাজ? কোন রাজনীতিক নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসল তাতে কোনও কিছু আসে যায় কি? মূল প্রশ্ন হলো, অতীতকে, অতীতের সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন সরকার বাজারের দুয়ার আরও খুলে দিতে পারবে কি না। আওয়ামী লীগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আদমজি জুটমিলকে বন্ধ করে দিতে পেরেছিল জোট সরকার, তেমনি নতুন সরকার পারবে কি না আগের সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ধরা যাক, চট্টগ্রাম বন্দরটি বেসরকারি করতে,– এ রকম সব প্রশ্নই হলো বড় প্রশ্ন।

তার আগে বা পরে কোনও প্রশ্ন নেই। তার আগে-পরে আছে শান্ত রক্তপাত, শান্ত সন্ত্রাস, আছে গোপন দীর্ঘশ্বাস। যা ফ্রিডম্যানদের ঔরসজাত এ দেশের নীতিনির্ধারকদের পক্ষে অনুভব করা কখনোই সম্ভব নয়।

অগ্রহায়ণ ১৪১৪-চৈত্র ১৪১৪। প্রকাশ : সমাজ নিরীক্ষণ, ১০৪তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮।

বাজারের ক্ষুধা : বলিভিয়া থেকে বাংলাদেশ

তাঁর নাম জেফ্রী ডেভিড সাশ।

মার্কিন এ-ভদ্রলোক পেশাগত জীবনে অর্থনীতিবিদ। তা ছাড়া জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। কিন্তু এসবই তাঁর খুব শাদামাটা পরিচয়। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সাশের গৌরবময় পরিচিতি হলো শক থেরাপী নামের বাজারকৌশলের সফল প্রয়োগকারী হিসেবে। তাঁর পৌরহিত্যেই মধ্যনব্বইয়ে বলিভিয়ায় এবং বার্লিনপ্রাচীর ধ্বসে পড়ার পর পূর্ব জার্মানিতে শক থেরাপী বাজারকৌশল প্রয়োগ করা হয়।

১৯৮৫ সালে বলিভিয়ার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। দীর্ঘদিনের একনায়কতান্ত্রিক শাসন বলিভিয়াকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। কিন্তু মধ্যনব্বইয়ে পৃথিবীর আরসব উন্নয়নশীল দেশের মতো বলিভিয়ায়ও দীর্ঘ ১৮ বছর পর গণতন্ত্রের হালকা হাওয়া লাগে। বলিভিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন রিগানের নেতৃত্বাধীন আমেরিকার পরামর্শে নেয়া কিছু পদক্ষেপের কারণে অবর্ণনীয়রকম বাজে। দেশটিকে প্রতি বছর ঋণের সুদ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ গুণতে হচ্ছিল তা ছিল জাতীয় বাজেটের চেয়েও বেশি। আর মূদ্রাস্ফীতি ছিল ১৪,০০০ শতাংশ।

এরই মধ্যে ১৯৮৫ সালে বলিভিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রাক্তন একনায়ক হুগো বানসার, আর প্রাক্তন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ভিক্টর পাস এস্তেনসরো। হুগো বানসার নিশ্চিত ছিলেন, নির্বাচনে তিনি জয়ী হবেন। নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই বানসারের পার্টি উদ্যোগ নেয় বলিভিয়ার মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনার মতো একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের। সঙ্গতকারণেই তাদের মনে হয় এই জেফ্রী সাশের কথা,– যিনি তখন হাভার্ডের অর্থনীতি বিভাগের একজন তরুণ অথচ অ্যাকাডেমিক প্রতিভার গুণে সুপরিচিত শিক্ষক – কারণ কয়েক মাস আগে বলিভিয়ার একদল রাজনীতিক হাভার্ড সফরে গেলে সাশ তাদের সামনে বেশ জোর গলায় বলেছিলেন, বলিভিয়ার এই মুদ্রাস্ফীতিজনিত সংকট তিনি তাঁর চিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে রাতারাতি ঝেড়ে ফেলতে পারেন।

এমনিতে সাশ ছিলেন অর্থনীতিবিদ কেইন্সের গুণমুগ্ধ,– যাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে শিকাগোর মিল্টন ফ্রিডম্যানের অর্থ নৈতিক তত্ত্বের বিরোধ সুবিদিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উচ্চমুদ্রাস্ফীতি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিস্তৃতির পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা কেইন্সের রচনা থেকে সাশ অনুপ্রাণিত হন দারুণভাবে। অর্থনীতিবিদ কেইন্সের এ- উদ্ধৃতি ছিল তাঁর খুবই প্রিয় : "সমাজের বিদ্যমান ভিত্তি উল্টে দেয়ার জন্যে মুদ্রাকে বিপথগামী করার চেয়ে আর কোনও সূক্ষ্মতর, নিশ্চিততর উপায় নেই। এ প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক নিয়মের সকল লুকায়িত শক্তিসমূহকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।" এ-রকম পরিস্থিতিতে অর্থনীতিবিদদের পবিত্র দায়িত্ব হলো ধ্বংসাত্মক ওইসব শক্তিগুলিকে যে কোনও মূল্যে দমন করা,– তিনি ছিলেন কেইন্সের এ-দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী।

কিন্তু দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেইন্সের অর্থনীতিসংক্রান্ত বিশ্বাসের মুগ্ধ পাঠক হলেও জেফ্রী সাশ ছিলেন রিগানের আমেরিকাজাত সন্তান। আর আমেরিকায় রিগানের শাসনামল থেকেই উত্থান ঘটতে শুরু করে মিল্টন ফ্রিডম্যানের। তাঁর লেখা বই এক হাতে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নামেন রিগান, আর বিজয়ী হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে নানা কায়দায় ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব-পরীক্ষার গিনিপিগে পরিণত করতে থাকেন। এবং সাশ ছিলেন এই ফ্রিডম্যানের বাজারবিশ্বাসের, যথাযথ অর্থব্যবস্থাপনার ধারণার অনুসারী।

বলিভিয়ায় তখন প্রয়োজন ছিল পুরানো উপনিবেশিক মালিকানা কাঠামো ভেঙে ফেলার। ভূমিসংস্কার, বাণিজ্য সংরক্ষণ ও ভর্তুকি, প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণ এবং সমবায়গতভাবে পরিচালিত কর্মস্থল ইত্যাদি বিবিধ উদ্ভাবনমূলক পন্থাতেই কেবল সম্ভব ছিল দেশটিকে রক্ষা করা। কিন্তু সত্যিকারের এ-সব কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাপারে সাশের কোনও আগ্রহ ছিল না। কেননা তিনি 'নিশ্চিত' হয়েছিলেন উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াও বালিভিয়ার আরেকটি মারাত্মক সমস্যা হলো 'সমাজতান্ত্রিক রোমান্টিকতা'। তাঁর কাছে মনে হলো, ফ্রিডম্যানের তরিকা ধরে বলিভিয়াকে মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে তিনিও হয়ে উঠবেন আরেক কেইন্স। একবারও তাঁর মনে হলো না, জার্মানি থেকেও মুদ্রাস্ফীতি দূর করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয় ও ফ্যাসিজমের হাত থেকে জার্মানিকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

তা ছাড়া কেইন্সবাদের মূল কথা হলো, মারাত্মক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপসারণে আক্রান্ত দেশগুলিতে অর্থনীতিকে সচল করার জন্যে প্রয়োজন অর্থ ঢালা। কিন্তু সাশ নিলেন এর ঠিক বিপরীত পন্থা, তিনি বললেন, সংকটের মাঝখানে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, বিভিন্ন কিছুর মূল্য বাড়িয়ে দিতে হবে। চিলির ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই সংকোচন রেসিপি অনুসরণ করা হয়েছিল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিপর্যয় ঘটানো হয়েছিল; আর 'বিজনেস উইক' পত্রিকা ওই চিলিকে বর্ণনা করেছিল 'ড. স্ট্রেইঞ্জলভ ওয়ার্ল্ড' হিসেবে।

বানসারের প্রতি সাশের উপদেশ ছিল খুবই খোলামেলা : কেবলমাত্র বেমওকা এক শক থেরাপির মাধ্যমেই সম্ভব বলিভিয়াকে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সংকট থেকে রক্ষা করা। এই শক থেরাপীর নমুনা হিসেবে তিনি প্রস্তাব করলেন, তেলের দাম দশগুণ বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে আরও সব পণ্যের মূল্য। তিনি বললেন, অমুক অমুক জায়গায় বাজেট কাটতে করতে হবে। বলিভিয়ান-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আবারও জোর গলায় ভবিষ্যতবাণী করলেন, 'একদিনের মধ্যেই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির পরিসমাপ্তি ঘটবে।' কেননা ফ্রিডম্যানের মতো সাশও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বেমওকা নীতিঝাঁকুনির মধ্যে দিয়ে 'একটি অর্থনীতি তার শেষপ্রান্ত থেকে, সমাজতন্ত্রের প্রান্ত থেকে, ব্যাপক দুর্নীতির প্রান্ত থেকে অথবা কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার প্রান্ত থেকে একটি স্বাভাবিক বাজার অর্থনীতিতে পুনর্গঠিত হতে পারে।'

সাশ যখন এইসব কড়া সব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সে সময়েই বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। নির্বাচনে হুগো বানসার প্রথম হলেন, দ্বিতীয় হলেন পাস এস্তেনসরো। প্রচারণার সময় এস্তেনসরো কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন সে-সম্পর্কে খুব কমই বলেছিলেন। ১৯৬৪ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগঅবধি বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। এবং তিনিই ছিলেন সে-সময় বলিভিয়ায় চোখে পড়ার মতো পরিবর্তনগুলোর উদ্যোক্তা, বড় বড় খনিগুলি জাতীয়করণ করেন তিনি, আদিবাসী কৃষকদের কাছে জমি বন্টন করতে শুরু করেন, সকল বলিভিয়াবাসীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ধীরে ধীরে পাস হয়ে ওঠেন বলিভিয়ার রাজনীতির এক রহস্যপুরুষ। ১৯৮৫-এর নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি আবারও তাঁর ''জাতীয়তাবাদী বিপবাত্মক'' অতীতের প্রতি তাঁর আস্থার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং রাজস্ব কার্যক্রম সম্পর্কে বড় বড় বুলি ঝাড়তে থাকেন। যদিও তিনি সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, তবে অন্তত শিকাগো স্কুলের নিওলিবারালও হবেন না – অন্তত পক্ষে বলিভিয়ানদের এ-রকমই ধারণা ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি কে হবেন, চূড়ান্ত সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল কংগ্রেসের ওপর। আর পর্দার আড়ালে পার্টি, কংগ্রেস ও সিনেটের এই দেনদরবারে বানসার হেরে গেলেন। পাস-কে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তুলে আনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রাখলেন নির্বাচিত এক সিনেটর গনসালো সানচেস দে লোসাদা, যিনি বলিভিয়ায় সাধারণভাবে পরিচিত গনি নামে। এত দীর্ঘদিন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছেন যে তিনি স্প্যানিশ বলতেন মার্কিনী উচ্চারণে। বলিভিয়ায় তিনি ফিরে এসেছিলেন দেশটির সবচেয়ে সম্পদবান ব্যবসায়ী হবার লক্ষ্য নিয়ে। ওই সময়েই তিনি ছিলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যক্তিমালিকানাধীন খনির মালিক, যা পরে পরিণত হয় দেশের বৃহত্তম খনিতে। গনি লেখাপড়া করতেন ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে। অর্থনীতির ছাত্র না হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন ফ্রিডম্যানের বাজারমন্ত্রে। তখনও বলিভিয়ার খনিসম্পদ ছিল মুখ্যত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। তাই সাশ যখন বানসারের টিমের কাছে তাঁর শক থেরাপী তুলে ধরেন, গনি তাতে প্রভাবিত হন ভীষণরকম। বলিভিয়ায় নিযুক্ত ওই সময়ের মার্কিন রাষ্ট্রদূতও ভূমিকা রাখেন এ ব্যাপারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তিনি বলেন, কেবলমাত্র শকরুট ধরে এগিয়ে গেলেই বলিভিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

পর্দার আড়ালের বিভিন্ন সমীকরণ থেকে আগস্ট ০৬, ১৯৮৫তে পাস-এর হাতে বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব তুলে দেয়া হলো কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আর এর মাত্র চারদিন পর বলিভিয়ার অর্থনীতিকে ঝড়ের গতিতে আমূল পরিবর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ-গোপনীয় দ্বি-পক্ষীয় অর্থনৈতিক টিমের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে পাস-এর পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হলো গনজালো সানচেজ ডি লোজাডা ওরফে গনিকে। আর এই টিম বেছে নিলো সাশ প্রস্তাবিত শক থেরাপী। কয়েক দশক আগে পাস-এর নেতৃত্বেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেলের যে-রূপ নির্মিত হয়েছিল সেটি বাতিলের পরিকল্পনা নেয়া হলো। এমনকি পাস-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অন্ধকারে রাখা হলো এই টিম ও পরিকল্পনার ব্যাপারে। বলিভিয়ার সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আর কৃষক সংগঠনগুলি যাতে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে না পারে, সেজন্যে

বজায় রাখা হলো কঠোর গোপনীয়তা। ১৭ দিন পর পাস-এর পরিকল্পনামন্ত্রী গেলার্মো বেদ্রেগাল বলিভিয়ার শক থেরাপী কর্মসূচির ড্রাফটটি তাঁর হাতে পেলেন। এ ড্রাফটের সিদ্ধান্ত ছিল, খাদ্য ভর্তুকি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হবে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রায় সবটাই বাতিল করা হবে এবং তেলের মূল্য ৩০০ শতাংশ বাড়ানো হবে। বলা হলো, এর ফলে অবস্থার যত অবনতিই ঘটুক, এমনকি সরকারি বেতনও বাড়ানো হবে না। বলা হলো, সরকারি ব্যয় একেবারেই কমিয়ে ফেলা হবে, বলিভিয়ার সীমান্তে কোনও আমদানিপ্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীগুলো সংকুচিত করা হবে অথবা বেসরকারিকরণ করা হবে। এইভাবে বলিভিয়াতে নতুন করে শুরু হলো সত্তর দশকের ব্যর্থ নিওলিবারাল বিপব।

যারা এ-পরিকল্পনা করেছিলেন, তারা নিজেরাই শংকিত ছিলেন বলিভিয়ার জনগণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। অর্থনৈতিক টিমটি যখন বলিভিয়ার আইএমএফ কর্মকর্তাদের কাছে এ-পরিকল্পনার খসড়া তুলে ধরেন, তখন আইএমএফ প্রতিনিধি যা বলেছিলেন তা ছিল একইসঙ্গে উৎসাহব্যঞ্জক ও ভীতিকর। তিনি বলেছিলেন, 'আইএমএফ-এর প্রতিটি কর্মকর্তা যে-রকম স্বপ্ন দেখে, এটি হলো সে-রকমই এক পরিকল্পনা। কিন্তু যদি এটি কাজ না করে, তা হলে সৌভাগ্যজনক ব্যাপার হলো আমার জন্যে আছে কূটনৈতিক বর, বিমানে চড়ে পালিয়ে চলে যেতে পারব আমি।'

এ-পরিকল্পনা নিজেদের কাছেই এত ভয়াবহ মনে হয়েছিল যে ওই টিমের সবচেয়ে তরুণ সদস্য ফারনান্দো প্রাদো বলেছিলেন, 'তারা (জনগণ) আমাদের মেরে ফেলবে।' আর পরিকল্পনার মূল লেখক ও বলিভিয়ার পরিকল্পনামন্ত্রী বেদ্রেগাল তখন বলেছিলেন, 'আমাদের হতে হবে হিরোশিমার পাইলটের মতো। যখন সে পারমাণবিক বোমা ফেলছিল তখনও সে জানতো না কী সে করতে চলেছে, কিন্তু ধোঁয়া উড়তে দেখে সে বলেছিল, ওওপস...স্যরি! এবং ঠিক এমনটাই আমাদের করতে হবে, পরিকল্পনাটা শুরু করতে হবে এবং তারপর বলতে হবে: এহ্...স্যরি।'

এইভাবে পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো। মাত্র পাঁচটি অনুলিপি করা হলো পরিকল্পনার। একটি কপি রাষ্ট্রপতি পাস-এর জন্যে, একটি কপি তাঁর উপদেষ্টা গনির জন্যে, একটি কপি ট্রেজারি মন্ত্রীর জন্যে। বাদবাকি দুটি কপি কাদের জন্যে করা হয়েছিল তা জানতে পারলেই আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে, কথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পাস সেদিন তাঁর অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে আসলে নির্ভর করছিলেন কাদের ওপর : বাকি দুটো কপির একটি তৈরি করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর প্রধানের জন্যে আর আরেকটি তৈরি করা হয়েছিল পুলিশপ্রধানের জন্যে।

তিন সপ্তাহ পর বলিভিয়ার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক বসল। সেখানে ৬০ পৃষ্ঠার পরিকল্পনাটি পড়ে শোনানো হলো। এসময় পাস তাঁর মন্ত্রিদের উদ্দেশ্যে বললেন, এটি তাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে শুধুমাত্র জানানোর জন্যে, বিতর্কের জন্যে নয়। তাদের এ পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনও আপত্তি থাকলে তারা পদত্যাগ করতে পারেন। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখালেন শিল্পমন্ত্রী। বললেন, আমি একমত নই।

তা হলে আপনি আসুন।- পাস বললেন তাঁকে। কিন্তু শিল্পমন্ত্রী উঠলেন না, গেলেন না। এবং তারপর সবাই চুপ মেরে গেলেন। কেউই আর কিছু বললেন না, পদত্যাগও করলেন না। কিছুদিন পর সাশ বলিভিয়ায় এসে পাস-এর উপদেষ্টা হিসেবে মোটামুটি স্থায়ীভাবে খুঁটি গেঁড়ে বসলেন। পণ্যমূল্যবৃদ্ধির ঘোরতর সমর্থক হলেও কর্মজীবীদের বেতনবৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী হিসেবে তিনি সক্রিয়তা দেখাতে লাগলেন।

দুই বছরের মধ্যে বলিভিয়ার মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশে নেমে এলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পরিস্থিতির উন্নতি হলো। প্রকৃত মজুরি বরং আরও ৪০ শতাংশ কমে গেল। ১৯৮৫ সালে শক থেরাপী শুরু হওয়ার বছরে বলিভিয়ার মানুষের মাথা পিছু আয় ছিল ৮৪৫ ডলারে। আর দু বছর পরে তা নেমে দাঁড়ালো ৭৮৯ ডলারে। ১৯৮৭ সালে বলিভিয়ার একজন কৃষকের গড় বার্ষিক আয় নেমে এলো বছরে মাত্র ১৪০ ডলারে, যা সেখানকার মাথাপিছু গড় আয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশেরও কম!

কিন্তু এসবে কোনও কিছুই এলো-গেলো না। কেননা বলিভিয়ার সাধারণ মানুষ অনাহারে মারা যাক, কাজ না পেয়ে ভিক্ষা করুক, বাড়িঘর বিক্রি করে তাবুতে বাস করুক, তাদের মেয়েরা বেশ্যা হয়ে যাক,– তাতে কিইবা আসে যায়? মুদ্রাস্ফীতি তো কমেছে! সাশ-এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তো এটিই ছিল! সাপের কামড়ে মানুষ মারা গেছে, তাতে কি হয়েছে? চোখ তো বেঁচে গেছে!

দুই.

জেফ্রী সাশ আর বলিভিয়ার এই সত্যিকারের কাহিনী কেন আবারও মনে করলাম?

কারণ এই জেফ্রী সাশ আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। গত ০৫ মে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সামনে বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট সমাধানের রূপরেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'যদি আমরা শুধুমাত্র জরুরি খাদ্যসাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি তা হলে এ সমস্যার সমাধান করতে পারব না।' কী করতে হবে তা হলে? না, জরুরি সাহায্য দেয়া

চলবে না। তার বদলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গরিব কৃষকদের কাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে। এবং এভাবেই সমস্যা সমাধানের একটি দীর্ঘমেয়াদী পথ তৈরি হবে। তিনি তাই বলেছেন, 'ব্যয়বহুল খাদ্যসামগ্রী জাহাজীকরণ করার বদলে আমাদের বরং উচিত গরিবদের মধ্যেকার গরিবতরদের আরও বেশি-বেশি খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করা।'

জেফ্রী সাশ আর বলিভিয়ার এই সত্যিকারের ঘটনা মনে করার আরও একটি কারণ : আর মাত্র দু'এক বছরের মধ্যে সেনাবাহিনীর পাহারায় বাংলাদেশের রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদরা আমাদের প্রিয় দেশটিতে বলিভিয়ার মতোই ভয়ঙ্কর সব পরিণতি ডেকে আনার পরিকল্পনা ফেঁদেছেন। সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক অবধি মার্কিন অর্থনীতিবিদরা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে যে শক থেরাপী পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন, একবিংশ শতাব্দীতে সেই ব্যর্থ মডেলটি বাংলাদেশে প্রয়োগ করে মূলত ঠাণ্ডা মাথায় লাখ লাখ মানুষকে অনাহারে ও বিনা কাজে মারার হিংস্র খেলায় মেতে উঠেছেন তাঁরা।

তিন.

২০০৬ সালের জানুয়ারিতে সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দুর্নীতিতে আক্রান্ত রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার নামে প্রকাশ্যে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হয়, নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়; কিন্তু সংগোপনে শুরু হয় বাজার পুনর্গঠনের কাজ। আর তার মাশুল দিতে হয় সাধারণ জনগণকে। হু হু করে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের কর্পোরেটপন্থী মিডিয়াগুলো এখনও ছবক দিয়ে চলেছে, চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বাড়ার পেছনে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনও হাত নেই। কারণ, এসব মিডিয়াগুলোর প্রচারণার ভাষায় বলতে গেলে, 'আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলোতে জৈবজ্বালানি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে চীন ও ভারতের মতো জনবহুল দেশের খাদ্যবাজার। খাদ্যমূল্য বাড়ছে এসব কারণে।' শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে তারা আরও একটি সত্য জনমনে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে : 'আগামী এক বছরের মধ্যে খাদ্যমূল্য কমার কোনও সম্ভাবনাই নেই এবং সস্তা খাবারের যুগ শেষ।'

আপাতদৃষ্টিতে এসব সত্যই বটে। সত্য শস্য-তালিকা ক্রমাগত কমে আসছে, এশিয়ায় পশুজাত সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ছে, বাড়ছে পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যা, বৈশ্বিক তাপমাত্রা, জৈবজ্বালানির চাহিদা, দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা, বাণিজ্যিক ফটকাবাজী, কমছে ডলারের দাম, প্রতিনিয়ত ওঠানামা করছে অশোধিত তেলের বাজারমূল্য, বিরূপ ভূমিকা রাখছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নীতিসমূহ, আমদানি প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি সব কিছু। এসবের প্রতিটিই কোনও না কোনওভাবে পণ্যমূল্য বাড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

তারপরও দেখা যাচ্ছে, এ-সব সত্যের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। যেমন, জনবহুলতার হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম বড় বাজার ভারত ও চীনে। কর্পোরেট গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এ দুটি দেশের মানুষদের ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে, বিশেষত মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মাধ্যমে। অথচ মানুষের ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যাওয়াটা কোনও নতুন প্রবণতা নয়, দশকের পর দশক ধরে দেশকাল নির্বিশেষে এ প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এটি পুরোপুরি অস্বাভাবিক যে, ২০ থেকে ৩০ বছরের একটি স্থিতিশীল ও ধারাবাহিক বৃদ্ধিহারের বিপরীতে দু'এক বছরের ব্যবধানে খাদ্যমূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে। উদাহরণত, ভারতে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৩এর মধ্যে ব্যক্তিপ্রতি ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে ১৫৩ ক্যালরি, তার মানে বছরপ্রতি ১২ ক্যালরির মতো; চীনে সেখানে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে ২৩১ ক্যালরি, অর্থাৎ বছরপ্রতি ১৮ ক্যালরি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে ৩১০ ক্যালরি। অর্থাৎ ক্যালরি গ্রহণের তারতম্য দিয়েই যদি পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণ দাঁড় করানো হয়, সে-ক্ষেত্রে দায়ী করতে হয় যুক্তরাষ্ট্রকেই। আবার শস্য-তালিকা ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এলেও গেল বছর ফসল উৎপাদন অনেক বেড়েছে। আমাদের শোনানো হচ্ছে খাদ্য আর এনার্জি, এ দু'য়ের উত্তরোত্তর চাহিদা বাড়ার কথা আর সরবরাহে অনিয়মের কথা; কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় খরা হলেও, চীনে বরফপাত ও তুষারঝড় বয়ে গেলেও এবং মার্কিনী ব্রেডবাস্কেটে ঠাণ্ডা ও আর্দ্র শীত নেমে এলেও খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। ইউএন খাদ্য ও কৃষি সংগঠন আমাদের তথ্য দিচ্ছে যে, বার্ষিক বৈশ্বিক শস্য উৎপাদন ৯২ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে গিয়ে ২০০৭-২০০৮ সালে ২.১০২ বিলিয়ন টনে ঠেকেছে। তবে এই বৃদ্ধির প্রায় সবটাই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে। আর যুক্তরাষ্ট্র সে-শস্য জৈবজ্বালানি শিল্পে যোগান দেয়ার তথ্য দেখাচ্ছে। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু উদ্ঘাটন করা সত্যিই কঠিন যে সুপরিকল্পিত ফাটকাবাজী কীভাবে ঘটেছে। রাজ প্যাটেলের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর পশুদের খাওয়ানো হয়েছে ৭৪০ মিলিয়ন টন খাদ্য, যা দিয়ে বর্তমান সময়ের খাদ্যঘাটতিকে কমপক্ষে ১৪ বার ঠেকানো যেত। মূল্য বেড়ে যাওয়ার জন্যে জৈবজ্বালানি শিল্পবাদীরা আবার আগ্রহী চীনকে দোষারোপ করতে। গত এপ্রিল ২০০৮-এ তাদের পত্রিকা

বায়োফুয়েল ডাইজেস্টস-এ একটি সমীক্ষা ছাপা হয়েছে এই শিরোনামে : 'বৈশ্বিক শস্যঘাটতির কারণ চীনের মাংসব্যবহার।' অথচ ওই সমীক্ষাতেই দেখানো হয়েছে, ২০০০ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে চীনের মাথাপিছু মাংসচাহিদা বেড়েছে মাত্র সাত পাউন্ডেরও কম। একইভাবে এনার্জি চাহিদা বৃদ্ধির জন্যে তথা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যেও চীন ও ভারতকে দায়ী করার চেষ্টা চলছে। চীন ও ভারত প্রতিদিন প্রায় ১০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট ব্যবহার করে। অথচ এই পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত পরিমাণ ২০.৬ মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের অর্ধেকেরও কম। চীন ও ভারতের মিলিত জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৮ গুণ বেশি হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত পরিমাণের অর্ধেক পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট ব্যবহার করেও অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে তাদের!

কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবেই যদি বলতে হয়, তা হলে বলতে হয়, যেমনটি বলেছেন এ কে গুপ্ত, বলেছেন 'যদি কেউ প্রধান অপরাধীই হয়ে থাকে, তা হলে সেটি হচ্ছে বাজার।' তিনি বিশেষণ করেছেন বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক বাজারের প্রকৃতি,– যা পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ। বাজারের মাধ্যমেই চলছে বাণিজ্যিক ফটকাবাজী, বাজারের কারণেই ঘটছে ডলারের মূল্যপতন, আবার ডলারের মূল্যপতনের কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তেলের বাজার; পশ্চিমা জগতের কৃষিভর্তুকিতে উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী গরিব দেশগুলোতে বাজারজাত করার মাধ্যমে বাধ্য করা হচ্ছে এসব দেশের কৃষিক্ষেত্রকে 'উদার' হতে, কিন্তু এই উদারতা বরং মৃত্যু ঘটাচ্ছে স্থানীয় কৃষিবাজারের, এর দখল চলে যাচ্ছে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হাতে। আর এইসব কারণকে একসূত্রে বেঁধেছে 'রাজনীতি'। কেননা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হয় অনিয়ন্ত্রিত ফাটকাবাজি হবে কি না, পণ্যবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কমবে কি না; রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই বলে দেয় ঘাটতি বাড়িয়ে এবং সুদের হার কর্তন করে ডলারকে অবমূল্যায়িত করা হবে কি না এবং গরিব দেশগুলোকে তাদের কৃষিক্ষেত্রের ওপর থেকে সহায়তা কমিয়ে আনার জন্যে বাধ্য করা হবে কি না। এটিও তাই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত,– খাদ্যকে একটি মৌলিক অধিকার ধরে গরিবদের সেখানে প্রবেশাধিকার দেয়ার বদলে বাজার থেকে কিনতে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ প্রচলিত দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রচারিত জনপ্রিয় সত্যের আড়ালে রয়েছে অন্যতর আরও এক নির্মম সত্য, আর তা হলো কর্পোরেটবাদীদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থেকেই বাড়ছে বাজারে পণ্যের মূল্য। রাষ্ট্রকাঠামো, সরকার, রাজনীতিক এবং অর্থনীতিবিদরা যে এরকম অর্থনৈতিক ফাটকাবাজী চালিয়ে যাওয়াকে অনুমোদন করছেন, সেটি রীতিমতো অপরাধ। রাজ প্যাটেল তা বলেছেন, কিন্তু তিনি যদি নাও বলতেন, তবুও তা নিঃসন্দেহে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবেই দেখা হতো। সময় নিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডামাথায় চিন্তাভাবনা করে এ-পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ-পরিকল্পনার গোপন ও শান্ত অংশীদার। এমনকি বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যে সরকার আসবে তাকেও এ-পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে। না হলে সে-সরকারকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে অথবা যারা এ-পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন বা করবেন সে-রকম কোনও রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতাতেও আসতে দেয়া হবে না। বরং যারা এ-পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করবেন, বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবেন, তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীটিকেই আগামীতে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসা হবে।

চার.

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কর্পোরেটবাদীদের চোখ পড়েছে এশিয়ার কৃষিবাজারের দিকে। আর খাদ্যবাজারে অস্থিরতা দেখা দেয়ার অন্যতম কারণ এটাই। তারা চান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারকে নতুনভাবে বিন্যাস করতে। চান কৃষিপণ্যের বাজারকে কর্পোরেটবাদীদের উপযোগী করে তুলতে।

তবে কোনও কোনও দেশকে তো গিনিপিগ হতে হবে। বাংলাদেশ হলো সেই গিনিপিগ, কর্পোরেটবাদীদের কর্পোরেটতন্ত্র পরীক্ষানিরীক্ষার এশিয় গবেষণাগার। কারণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক শাসন প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি, সংগঠিত বামআন্দোলন গড়ে না উঠলেও বুর্জোয়া রাজনীতি প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল আর পুঁজিবাজারও সুগঠিত নয়। তা ছাড়া এখানে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহও বিকশিত হয়নি যথাযথভাবে। বাজারব্যবস্থাও খুবই দুর্বল। অথচ অন্যদিকে বাংলাদেশের মাটি এতই উর্বর আর কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই এখানকার কৃষি উৎপাদন এত সন্তোষজনক যে এরকম সোনার খনি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার মতো বোকামী আর হতে পারে না। আর চীন ও ভারতের জনবহুল বাজারের দিকে তাকিয়ে লোভাতুর হওয়া যায়, কিন্তু তাদের তো গিনিপিগ বানানো সম্ভব নয়।

অবশ্য, এশিয়ায় না হলেও, বিশ্বব্যাপী কৃষিবাণিজ্য অনেক আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে কর্পোরেটবাদীরা। ১০টি মুখচেনা বহুজাতিক কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বের চালগমসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনের বীজবাজারের ৫১ শতাংশ। এ ১০টি কোম্পানীর সমগ্র ব্যবসার ৭০ শতাংশ আবার নিয়ন্ত্রণ করছে তাদেরই চারটি কোম্পানী। এদের নাম মোটামুটি সবারই জানা। এরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের মনসানতো ও দুপন্ট, সুইজারল্যান্ডের সিনজেনটা এবং ফ্রান্সের গ্রুপে লিমাগারিন। অনেকেই জানেন, বাংলাদেশের মহান নোবেল শান্তিবাজ ড. মুহম্মদ ইউনূসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মনসানতো কোম্পানির সঙ্গে।

পৃথিবীজুড়ে খাদ্যসামগ্রীর খুচরা বাজারের এক-চতুর্থাংশ এখন নিয়ন্ত্রণ করছে শীর্ষ ১০টি খাদ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। এই ১০টি কোম্পানীর সমগ্র বাজারের ৬৫ শতাংশ রয়েছে আবার আমেরিকার ওয়ালমার্ট, ফ্রান্সের কোরেফুর, জার্মানীর মেট্রো এজি এবং নেদারল্যান্ডসের আহোলন্ড-এর নিয়ন্ত্রণে।

উন্নত দেশগুলি কৃষিভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষিখাতকে শক্তিশালী করে রেখেছে। আবার কৃষিপণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এসব দেশেরই হাতেগোণা বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলো। এসব বাণিজ্যিক বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণেই উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় তুঙ্গে উঠেছে। কেননা এসব বহুজাতিক বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোই মূলত কৃষিবাণিজ্যে বৈষম্যমূলক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধির সুবিধা নিচ্ছে। আর উন্নত দেশগুলোর কৃষিভর্তুকির সুবিধাগুলোও সেখানকার কৃষকদের বদলে মূলত লুটে নিচ্ছে এসব কোম্পানীগুলো।

এই কোম্পানিগুলো এখন চাইছে বিশ্বের যেসব দেশের কৃষিবাজার তাদের তত্ত্বউপযোগী নয়, সেসব দেশের কৃষিবাজারকে তেমনটি করে তোলার।

এপ্রিল ২০০৮-এর মধ্যেই এ বিষয়টি কারও কারও চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে একে ভয়ংকর সব খবর আসতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টে ২৬ এপ্রিল ২০০৮-এ খবর বের হলো, চাল, গম, আটাসহ খাদ্যশস্যের দাম হু হু করে বাড়ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশ, ক্যামেরুন, ফিলিপাইনসহ বেশকিছু দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সেখানে দেখা দিচ্ছে সহিংসতা। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি যোয়েলিক বললেন, খাদ্য সংকটের কারণে বিশ্বের আরও ৩০টি দেশে অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে। আর হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা বললেন বিশেষভাবে বাংলাদেশের কথা। বললেন, বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলির মানুষের খাবার কেনার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এইভাবে বাংলাদেশ আলোচনার পাদপ্রদীপে চলে এলো।

যদিও ম্যানিলাভিত্তিক গবেষণাসংস্থা ইরির পক্ষ থেকে বলা হলো, এই সংকট মানবসৃষ্ট, কিন্তু কেউই সে কথা গায়ে মাখলেন না। বলা হতে লাগল, জৈবজ্বালানি উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় এই সংকট সৃষ্টি দেখা দিয়েছে। বলা হতে লাগল, এই সংকটের কারণ ভারত ও চীনের খাদ্যবাজার বেড়ে গেছে।

কিন্তু শক থেরাপী বাজারকৌশলের প্রধান শর্তই হলো, লোহা গরম থাকতে থাকতেই ছ্যাঁকা দিতে হবে। অতএব খুব দ্রুতই সুগঠিত প্রস্তাব এলো ২০০৬ সালে মিল্টন ফ্রিডম্যানের মৃত্যুর পর মুক্ত বাজারের নব্য পথিকৃৎ মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফ্রী সাশের পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, জরুরি সাহায্য দেয়ার কোনও মানে নেই। এখন প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার। এ রকম একটি প্রস্তাব যে আসবে সেটি অবশ্য অনুমান করা যাচ্ছিলো। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, খাদ্যসংকটগ্রস্থ আফ্রিকার দেশগুলিকে তারা সহায়তা করবেন, তবে আগের মতো করে নয়। এবার আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের জাহাজে করে খাদ্যসাহায্য পাঠাবেন না তারা। বরং আফ্রিকার যেসব দেশ খাদ্য উৎপাদন করে, সেসব দেশ যদি খাদ্য বিক্রি করে তা হলে সেই খাদ্য কেনার টাকা দিয়ে সহায়তা করবেন মাত্র।

আপাতদৃষ্টিতে জেফ্রী সাশের কথাবার্তা ও নীতিপ্রণালী খুবই নিরীহ। কিন্তু আসলে তা তত নিরীহ নয়। কেননা কাঠামোগত সহায়তা দেবে কর্পোরেটবাদীরা; আর তাদের কাছে চিরদিনের মতো বাঁধা পড়ে যাবে আমাদের মতো দেশগুলোর স্থানীয় কৃষি বাজার। এ পরামর্শের আরেকটি লক্ষ্য, জৈবজ্বালানীর উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া। উলেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত বসন্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে তারা পরিবহন ক্ষেত্রে জৈবজ্বালানির পরিমাণ ১০ শতাংশে উন্নীত করবে, যা আগামী ২০১০ সালের মধ্যে ৫.৭৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা আরও আগেই নেয়া হয়েছিল। জেফ্রী সাশ-রা এই পরিকল্পনাকে একদম সহ্য করতে পারছেন না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের উন্নয়ন কমিটির সামনে জেফ্রী সাশ বলেছেন, পৃথিবীব্যাপী খাদ্যমূল্যের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা খাদ্য সরবরাহের রুদ্ধপ্রক্রিয়ার কারণে ঘটছে না; এ-অবস্থার জন্ম হয়েছে খাদ্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা থেকে। পৃথিবীতে খাদ্যের এই সরবরাহ ও চাহিদাসংকটের কারণ, সাশ-এর মতে, দরিদ্র অঞ্চলগুলিতে খাদ্যউৎপাদন 'যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম।' অতএব এইসব দেশে এমন কাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে, যাতে তারা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পারে।

সাশ এখানেই থামেননি। তিনি তাঁর সাফল্যের উদাহরণও তুলে ধরেছেন। বলেছেন, পৃথিবীর একটি গরিব রাষ্ট্র মালোয়ি (Malawi)তে এ ধরনের কাঠামোগত সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং গত তিন বছর ধরে সেখানে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির মতিগতি বোঝা বড় দায় হয়ে পড়েছে। অতএব অর্থায়ন করতে হবে মূলত এমন ধরণের বীজ উদ্ভাবনী গবেষণার ক্ষেত্রে, যে ধরনের বীজ খরা ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ কাঠামোগত সহায়তার নামে যা-যা করা হবে তার সব সুফলই ভোগ করবে কর্পোরেট সংস্থাগুলো।

আর মালোয়ির অবস্থা? আপাতত শুধু এটুকুই বলা যায়, মালোয়িতে শস্য উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে দরিদ্র কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে!

পাঁচ.

খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের কর্পোরেটবাদী মিডিয়াগুলো ব্যাপারটির অপরিহার্যতা ও অনিবার্য ভয়াবহতা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করতে লাগলেন। কিছু দৈনিকের কর্পোরেট-কলামিস্টরা এ ব্যাপারে তাদের কলমের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন (হয়তো তাদের অনেকের আন্তরিকতাও আছে, হয়তো তারা বলিভিয়ার ঘটনা জানেন না ভালো করে। কিন্তু এরা এত কিছু জানেন আর শক থেরাপীর কথা জানেন না, এটা কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?) অনেকে বলে থাকেন, উপদেষ্টা পরিষদের কেউ আসলে ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি। কিন্তু না, তারা ব্যাপারটি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। অর্থনীতির ছাত্র ফখরুদ্দিন আহমদ, এবি মীর্জ্জা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম আর হোসেন জিলুর রহমানদের যদি আমরা অবোধ ও নির্বোধ মনে করি, তা হলে তা হবে এ জগতের চিরকালীন সেরা কৌতূক। বরং পরিস্থিতি যাতে ভালোমতো তালগোল পাকায় সে জন্যেই সরকারের নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশের খাদ্যমজুত কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারত থেকে চাল আমদানির ব্যাপারে সঠিক সময়ে পুরোপুরি নিস্পৃহ ছিলেন এবং শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যে-চাল এসেছিল পাকিস্তান থেকে তা ভালো হওয়ার পরও খারাপ বলে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়েছিল।

এসব কিছুরই তত্ত্বাবধান করছেন আমাদের দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত, ঝানু ও দক্ষ অর্থনীতিবিদরা। আর তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী। এখন যে আবার মাটির নিচ থেকে চাল তুলে আনা হচ্ছে তারও হয়তো কারণ আছে। হয়তো চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কর্পোরেটবাদীদের।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, মধ্যনব্বইতে বলিভিয়াতে যে শক থেরাপী বাজার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারই খেলা চলছে বর্তমানে বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের পর এখানে রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমানদের মতো অর্থনীতিবিদরা যে-ধরনের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্ভাবনা এখন একেবারেই সুদূরপরাহত। যদিও ফখরুদ্দিন আহমদ, হোসেন জিলুর রহমানরা উপদেষ্টা বনে যাওয়ার পর গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন, রেহমান সোবহানকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পদক ২০০৮ দিয়েছেন, কিন্তু তা আসলে নেহাৎই কৃতজ্ঞতাবশত,– কেননা এদের কেউই আর রেহমান সোবহানের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেন না। সাশ যেমন কেইন্সের ভক্ত হওয়ার পরও কেইন্সকে পায়ে দলে এগিয়ে গেছেন, এরাও তেমনি রেহমান সোবহানের ছাত্র হওয়ার পরও রেহমান সোবহানের ধারণাগুলো অগ্রাহ্য করে চলেছেন। এখনও আমাদের সংবিধান বলছে, পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুযায়ী দেশ চালানোর কথা (বোধহয় সংবিধানসংশোধনকারী রাজনৈতিক সরকারগুলো এ ব্যাপারটিকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন নি), কিন্তু সরকার বলছে বাজার মৌলবাদের কথা, মুক্ত বাজারের কথা।

এবং তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর থেকেই আমরা দেখছি, মধ্যনব্বইতে বলিভিয়ায় যে ব্যর্থ বাজারকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, বাংলাদেশেও সেই বাজার কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। জাতীয়করণকৃত পাটশিল্পগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন নতুন করে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে সেগুলি ব্যক্তিমালিকানায় পুনরায় চালু করার। দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হয়েছে অব্যাহতগতিতে,– যদিও কর্পোরেটপন্থী মিডিয়াগুলি বারবার জনঅসন্তোষ স্তিমিত করার জন্যে অদ্ভূত সব প্রতিবেদন প্রচার করেছেন, কখনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলোকে দোষারোপ করেছেন, কখনো উপদেষ্টাদের অজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাবের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু সবসময়েই আড়ালে রেখেছেন এ দেশীয় শক থেরাপীর প্রণেতা অর্থনীতিবিদদের। জ্বালানিতেলের মূল্য বাড়ানো হয়েছিল গত এপ্রিল ২০০৭-এ আর সবশেষে সিএনজি'র মূল্য একলাফে দ্বিগুণ করা হয়েছে এপ্রিল ২০০৮-এ। ১০ এপ্রিল ২০০৮-এ অর্থ উপদেষ্টা এবি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম বিদেশ থেকে ফিরেই ঘোষণা দিয়েছেন, আবারও তিনি বাড়াবেন জ্বালানিতেলের দাম। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যমূল্য হু হু করে বেড়েছে আরেক দফা। এসবই শক থেরাপী। আপনি তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবেন, কিন্তু বুঝতেও পারবেন না এটি আসলে যন্ত্রণা কি না; এবং তারপর হঠাৎ নিথর হয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। একটু পর জেগে উঠবেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কী হচ্ছে বোঝার আগে আবারও তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে বোধহীন হয়ে পড়বেন।

কর্পোরেটবাদীরা ভালো করেই জানেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল খাত কৃষি এবং সেটিকেই তাদের টার্গেট করা দরকার। দেশের খাদ্য ঘাটতি মেটানোর নামে আগে থেকেই এখানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বা চুক্তিভিত্তিক কৃষি শুরু হয়েছিল। এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এটিকে আরও উৎসাহিত করার। আগামী ২০০৮-০৯ সালের বাজেটে চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। এই সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে কর অবকাশ সুবিধা, কমসুদে ব্যাংক ঋণসহ বীমা সুবিধা দেয়া ইত্যাদি। যেসব সুবিধা তারা কৃষককে দিতে নারাজ সেইসব সুবিধা ফার্মিং কোম্পানিকে দিতে সরকারের কোনও কুণ্ঠা নেই। যেমন, কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ছে। তবে এমন

কৌশল খাটানো হচ্ছে, যার ফলে কৃষি ভর্তুকি পাবে মূলত কন্ট্রাক ফার্মগুলি। কৃষকরা ভর্তুকি পাক বা না-পাক কিছু আসে যায় না, কিন্তু এসব ফার্মকে ভর্তুকি দিতেই হবে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর পরিকল্পনা নিয়ে যারা এগিয়ে আসছে, সেসব ফার্মিং কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বহুল আলোচিত ব্রাক। রয়েছে সুপ্রিম সীড। রয়েছে আগোরা। রয়েছে মীনাবাজার। আরও রয়েছে এনসিসি ব্যাংক ও বোম্বে সুইটস অ্যান্ড চানাচুর। এদের মধ্যে ব্রাক বীজের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করছে এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্রাকের কৃষিচিন্তা নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে। কিন্তু সরকারের কাছে এসব প্রশ্ন মোটেও বড় নয়। বড় হলো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর মধ্যে দিয়ে সাশ-কথিত কাঠামোগত সহায়তা দেয়ার পথটি প্রশস্ত করা। কৃষক স্বাধীন থাকবে কি না তা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার হলো কৃষককে নতুন করে দাস বানানো। মানুষ মারা যাবে নাকি বেঁচে থাকবে সেটি বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হলো খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো। মানুষের পকেটে টাকা থাকবে কি থাকবে না সেটি চিন্তার ব্যাপার নয়, চিন্তার ব্যাপার হলো মুদ্রাস্ফীতি কমানো।

ছয়.

গত এক বছর ধরে শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশে যে শক থেরাপী প্রয়োগ করে আসছেন, তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সামান্য একটু ধারণা পেতে পারি সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তুলে ধরা কিছু তথ্য থেকে। এ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বা শক থেরাপী বাজারকৌশল প্রয়োগ করার আগে এখানে ছয় কোটি গরীব মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে হতদরিদ্র ছিল সাড়ে চার কোটি মানুষ। মাত্র এক বছরের মধ্যে এই সরকারের কল্যাণে মধ্যআয়ের শ্রেণীপরিধি সংকুচিত হয়েছে; গরিব মানুষের তালিকায় নেমে এসেছেন সেখান থেকে চার কোটি মানুষ। এখন তাই এখানে গরিব মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি আর এদের মধ্যে হতদরিদ্র মানুষ হলেন ছয় কোটি। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সহসভাপতি সাবেক কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল সৈয়দ ইউসুফের এই গবেষণাপ্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, গত ১৫ মাসে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে ৭৫ শতাংশ। অথচ মানুষের আয় বেড়েছে মাত্র পাঁচ শতাংশ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ৭০ শতাংশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশগুলির অধিবাসীরা নিত্যপণ্য কিনতে ব্যয় করেন তাদের আয়ের আট শতাংশ। আর বাংলাদেশের এই দরিদ্র মানুষজনকে তাদের মোট আয়ের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ব্যয় করতে হয় নিত্যপণ্য কিনতে। এদের প্রকৃত আয় গত একবছরে কমেছে ৪৫ শতাংশ। এই মানুষরা কাপড়চোপড় কিনবে কোত্থেকে? মাথা গোঁজার ঠাঁই তুলবে কোত্থেকে? সন্তানকে স্কুলে পাঠাবে কেমন করে?

তারপরও গার্মেন্টসের শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করে, তখন তার মধ্যে আমরা বিদেশীদের চক্রান্ত দেখি। সাধারণ মানুষ যখন ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়েছে দেখে আশায় বুক বাধে আর ছাত্রদের সঙ্গে মিছিলে শামিল হয় তখন আমরা তাতে সরকারকে অস্থিতিশীল করার গভীর ষড়যন্ত্র দেখি। মিডিয়ার লোকজনকে দেখি এই সরকারের ওকালতি করে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলাম লিখতে। আমাদের কি কোনও লজ্জাই নেই?

সরকারের একজন উপদেষ্টা বলেছেন, দেশে কোনও দুর্ভিক্ষ নেই, বড় জোর হিডেন হাঙ্গার রয়েছে। তা হিডেন হাঙ্গারই বটে। সরকার তো রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। কী করে এই দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষরা জানাবে তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা? সরকার তো মিডিয়ার ওপর খবরদারি করছেন, স্তাবকদের লেলিয়ে দিয়েছেন শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুণগান গাইতে। কে তুলে ধরবে এই দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষদের ক্ষুধার কথা?

আর কেইবা তুলে ধরবে এই কর্পোরেটবাদীদের নগ্নক্ষুধার নগ্নতা? বলিভিয়ার যে সর্বনাশা শক থেরাপীর কথা লিখেছি, সে সম্পর্কে বলিভিয়ার জনগণ সর্বপ্রথম জানতে পারে আগস্ট ২০০৫ সালে, সেখানকার সাংবাদিক সুসান ভেলাসকো পোরটিলো অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে গনির অর্থনৈতিক টিমের সদস্যদের সাক্ষাৎকার আদায় করে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দাঁড় করানোর পর। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এখানকার বড় বড় মিডিয়াভবনগুলি কর্পোরেটপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে; এখানকার নামকরা কলামিস্টরা আসলে কর্পোরেট-কলামিস্ট। তারা অনেক কড়া কথা লিখতে পারেন, কিন্তু সেই কথা কথার কড়া কলাম কখন ছাপা হবে তা নির্ভর করে কর্পোরেটচক্রের ওপরে।

সুসানের মতো একজন সাংবাদিকের দেখা আমরা কতদিনে পাব! তার প্রতিবেদনটি ছাপানোর মতো একটি পত্রিকা আমরা কতদিনে পাব? কতদিন পর কত অনাহার ও মৃত্যুর বিনিময়ে, কত গৃহহীনতা ও অধিকারহীনতার বিনিময়ে আমরা মেটাতে পারব কর্পোরেটবাদীদের এই নগ্নক্ষুধা!?

তথ্যসূত্র :

এ কে গুপ্ত : মার্কেট ম্যাডনেস, জি ম্যাগাজিন, জুন ২০০৮ সংখ্যা।
নাওমি ক্লেইন : দ্য শক ডকট্রিন, অ্যালেন লেন, ইংল্যান্ড ২০০৭।

রাজ প্যাটেল : স্টাফড অ্যান্ড স্টার্ভড : দ্য হিডেন ব্যাটল ফর দি ওয়ার্ল্ড ফুড সিস্টেইম, ২০০৮ ।

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫/ ১৭ মে ২০০৮ । প্রকাশ : ইউকে বেঙ্গলি ডট কম, ২৪ মে ২০০৮ ।

শান্ত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস : পূর্বপাঠ

বকুল বৃক্ষদের এইভাবে খুন করা হবে, সব গীতিকার পাখিদের
এইভাবে গলা, ডানা, স্বরলিপি শব্দের পালকগুলি
ভেঙে দেয়া হবে আমি জানতাম
তিতির ও ঈগল গোত্রের সব শিশুদের এইভাবে ভিক্ষুক পাগল
আর উন্মাদ বানানো হবে

ভারতীয় যুদ্ধের উৎসবে আজ এই শুধু আমাদের
ধনুক ব্যবসা
আমি জানতাম, হে অর্জুন – আমি ঠিকই জানতাম ।
– আবুল হাসান : কুরুক্ষেত্রে আলাপ

'...সব ধ্বংস না হয়ে গেলে কাউকে কিছু বোঝান যায় না ।'
এ এক দৈববাণী; আর তা বেরিয়ে এসেছিল তাজউদ্দীন আহমদের হৃদয়ের গহীন থেকে । মন্ত্রিপরিষদ থেকে, কঠিন সত্য বলতে গেলে, তিনি তখন বহিষ্কৃত । অপাংক্তেয় দলের কাছে, শেখ মুজিবের কাছে । এরকম এক সময়ে ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যাঁরা বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদেরই একজন খান সারওয়ার মুরশিদের সামনে তাজউদ্দীন উচ্চারণ করেছিলেন এই দৈববাণী ।
বাংলাদেশের অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে অবশিষ্টাংশও নষ্ট হয়ে যেতে দেখছি আমরা এখন । একটি যুদ্ধ আমাদের নৈতিকভাবে যতটা না বিকল করতে পেরেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বিকল করেছে গত ৩৫ বছরের রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা । আর এই অস্থিরতার মধ্যেও গত পাঁচ বছর হলো খোঁড়া, পচা-গলা এবং কমপক্ষে ১৪বার ধর্ষিত হওয়া একটি সংবিধানকে আঁকড়ে ধরে অনেকে দারুণ 'আলোকিত', অনেকে বেশ 'পজিটিভ', অনেকে খুবই 'আশাবাদী' হয়ে উঠেছেন । এই 'আলোকিত', 'পজিটিভ' ও 'আশাবাদী'দের দলে রয়েছেন ষাটের দশকের চিহ্নিত নষ্ট তরুণরা,– যারা এখন নষ্ট রাষ্ট্রের, নষ্ট প্রতিষ্ঠানের, নষ্ট সব পরিকল্পনার মুখ্য উদ্যোগী; তাদের সঙ্গে পা মেলাচ্ছেন আশি ও নব্বইয়ের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গঁজিয়ে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিকতার মোহাচ্ছন্ন

চৌকস তরুণরা। প্রতিষ্ঠা চায় তারা, সফলতা চায় তারা এবং নির্মাণের নামে পরিচালিত কোনও ধ্বংসলীলাই তাদের চোখে পড়ে না।
কেননা, তাজউদ্দীনের কথাই অমোঘ সত্য, সব ধ্বংস না হয়ে গেলে কাউকে কিছু বোঝান যায় না।

এই ডিসেম্বরেরই (২০০৬) প্রথম দিকে আমাদের দেশে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জন গ্যাস্টরাইট। বার্তা সংস্থা ইউএনবি তার কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, বাংলাদেশের ২০০৬ সালের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন। জন গ্যাস্টরাইট এর উত্তর দিয়েছেন বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায়, সেই ইঙ্গিতের তলদেশে লুকিয়ে থাকা সত্য বের করে আনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসপড়ুয়া কারও পক্ষেই তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। কেননা গ্যাস্টরাইট ইউএনবি'র ওই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'এখানে অনেক কারণই আছে যার জন্যে বাংলাদেশ আর জর্জ হ্যারিসনের ১৯৭১-এর বাংলাদেশ নয়।'
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জন গ্যাস্টরাইটের এ উত্তরের মানে বোঝার জন্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিদ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাঁর এ কথার মানে খুবই সোজা : ১৯৭১-এ যুদ্ধরত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবী কাঁপানো শিল্পী জর্জ হ্যারিসনরা একটি কনসার্ট করেছিলেন, সাঙ্গিতিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে জর্জ হ্যারিসনের ১৯৭১-এর সেই বাংলাদেশকে হত্যা করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নাজুক ও প্রতিকুল রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে লেজ গুটিয়ে সপ্তম নৌবহর নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রকে। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি যদি (রাষ্ট্রটি, জনগণ নয়) জর্জ হ্যারিসনদের দেয়া সেই ভালোবাসাটুকু যদি বুকের মধ্যে সংগোপনে রেখে দিতে পারত তা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যাপারে মাতব্বরি করা। কোনও কিছু করার আগে সাত/পাঁচ অনেক কিছুই ভাবতে হতো তাদের। কিন্তু এখন আর তাদের সাত/পাঁচ চিন্তা করার দরকার নেই। কেননা কেউ মানুক বা না মানুক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিবেচনা অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন প্রকৃতার্থে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটিরই আর একটি রূপ,– রাষ্ট্রের যে-রূপকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ১৯৭১-এ। রাষ্ট্রের এই বিকৃত রূপটি নিয়েই আহ্লাদিত আমাদের 'আলোকিত'জনরা; পুলকিত চিত্তে তারা সবখানে বলে বেড়াচ্ছেন, ১৯৯০-এর পর একটি 'গণতান্ত্রিক' আবহের বাতাবরণে এতদিনে না কি বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে সুগঠিত হয়ে উঠছে। কার্যত দেখা যাচ্ছে, সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি একের পর এক সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে, পরিবর্তন করে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশকে একটি সংবিধানসম্মত পাকিস্তানে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। এ কাজটি তারা করেছে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নামে। এবং তা করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হয়েছে ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ বাকশাল নামের একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করায়।
ওই একদলীয় শাসনের এক কুমীরছানা দেখিয়ে আর সব রাজনৈতিক দল পরে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চার নামে বহু হাঙরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, বহু অক্টোপাসের বন্ধনে দেশের মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষ ১৯৫৮ সাল থেকে একটানা আন্দোলন করেছে, ১৯৭৫ সালে সেই সামরিক শাসন জারির মধ্যে দিয়েই না কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এই বহুদলীয় গণতন্ত্র। এই বহুদলীয় গণতন্ত্রের হাঙর এখনও শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে কর্নেল তাহের অবধি সবার হত্যাকাণ্ড বিচারের দাবি জানালে ভয়ে কেঁপে ওঠে, কেঁপে ওঠে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করলে। কি জিয়াউর রহমান, কি সিরাজ শিকদার,– এসব রাজনৈতিক হত্যার বিচার দাবিই তাদের কথার কথা। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় এবং টের পায় না কুমীরের ভয়ে ভীত হয়ে সে ডাঙায় উঠে আসার পর সিংহের মুখগহ্বরে উঠে পড়েছে; বাকশালী তাণ্ডবে ম্রিয়মান বাংলাদেশও গত ৩০ বছরে তাই টের পায় নি, আসলে দেশের কত ক্ষতি হয়েছে, কারা সেই ক্ষতি করেছে, কারা তাদের বুকের মধ্যে থেকে মুছে দিয়েছে জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশকে। এখন তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশের নির্বাচনে নাক গলাতে সাহস পায়, অন্যদিকে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতার অংশীদার হয় একাত্তরের পাকিস্তানি খানসেনাদের সহযোগী জামাত-আলবদর-আলশামস আর রাজাকার।
তবু এই বাংলাদেশকে নিয়ে এখনও আমরা স্বপ্ন দেখি। এই বাংলাদেশকে ভালবাসি। আরও অনেকেই স্বপ্ন দেখে, যেমন দেখেন ড. ইউনূস কিংবা ড. ইয়াজউদ্দীন; তারাও তাদের মতো করে বাংলাদেশকে ভালোবাসে। তবে লেখাই বাহুল্য, ড. ইউনূসের স্বপ্নের বাংলাদেশ আর আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। কেননা একই মহাভারতের পটে স্বপ্ন দুর্যোধনও দেখে, যুধিষ্ঠিরও দেখে; কিন্তু তাদের পথ কখনও এক হয় না।

আমাদের এই স্বপ্নের দেশে ভয়ানক এক সন্ত্রাস চলছে এখন। কিন্তু ব্যাকরণগত দিক থেকে এই সন্ত্রাসের প্রকরণ এত আলাদা যে তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় একেবারেই নতুনভাবে, নতুন এই প্রকরণকে বলা যেতে পারে *শান্ত, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস*। এ দেশের রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে 'নিরপেক্ষ', নীরব ও শান্ত এই সন্ত্রাস। আর সে সন্ত্রাসে কোনও না কোনওভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে প্রধান সব রাজনৈতিক দল। রক্তপাতহীন এ সন্ত্রাস প্রমাণ করেছে একটি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের নষ্টামী কত সীমাহীন হতে পারে এবং একটি রাষ্ট্রের নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীরাও নৈতিকভাবে কত নুব্জ্য হতে পারেন; নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই ন্যুব্জতার কারণেই রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান যা খুশি তাই করতে থাকেন, নাগরিকরা মুখ বুজে তা সহ্য করেন এবং উটপাখির মতো রাজনীতিবিদদের ওপর দোষ চাপিয়ে ডেল কার্নেগী (কেউ কি জানেন, আশাবাদী হওয়ার পরামর্শদাতা এই ডেল কার্নেগীই নাকি শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন?) নির্দেশিত পথে মনের মধ্যে 'আশাবাদ' জাগিয়ে রাখেন এবং সেই 'আশাবাদ' নিয়ে ড. ইউনূসকে অনুসরণ করতে থাকেন।

আবাল্য আমরা জেনে এসেছি, নোবেল পুরস্কার মানুষকে আরও বিনম্র করে। এমনকি হিংস্র কিসিঞ্জার কিংবা বেনিনও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিনম্র আচরণ করেছেন। কিন্তু এই প্রথম আমরা এমন একজন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যিনি পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করলেন উপন্যাসের ডন কুইকজোট বারবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, কখনও উদ্ধত রূপ নিয়ে, কখনও ভাঁড়ামি নিয়ে, কখনও অমায়িক হিংস্রতা নিয়ে। এই ডন কুইকজোটের কল্যাণে জন্ম নিলো আরও অসংখ্য ডন কুইকজোট। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগের বাংলাদেশ আর পরের বাংলাদেশ একেবারে আলাদা, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে,– এইসব কথা বলার মধ্যে দিয়ে ইউনূস যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন, বিস্ময়কর হলেও সত্য, আমাদের দেশের প্রথমসারির কোনও বুদ্ধিজীবীকেই সেটার প্রতিবাদ করতে দেখা যায় নি। এমনকি আহমদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদ কিংবা আহমদ ছফার জন্যে যাদের চোখেমুখে জবাফুল ফোটে তারাও মুখে ইউনূস-কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস তা হলে ইউনূস নির্দেশিত পথে, – নোবেল বিজয়ী ইউনূসপূর্ব পর্ব ও নোবেল বিজয়ী ইউনূসউত্তর পর্ব,– এইভাবে লিখতে হবে? একজন ব্যক্তির নোবেল বিজয় কি একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও গৌরবময়? একজন ব্যক্তির নোবেল বিজয় কি তার দেশের জনগণের বিভিন্ন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেয়েও গৌরবময়? আর বাংলাদেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অফুরান ক্ষমতার কথা কি আমরা বার বার দেখি নি? দেখি নি এই কয়েক বছর আগেও, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের কালে? প্রতিটি প্রবল বন্যার পর কি আমরা দেখি না বাংলাদেশে প্রচণ্ড এক সহমর্মিতার, সহযোগিতার, ঐক্যবদ্ধতার বোধ? এইসব আমাদের কিংবা ড. ইউনূসদের একবারও কি মনে হয়েছে নোবেল পুরস্কারের ধাক্কা খাওয়ার পরে? একবারও কি কারও মনে হয়েছে, ১৯৭১-এ কোন মানুষটির নাম প্রতিটি মানুষের মন ও মুখে একাকার হয়ে ছিল? না, এসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় নি, বরং ড. ইউনূসের মনে হয়েছে এবং তিনি তা আমাদের জানিয়েছেন, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এক মহিলার সঙ্গে বিমানে তাঁর দেখা হয়েছে, সে বলেছে, এবার থেকে সে মাথা উঁচু করে বিদেশে কথা বলতে পারবে। *তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ*-এর সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ নোলকবাবু আর নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের মধ্যে পার্থক্য তা হলে পুরস্কারের টাকার পরিমাণে? আর আমরা একেকজন বাংলাদেশী, বিশেষত প্রবাসী বাংলাদেশীরা কি তা হলে পরিণত হয়েছি ম্যাজিক টুথ পাউডারের সেই মফিজে, যে এবার ড. ইউনূস নামক টুথ পাউডারে দাঁত মেজে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলতে পারবে, *আমার নাম মফিজ, ভাড়া হইছে তিরিশ*?

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ইউনূস চট্টগ্রামে গেলেন ১৫ অক্টোবর এবং ঘোষণা দিলেন, চট্টগ্রাম বন্দর টার্মিনাল উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। কেননা যাদের অঙ্গুলিহেলনে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেই হিলারী ক্লিনটনরা এরকমই চায়; চায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর টার্মিনাল বেসরকারি করে ফেলা হোক।

এইভাবে ইউনূস নিজে যতটুকু, তারও চেয়ে ছোট হতে শুরু করলেন। এ দেশে আলবদর মতিউর রহমান নিজামীরা পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার পর জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলেন, এখনও যে-কেউ মন্ত্রী হওয়ার পর স্মৃতিসৌধে যান, শহীদ মিনারে যান। শহীদ মিনার অধবদিত হয়, তারও বেশি অধবদিত হই রক্তমাংসের আমরা। তবুও আমাদের যা কিছু আনন্দের, যা কিছু বেদনার, যা কিছু প্রতিবাদের সবই সম্মিলিতভাবে ভাগাভাগি করার টানে আমরা কোনও ঘোষণা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে গিয়ে এখনও জড়ো হই শহীদ মিনারের বেদিতে। কিন্তু ড. ইউনূস কাজের মানুষ, তাৎক্ষণিকতা বোধহয় তাঁর ধাতে সয় না। তিনি তাই প্রথম দিনটি শুভেচ্ছা নিতে নিতে কাটিয়ে দিলেন; জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারে গেলেন পরিকল্পিতভাবে পরের দিন, বুকের মধ্যে সামাজিক বাণিজ্যের স্বপ্ন নিয়ে! এবং তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানে জনতা দু হাত না তুললেও নিজে দু হাত তুলে এভারেস্টকে পরাজিত করার চেষ্টা চালালেন, লোকদের হাসানোর জন্যে কাতুকুতুমার্কা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। আর তার স্তাবকরা বলতে লাগল, এসবের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনিও একজন সাধারণ ও সহজ মানুষ। যে মানুষটি যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ইউএসএ প্রতিষ্ঠা করে বিল ক্লিনটনের গোবাল ইনিসিয়েটিভকে এর মধ্যেই ৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছেন এবং ৩০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দেয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে

দেখছেন, যে মানুষটি মোনসান্তোর টার্মিনেটর বীজ বাংলাদেশে আমদানির জন্যে তলে তলে পরিকল্পনা আঁটছেন, এতদিন ভিজে বেড়াল সেজে বসে থাকলেও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ফোনের মালিকানাসংক্রান্ত বিতর্ক করছেন গলা ছেড়ে, সেই মানুষটি কি-না এদের কাছে সাধারণ এবং সহজ! সেই মানুষটিই কী না আমাদের অনুকরণীয়!
এই মানুষটি সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর চট্টগ্রামে দেয়া ভাষণ শুনেই সতর্ক হয়েছিল, আরও সতর্ক হলো যখন তিনি সিউল থেকে ফিরে এসে বিমানবন্দরে নেমেই জানালেন, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীনকে তিনি 'এ-পাস' দিচ্ছেন, কেননা ইয়াজউদ্দীন সঠিক পথেই কাজ করে চলেছেন। রাষ্ট্র-লুণ্ঠনের টাকায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত ডুবে থাকা নষ্ট সন্তানকে রক্ষা করার জন্যে যে-মানুষটি একটি দলের, একটি ভবনের হয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন সেই মানুষটি ড. ইউনূসের মুখে হাসি ফোটালেন, আশার বাণী জাগালেন এবং মুগ্ধ ইউনূস তাঁকে 'এ-পাস' মার্কস দিলেন!
ইউনূসের মুখের সেই হাসি এখনও ম্লান হয় নি, বরং ধামাধরা চতুর্থ রাষ্ট্রসমূহের কল্যাণে প্রতিদিন বিস্তৃত হচ্ছে; এখনও অনেক মানুষ তাঁর সুকীর্তির সঙ্গে পরিচিত নয়, এখনও অনেকেই মনে করেন, ইউনূসের কারণে বিদেশে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে!

আর ইয়াজউদ্দীন, যেন-বা এই নোবেল বিজয়ীর কাছ থেকে 'এ-পাস' পাওয়ার পর আরও শান্ত অথচ ঘোলাটে চোখের হিংস্র মানুষখেকো বাঘ হয়ে উঠলেন। দেশে একটানা তোলপাড় শুরু হলো। মানুষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ অবিচল প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজের দিকে; তাই জনগণের কেউ দেখতে পেল না এক ঠাণ্ডা ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছেন ইয়াজউদ্দীন, তাঁর চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আজিজকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার। অচিরেই আমরা দেখলাম, কোনও কোনও টিভি চ্যানেল নিরপেক্ষভাবে সংবাদপ্রচারের ভড়ং দেখিয়ে রাজপথে শিবির নিধনের দৃশ্য দেখিয়ে চারদলের প্রতি মধ্যবিত্ত শহুরে শিক্ষিত আধাশিক্ষিত নাগরিক ও সাধারণ জনতার সহানুভূতি আদায়ের প্রচেষ্টা চালালো। অথচ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে থেকেই এবং হত্যাযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ১৪ দলের নেতাকর্মী। চারদলবিরোধী যেসব নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন, সরাসরি সম্প্রচার ধারণ করা দূরে থাক, তাদের কারও হত্যার বিবরণ ও প্রতিবেদনও প্রচার করে নি এইসব টিভি চ্যানেল। কেননা তাদের ক্যামেরার লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। ওভার ব্রিজের কাছে শক্ত অবস্থান নিয়ে জামাত-শিবিরের কর্মীরা সেদিন যেভাবে বারবার ধাওয়া দেয়ার জন্যে ছুটে এসেছে, যেভাবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এসেছে তার কোনওটাই সম্প্রচার করে নি এইসব টিভি চ্যানেল।
যারা শিবির নিধনের দৃশ্যাবলী বারবার সম্প্রচার করে জনতার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন তারা কি জানেন না, কীভাবে শিবির বিভিন্ন সময়ে গেস্টাপো স্টাইলে হামলা চালিয়েছে ছাত্রদের হলে, মিছিলে এবং রগ কেটে দিয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটতে কাটতে হত্যার উলাসে মেতে উঠেছে? হ্যাঁ, তারা অবশ্যই জানেন। তারপরও তারা 'শান্তির' অমিয়বাণী শুনিয়েছেন। কেননা তাদের কাছে শান্তির অর্থ, চার দলের কারও গায়ে এমনকি একটি চুলও যেন অহেতুক ঝরে না পড়ে।
শিবির নিধনের ওই কৌশল নিঃসন্দেহে যৌক্তিক নয়। কিন্তু রাজপথে কেন ও কীভাবে অনেককে গণপিটুনির শিকার হতে হয়, মারা যেতে হয়, তাও তো জানা আছে আমাদের। শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কেন, প্রায়-সবাই জানেন, জনতা কীভাবে মব হয়ে ওঠে এবং এই ধরণের ঘটনা ঘটায়। তাতে থাকে সুপ্ত ও বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ,– যে ক্ষোভকে বিনষ্ট করতে, প্রশমিত করতে প্রচল সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।
কিন্তু এতকিছু করার পরও জনগণকে চারদলের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে ব্যর্থ হয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো।
চার দলের বাইরের দলগুলো, আমি বলব, বারবার ছাড় দিয়েছে। তারা আন্দোলনের রাজপথ থেকে কৌশলে সরে এসেছে এবং জনগণকে হতাশ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বোধহয় এরকম দুঃসহ সময় আর কখনও আসে নি, যখন জনগণ আন্দোলনের জন্যে মাঠে নেমে এসেছে, কিন্তু রাজনীতিকরা তাদের ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে তই তই করে ডাকা পাঠাচ্ছেন। এইসবের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিকরা আন্দোলনকে হাস্যকর করে তুলেছেন এবং শেষপর্যন্ত আগে থেকেই পাতা এমন এক ফাঁদে আটকে গেছেন, যাতে অপপ্রচার চালানো যায় যে চারদল ছাড়া অন্যান্য দলগুলোর দাবি মেনে নেয়ার পরও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এরকম পরিস্থিতিতেই কী না সবচেয়ে হতাশাজনক হয়ে উঠল তরুণদের ভূমিকা! ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বই দশক পরিক্রমণ শেষে তরুণরা নতুন শতাব্দীতে এসে নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করে ফেলল মানুষের রোগমুক্তির জন্যে অর্থসংগ্রহের মতো বিভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী কনসার্ট আয়োজনের সাংগঠনিক উদ্যমের মধ্যে। এবং এই সাংগঠনিক উদ্যমও

স্যালাইন পেতে লাগল মূলত কোমল পানীয় কিংবা মোবাইল কোম্পানিগুলোর কাছে থেকে। এই তরুণদের কণ্ঠ থেকে সবসময় ধ্বনিত হতে লাগল, বিএনপি তরুণদের অ্যাকোমোডেট করেছে, তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তুলেছে।

কেউই ব্যাপারটিকে এভাবে দেখলেন না, বিএনপি কি তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তুলেছে, নাকি কিছু তরুণ চোরবাটপার একত্রিত করেছে? এই তরুণ নেতৃত্ব 'তারুণ্য' বলতে যা বোঝা যায়, তা কি সত্যিই ধারণ করেছে?

তারা অত্যন্ত চৌকসভাবে অনৈতিক সব কাজ করছে, দুর্নীতি-অনিয়ম করছে, হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। এই তরুণ নেতৃত্ব দেখে কি আদৌ উলসিত হওয়ার কোনও কারণ আছে?

অন্য দলগুলো তরুণ নেতৃত্বের জন্যে কোনও পরিসর তৈরি করতে পারছে না, সেটি অবশ্যই ওই দলগুলোর বড় সংকট, আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে অনেকেই এ সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে; কিন্তু যে দলটি সাংগঠনিক অবয়ব সুদৃঢ় না হওয়ার কারণে ঐতিহাসিকভাবেই কমবয়সীদের ওপর নির্ভরশীল, সেই দলটির তরুণদের নষ্ট কর্মকাণ্ড দেখে প্রশংসা করার কারণ কী? ওই নষ্টামীকেই প্রকারান্তরে পাথেয় ভাবা?

তা হলে, আমাদের তরুণরা কি এই নৈতিক সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন যে অধঃপতিত তরুণ নেতৃত্ব দেখে তারা প্রতিবাদ করা দূরে থাক, ব্যথিত হতে ও অপমানিত বোধ করতেও আর আগ্রহী নন? ১৯৬৯-এর গণঅভুত্থানের সময় যেসব নষ্ট তরুণ রাজনীতিকে সন্ত্রাস ও নষ্টামীতে ভরে দিতে চেয়েছে, এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, প্রকৃত সাহসী তরুণরা তাদের পিটিয়ে হত্যা করে রেসকোর্স ময়দানে ঝুলিয়ে রেখেছে। আশির দশকে হত্যা করতে না পারুক, পিটিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আর এখন? এখনকার বেশির ভাগ তরুণকে আহাজারি করতে শোনা যায়, 'আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো স্মার্টলি চুরিডাকাতি খুনখারাপি করতে পারছে না। আরগুলো তো ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা।'

কেউ কেউ অবশ্য রাজপথে নামেন। কিন্তু তাদের কাজকর্ম আরও হাস্যকর। অতীতে আমরা দেখেছি, তরুণ অ্যাকটিভিস্ট কিংবা কবি, লেখক, শিল্পী, গায়ক সবাই এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল তারা পাদ্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা খুব সতর্কভাবে কথাবার্তা বলল, বিবৃতি দিলো, যেন কেউ তাদের ভুল না বোঝে, কেউ যেন তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না তোলে, কেউ যেন তাদের নাটক-সিনেমা-অভিনয় সম্প্রচার বন্ধ করে না দেয় এবং যেন ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা কারও হাতছাড়া না হয়। আমরা দেখলাম, তারা মৌন মুখে ব্যানার নিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে দু'টি দলের কাছে আহ্বান করছে, তোমরা এসব কী করছো? তোমাদের এইসব কাজকর্মের জন্যে আমরা শান্তিতে গান গাইতে পারছি না, শান্তিতে দু কলম লিখতে পারছি না, শান্তিতে ছবি আঁকতে পারছি না, শান্তিতে ঘুমাতে পারছি না।

কিন্তু বাংলাদেশকে যারা ভালবাসেন, বাংলাদেশকে নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেন সেই তরুণদের দলে এরকম তরুণ না থাকলেও চলবে। এদের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের কি জানা নেই, পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা' কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? আমাদের কি জানা নেই, কীভাবে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে মার্কেজের ল্যাটিন আমেরিকাতে? কীভাবে রচিত হয়েছিল বায়ান্নতে এই বাংলায় মাহবুব উল আলমের হাতে একটি কবিতা 'কাঁদতে আসি নি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'? উনসত্তরে শামুসর রাহমানের কলমে 'আসাদের শার্ট'? আমরা কি জানি না, কীভাবে সৈয়দ ওয়ালিউলাহ লিখেছিলেন *একটি তুলসি গাছের কাহিনী*? জানি না, কী যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে উনসত্তরের পেরুনোর মাত্র কয়েক বছরের মাথায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন *চিলেকোঠার সেপাই* কিংবা হাসান আজিজুল হক লিখেছেন *নামহীন গোত্রহীন* ও *পাতালে হাসপাতালে*? জানি না, যুদ্ধের মধ্যে থেকেই কীভাবে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন *বন্দি শিবির থেকে*? জানি না কি আমরা, সিকান্দার আবু জাফরের কলম থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল *তুমি বাংলা ছাড়ো* কিংবা *জনতার সংগ্রাম চলবেই*?

আমি এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অবশ্যই এইসব তরুণ নাগরিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা আছে। কিন্তু তারা চান না তাদের সেই সৃজনশীলতাকে উজ্জীবন করতে। কর্পোরেট প্রাতিষ্ঠানিকতার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে মুখিয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। তাই এদের কাউকে ক্যামেরা হাতে বাংলাদেশের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাময় সময়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় নি; অথচ জীবনের, জনজীবনের, ক্ষুব্ধ মানুষের, ক্রুদ্ধ মানুষের, আশায় উজ্জীবিত কত মানুষের মুখই না তারা এ সময় ক্যামেরায় তুলে নিতে পারতেন রাজপথে নামলে। সৃজনশীল শিল্পীরা এগিয়ে যেতে পারতেন জীবন ও বিদ্রোহের অঙ্গাঙ্গী এক স্রোতের মধ্যে দিয়ে। পথে নামা বিমূর্ত শিল্পীরা খুঁজে পেতেন নতুন এক বিমূর্ততার বোধ। সঙ্গীত নতুন করে স্বর ও সুর পেতো সৃজনশীল তরুণ শিল্পীরা রাজপথে ঘুরলে। তার বদলে তারা তাদের সমস্ত শক্তি কী না প্রয়োগ করলেন কথিত শান্তির আশাতে, তাদের সমস্ত শক্তি তারা নিবেদন করলেন পরস্পরবিরোধী দুটি দলের একতার প্রার্থনাতে। প্রকারান্তরে তারাও এক শান্ত সন্ত্রাস চাপিয়ে দিলেন আমাদের ওপরে। এক অদ্ভুত মানসিক চাপ ও পীড়নের মুখোমুখি হলাম আমরা এটি নিশ্চিত হওয়ার পর যে, এই কথিত তরুণ নাগরিকরা জনগণের চোখমুখের ভাষা পড়তে পারছেন না।

কিন্তু জনগণের চোখমুখের ভাষা না পড়ে উটপাখির মতো শান্তি চেয়ে কি শান্তি পাওয়া যায়? পাওয়া যায় না। অথচ উটপাখির মতোই শান্তির প্রত্যাশী হলেন ড. ইউনূসরা, তাঁর অনুসারীরা। ড. ইউনূস এবং এরা সম্মিলিতভাবে আসলে আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছেন, সেটি অচিরেই বুঝতে পারব আমরা সবাই। গরীব ঘরের সন্তান ধনী ঘরের সন্তানের সান্নিধ্যে গিয়ে পুলকিত হতে থাকলে যেসব বিপর্যয় দেখা দিতে শুরু করে, তাড়াতাড়িই সেসব বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের।

যে-ভদ্রলোক নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পরেই চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্যে ওকালতি করেন, টেলিফোনের মালিকানা সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং শান্তির দূত হওয়ার পরও যার সাক্ষাৎকার ছাপা হয় কী না ফরচুন পত্রিকাতে, নোবেল প্রাইজ নেয়ার জন্যে মঞ্চে উঠে শ্যারণ স্টোনের বাহুলগ্ন হয়ে যার মুখের হাসি নাকে পৌঁছায় (যদিও শ্যারন স্টোন তার মুখে বেসিক ইন্সটিক্ট-এর গাম্ভীর্য ধরে রাখেন একেবারে নিখুঁতভাবে) এবং যিনি আবারও নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তাকে আপনি কী মনে করবেন? অন্য কোনও দেশের মানুষ হলে আমাদের কলামিস্টরা অনেক আগেই এরকম ভদ্রলোককে সমালোচনার ধাক্কায় বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতেন।

সিউল থেকে ফিরেই এই ভদ্রলোক কেন রাষ্ট্রপতিকে 'এ-পাস' দিলেন? কেননা রাষ্ট্রপতি যথাযথভাবে চারদলের স্বার্থগুলো সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। এবং ইউনূসও ঘুরেফিরে বলতে লাগলেন, নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই, নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই সম্ভব আমাদের দ্বন্দ্ব নিরসন করা। একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা কীভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছে তা নিয়ে তিনি একটি কথাও খরচ করলেন না, আহ্বান জানালেন নির্বাচন করার। টিভি ভবনের লিফটে ওঠার লাইনে না-দাঁড়িয়ে নোলকবাবু যে-ভাষায় আশপাশের মানুষজনকে 'আমি ক্লোজআপ ওয়ান' বলে কদর্যভাষায় জ্ঞান দিয়েছে প্রায় একই ভঙ্গিতে এই ভদ্রলোক বঙ্গভবনের সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে অত্যন্ত ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ ভাষায় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'আপনি কঠোর হন। আপনি এটা করেন, ওটা করেন, এইভাবে করেন, ওইভাবে করেন।' যেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি এ জাতির মা-বাবা হয়ে গেছেন, দেবদূত হয়ে গেছেন, সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন!

তো রাষ্ট্রপতি এই 'সর্বজনগ্রাহ্য' ভদ্রলোকের কথা রেখেছেন। তিনি কঠোর হয়েছেন, কেননা তিনি জানতেন ইউনূস আসলে কাদের প্রতি কঠোর হওয়ার কথা বলেছেন। এই কঠোরতার সর্বশেষ প্রতিফল এই যে, শেষ পর্যন্ত চারজন উপদেষ্টাকে বিদায় নিতে হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে। একটি প্যাকেজ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পরও রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী নামিয়েছেন এবং প্যাকেজ প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে পুনরায় অসম্মতি জানিয়েছেন, কারণ তিনি চেয়েছেন যেসব উপদেষ্টা তার পথের কাটা তারা উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বিদায় নিক।

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের সব স্বপ্নই পূরণ হয়েছে। সেনাবাহিনী যখন নামানো হয়, তখন ড. ইউনূস অসলোতে পুরস্কার নিচ্ছেন। একজন রিপোর্টার তাঁর কাছে ওইসময় প্রশ্ন রেখেছিলেন, আপনি যখন পুরস্কার নিচ্ছেন, তখন দেশে সামরিক বাহিনী রাস্তায় নামছে, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

এই শান্তির দূত তখন চুপ করে থেকেছেন এবং চোখের ভাষায় দেশী রিপোর্টার ভাইকে এ জাতীয় প্রশ্ন করতে মানা করেছেন।

এই শান্তির দূত সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের কাছে কৃতজ্ঞ, পুরস্কার পাওয়ার পর সেকথা আবারও সগৌরবে ঘোষণা করেছে আমাদের সামনে। এরশাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তিনি তখন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, কেননা সামরিক শাসক এরশাদই সরকারি মালিকানা প্রায়-বিলোপের মাধ্যমে তাঁর হাতে গ্রামীণ ব্যাংক তুলে দিয়েছিলেন। ইউনূসকে ধন্যবাদ, তিনি যে অকৃতজ্ঞ নন তা প্রমাণ করবার জন্যে; কিন্তু তিনি কি তাঁর জীবনে একটি দিনও এই জাতির সামনে দূরে থাক, বাথরুমে চুপিচুপি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এরশাদের জন্যেই গণতন্ত্র ছিল না দীর্ঘ প্রায় এক দশক? বলেছেন কি কোনওদিন, এই এরশাদের জন্যে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কারণেই আমরা পেয়েছি কানা হোক, খোঁড়া হোক সামান্য এই গণতন্ত্র? বলেছেন কি, স্বাধীনতা পাওয়ার পর জাতি আরও একবার একতাবদ্ধ হয়েছিল গণতন্ত্রের প্রত্যাশাতে এরশাদের শাসনামলে? বলেছেন কি একদিনও দেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে জাড্যতা এসেছে তার অন্যতম কারণ জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক শাসন?

বলেন নি। কারণ, ইয়াজউদ্দিনরা যেভাবে জিয়া পরিবারের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা, ইউনূসরাও সেভাবে এরশাদের কাছে বাধা, সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাধা। এবং ক্রমশ আমরা আবিষ্কার করছি, শুধু ইউনূস কেন, হাসানুল হক ইনু কিংবা রাশেদ খান মেননরাও এরশাদের কাছে বাধা। যে-লোকটিকে গোটা জাতি প্রত্যাখ্যান করেছে, সে লোকটি খুব সহজেই কব্জে পায় মহাজোটে, কেননা ভোটে না জেতার ভয় এই বামপন্থীদের সমস্ত নৈতিকতাকেও মুহূর্তে বটিং পেপারের মতো শুষে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু এই এরশাদ কেন, এখন মহাজোটের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শায়খুল হাদিছ পর্যন্ত। শায়খুল হাদিস এখন

ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা ওড়ানো নেতাদের পাশাপাশি বসে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা হাসি হাসেন। নতুন করে স্বপ্ন দেখেন ফতোয়া দেয়ার। আর তাদের এই ফতোয়া দেয়ার স্বপ্নের অবকাঠামো তৈরি করে দেয় এককালের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা। তারা সবাইকে আশ্বস্ত করতে থাকেন এই বলে, জঙ্গিবাদের দায়ে দণ্ডিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কওমী মাদ্রাসা হবে সংবিধানসম্মত ফতোয়াবাজ। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নৈতিকতাহীনতার পাহাড়ে উঠতে থাকেন, আসলে নিজেরাই ভেতর থেকে পাল্টে যেতে থাকেন এবং এই নৈতিকতাহীনতার ওপর দাঁড়িয়ে তারা প্রকৃতার্থে যে-পরিমাণ ভোট অর্জন করেন, তার দ্বিগুণ পরিমাণ ভোট হারান; কিন্তু তা তারা বুঝতে চান না, মানতে চান না। তারাও সাগ্রহে অংশীদার ও নিয়ামক হয়ে উঠতে চান শান্ত, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাসের।

আমরা যখন ভার্সিটি পেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু এরশাদের সামরিক শাসনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে গেছি তখন আমাদের এক বন্ধুর সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ বড় বোন একটি প্রকল্পের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রকল্পটি ছিল গ্রামীণ ব্যাংক বিষয়ক। এবং এটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, যাকে প্রায় নিয়মিত পত্রপত্রিকায় বাণী দিতে দেখি, বিভিন্ন লেখা লিখতে দেখি। জরিপ করতে গিয়ে আমাদের সেই বড়বোন এবং টিমের অন্যান্যরা দেখেন গ্রামীণ ব্যাংক সফলতা আনে নি, বরং নানাভাবে দরিদ্রদের ওপর নিপীড়ন করছে। তারা সেভাবেই রিপোর্ট তৈরি করেন। স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ তাঁদের ডেকে পাঠান এবং নির্দেশ দেন, রিপোর্টটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে লিখতে এবং জরিপের ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টোভাবে দেখাতে।
জরিপকারীরা তখনও কেউ চাকরিও পান নি, কোনও অভিজ্ঞতা নেই তাদের; অভিজ্ঞতার ঝুলি তারা পূর্ণ করেছিলেন জীবনের প্রথমেই নিজেদের পাওয়া জরিপের রিপোর্ট অন্যভাবে লিখে। আর সেই অর্থনীতিবিদ আরও কয়েক বছর পর পত্রিকায় কলাম লিখেছিলেন, ড. ইউনূসের অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।
ড. ইউনূস তাঁর চলার পথে অনেককেই ছুঁড়ে ফেলেছেন, হয়তো বা এই অর্থনীতিবিদটিকেও ছুঁড়ে ফেলেছেন। তাই আজকাল আর ইউনূসকে নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ কোনও লেখা লেখেন না, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরও না।
মুষ্ঠি মুষ্ঠি ভিক্ষা দিয়ে দারিদ্র দূর করা যায় না, ক্ষুদ্র ঋণ দিয়েও না। দু'চারটা উদাহরণ অবশ্যই তৈরি করা যায়, ইউনূসও দু'একটি উদাহরণ তৈরি করেছেন মাত্র। কিন্তু এসবই ব্যতিক্রম; দারিদ্র একটি সামগ্রিক ব্যাপার, তা সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, সেই সামগ্রিক প্রক্রিয়া থেকে উত্তরণের পথে মাইক্রোক্রেডিট কোন ভূমিকা রাখবে তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক গতিমুখের ওপর। ইউনূস, যিনি বলেন, 'সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় নির্বাচন', তিনি যে কোন রাজনৈতিক গতিমুখের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁর পরিচালিত মাইক্রোক্রেডিট যে কোন স্বার্থ সংরক্ষণ করে, তা একটু লেখাপড়া করলেই টের পাওয়া যায়।
এরা সবাই মিলে গত কয়েক বছর ধরে সুশাসন, ক্ষুদ্র ঋণ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর যে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করেছেন তা আজ আমাদের সবাইকে ঠেলে দিয়েছে এই শান্ত, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক এক সন্ত্রাসের ভেতর। রামায়নে রামের এক হনুমান পাই, সেই হনুমান ঠিক গাছটি চিনতে না পেরে নির্দ্বিধায় অসুস্থ রামের জন্যে গোটা পাহাড় বয়ে নিয়ে এসেছিল। রাম আর খালেদা জিয়াকে এক পালায় তোলা মোটেও সঠিক নয়, কিন্তু এটুকু তো অবশ্যই লেখা যায়, সেই হনুমানের মতোই নিবেদিত এই রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন। তিনি দেশের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন খালেদার মুখের দিকে চেয়ে এবং খালেদার করুণা হওয়াতে সম্প্রতি একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি মিলেছে তাঁর।

এর বিপরীতে অনেক আগেকার কর্কশ চেহারার এক সক্রেটিসের কথা চিন্তা করুন। হেমলক পানে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তখন এক খুবই ভোরে তাঁর কাছে চুপি চুপি গিয়েছিলেন বন্ধু ক্রিটো। বলেছিলেন, তিনি চান সক্রেটিসকে নিয়ে গোপনে চলে যেতে। কেননা সক্রেটিসের উচিত নয় এখনই মৃত্যুবরণ করা, কেননা পৃথিবী অনেক কিছু পেতে পারে সক্রেটিসের কাছে থেকে।
ক্রিটো বলেছিলেন সক্রেটিসকে, দেখ, টাকা দিয়ে মানুষ কিনে ফেলা কোনও ব্যাপার নয়। টাকা হলে কাঠের পুতুলও মুখ নাড়ায়। টাকা দিয়ে এই জেলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাইকে আমি কিনে ফেলতে পারি। কাকপক্ষীও টের পাবে না এ ঘটনা। সক্রেটিস তাতেও রাজি হন নি। তখন ক্রিটো তাঁকে বলেছিলেন, দেখ, তোমাকে আমি নিয়েই যাব। আমার তো টাকার কোনও অভাব নেই। আমি যদি তোমাকে গোপনে এভাবে বাঁচানোর ব্যবস্থা না করি, তা হলে লোকে ভাববে, আমি খুব লোভী লোক, টাকাপয়সা থাকার পরও বন্ধুকে রক্ষা করি নি, বাঁচাতে যাই নি। সক্রেটিসকে তবু রাজি করানো যায় নি।

আর হ্যামলক পান করার আগে নানা অজুহাত দেখিয়ে আরও একটু সময় দেরি করার অনুরোধ জানালে সক্রেটিস তাঁর এই বন্ধু ক্রিটোকে বলেছিলেন, "...আমি মনে করি খানিকটা দেরিতে বিষ খেয়ে আমি কিছুমাত্র লাভ করবো না, মাঝখান থেকে জীবনের প্রতি এত মায়ার জন্যে নিজের কাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে যাবো, যখন জানি কোনো কিছুই শেষতক স্থায়ী হয় না। যাও, কথা শোনো, বাধা দিয়ো না।"

জীবন মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জীবনে কোন মুহূর্তে থামতে হয় তাও জানা উচিত। হাজী দানেশের যৌবন খুব গৌরবময়, গৌরবময় যৌবন আ স ম আবদুর রব কিংবা শাহজাহান সিরাজেরও। কিন্তু কেউ তাদের নাম আর উচ্চারণ করেন না শ্রদ্ধার সঙ্গে। কেন করেন না, তা আশা করি, পাঠকপাঠিকা, আপনাদেরও জানা আছে। ইয়াজউদ্দীন কিংবা ইউনূসও ভুলে গেছেন কোনখানে তাদের সক্রিয় হতে হবে, কোনখানে তাদের থামবে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসকে ইয়াজউদ্দিন, ইউনূস কিংবা শাহাবুদ্দীনরা নিয়ে যেতে পারতেন গৌরবময় একটি জায়গাতে। কিন্তু তারা কেউ ক্ষ্যাপা নন, তারা কেউ পরশপাথর খোঁজেন নি। তাঁরা খুঁজেছেন একটি মন্ত্র, একটি চিচিংফাঁক, যাতে শরীরের ঘাম না ঝরিয়েই সুনাম কুড়ানো যায়, দৌলত পাওয়া যায়। মরে যাওয়ার আগেই তারা হারিয়ে গেছেন ইতিহাসের অতল গহ্বরে। এখন তাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান ব্যাপার, কিন্তু মরে যাওয়ার আগেও বহুবার মরে-মরে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা সবাই। ইতিহাসে একজন মনু মিয়া, মতিউর ও নূর হোসেনের গুরুত্ব এদের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি। তাজউদ্দীনের সেই মর্মস্পর্শী ভাষ্যকে অনুসরণ করতে করতে আমরা বলতে পারি, এ ব্যাপারটি একদিন অবশ্যই টের পাওয়া যাবে, তবে ততদিনে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবুল হাসানের একটি কবিতা আছে। এখন অনেক সকাল, অনেক বিকাল, অনেক রাত এই কবিতা আমার বুক ফুঁড়ে উঠে আসে। *কুরুক্ষেত্রে আলাপ* নামের এই কবিতায় আবুল হাসান বলেছেন,

ভাই পলায়নে যাবে, বোন তার বাসনা হারাবে, আমি জানতাম
ফুল ফুটবে না, ফুল ফুটবে না, ফুল আর ফুটবে না, ফুল আর
কখনো ফুটবে না!

দেখুন, সত্যিই আমাদের ভাইরা সবাই পলায়নে যাচ্ছে। দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে গিয়ে নাগরিকত্ব অর্জনেই বেশি ঝোঁক তাদের সবার। আমি খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি, অনেক সাংবাদিক ও প্রগতিপন্থী মানুষও বিদেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ওপর কোনও রাজনৈতিক হুমকি ছিল না, কিন্তু তারা এ কাজটি করেছেন অত্যন্ত নৃশংস উপায়ে এবং ঠাণ্ডা মাথায়। এতে তাদের দেশের কোনও গৌরব বাড়ে নি, তাদেরও গৌরব বাড়ে নি এমনকি তাদের কারণে দেশের রেমিটেন্সও বাড়ে নি এতই অচল ও বয়কাপড়া মানুষ হয়ে গেছেন তারা।

কোনও কোনও কলামিস্ট আছেন, বিদেশ থেকে নিয়মিত কলাম লেখেন এবং এমন ভাব দেখান যে, দেশে থাকলে কিংবা দেশে ফিরলে তাদের ওপর মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবির, সালিম সামাদ কিংবা প্রিসিলা রাজের মতো অকথ্য নির্যাতন চালানো হবে।

বাস্তবতা হলো শান্ত, নিরপেক্ষ সন্ত্রাসের যে-রাজত্ব গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে এই প্রবাসী কলামিস্টদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। বাস্তবত আমরা কী দেখছি? যারা এখানে প্রতিবাদ করছেন, বলছেন এসো রাজপথে নামি, তারা উপহাসের পাত্র এখন। তাদের কখনও বলা হচ্ছে পাগল, সময়কে বুঝতে অপারগ, কখনও বলা হচ্ছে অনিয়মতান্ত্রিক, কখনও বলা হচ্ছে বিপথগামী, কখনও বলা হচ্ছে এইসব মানুষদের স্বভাব হলো সব কিছুই নেতিবাচকভাবে দেখা। আর এইসব বলার সামাজিক মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত কয়েক বছর ধরে খুব ধৈর্য ধরে বেশ কিছু আইকনও নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সফল হলেন ড. ইউনূস।

কিন্তু তারপরও আমাদের সান্ত্বনা, আমরা প্রতিবাদ করছি। দ্য ভিঞ্চি কোডের সেই প্রায়রি সদস্যদের মতো আমরা আসল সত্য জানি। আমরা জানি, দেশে স্বাধীনতা কীভাবে এসেছে, কীভাবে সেই স্বাধীনতা ও মুক্তিকে প্রতিবন্ধের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, কী করে মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক হত্যা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আমরা জানি, উন্নয়ন আসলে কাকে বলে, কীভাবে সেই উন্নয়ন আসে, কীভাবে সামরিক শাসন ও কথিত গণতন্ত্র জারি করে সেই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে বিপথগামী করে তোলা হয়, কতিপয় গার্মেন্ট ও লুম্পেন ব্যবসায়ী ও কমিশনবাজ রাজনীতিক ও আমলাদের গণতন্ত্রে পরিণত করা হয়। আমরা জানি, এদেশের রাজনীতি নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু তারপরও কোনও একটি রাজনীতিই পারে পাথুরে আমাদের জ্যান্ত করে তুলতে পারে জিয়নকাঠি ওলোটপালোট করে দিয়ে। আমরা জানি, আমাদের সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু তারপরও কোনও একটি সমাজ বিনির্মাণের মধ্যে দিয়েই আমাদের পক্ষে সম্ভব পৌঁছানো মুক্তির দুয়ারে এবং আমাদের এই সম্ভাবনার দুয়ারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো নতুন শতাব্দীতে প্রত্যয়ীকৃত শান্ত, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস। আমরা যারা শাসকের দলে নই, আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমরা যারা গুনগুনিয়ে এখনও গাওয়ার এবং বিশ্বাস করার চেষ্টা চালাই 'জাগো প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম আনন্দে, সন্ধ্যায় গৃহে ফের আনন্দগানে', কেবল তারাই

জানি এই অসহনীয় শান্ত, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সন্ত্রাস কী প্রচণ্ডভাবে মানুষকে বদলে দিতে চাইছে ভেতর থেকে। যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দেশশাসনের প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন, রাজনীতি ও বাণিজ্যকে সমার্থক করে তুলতে চাইছেন, সুশীলতার নামে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়নকে সহনীয় করে তুলতে চাইছেন, যারা নিজেরাই মৌলবাদ ছাড়া অসহায় বোধ করছেন ও সামাজিক বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছেন তারাই এ সন্ত্রাসের স্রষ্টা ও নির্মাতা।
বিজয়ের এই মাসে আসুন আমরা সমবেত হই এবং সম্মিলিতভাবে ঘৃণা জানাই এই সন্ত্রাসীদের।

এটি সত্যিই একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার যে, এত কিছুর পরও আমাদের ঘৃণা করার সাহস ও শক্তি আছে। অন্যদিকে আবার বিসর্পিল এক ইতিহাস পরিক্রমণ করার পাশাপাশি যাবতীয় অর্থনৈতিক বিপন্নতা নিয়েও আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি। ১৯৭১-এ আমরা বিজয়ী হয়েছি, কিন্তু আমাদের সামনে এখনও এক দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। সেই পথে আরও অনেক রক্তপাতও ঘটবে। আমরা যেন সেই রক্তপাতে বিস্মিত না হই, সেই রক্তপাত দেখে 'শান্তি' 'শান্তি' মাতম না তুলি।
যারা মহাভারত পড়েছেন, তারা একটু হলেও কল্পনা করতে পারেন, কী দীর্ঘ এ পথ এবং এ পথে এমনকি স্বজনের সঙ্গেও কী করে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়তে হয়। আমরা সেই বিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা বারবার উদারতা দেখাচ্ছি, বারবার শান্তির অমিয়বাণী উচ্চারণ করছি, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, *শান্তির ললিত বাণী আজ শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস*। যত উদারতাই আমরা দেখাই না কেন, অনিবার্য এক নিয়তি কিংবা রক্তপাত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এবং আমরা যত শান্ত মনে সেই নিয়তি কিংবা রক্তপাতের জন্যে অপেক্ষা করতে পারব, নিয়তি কিংবা রক্তপাতের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারব, ততই মঙ্গল আমাদের। যুধিষ্ঠিরকে যে রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল দুর্যোধনদের চক্রান্তে পড়ে, আমাদেরও সেই রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে, যদিও আমরা জানি তারাও আমাদের আত্মীয়, তারাও আমাদের আপনার জন, তারাও এ দেশের মানুষ।
ভাঙনের শুরু অনেক আগে, যুদ্ধের শুরু অনেক আগে; আর শান্ত, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক এক সন্ত্রাসের তোড়ে এখন সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা কি তা টের পাচ্ছি?

০১ পৌষ ১৪১৩/ ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬। প্রকাশ : ভোরের কাগজ, বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৬/ সমাজ নিরীক্ষণ ২০০৬।

সামাজিক বণিক, রুইকাতলার ব্যবসা এবং জরুরি একুশ

বাংলাদেশের গত ৩৫ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হতে চলেছে জরুরি অবস্থার মধ্যে। জানি না, এ বিরল ঘটনাটিকে আপনারা সবাই কীভাবে দেখছেন। জরুরি অবস্থার প্রথম বলি, সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার, দ্বিতীয় বলি সকল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছে তাও ভুলুণ্ঠিত এ অবস্থাতে। তবে কথিত সুশীল সমাজ এই পরিস্থিতিতে খুবই আশান্বিত। তারা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় হীন স্বার্থে দেশকে বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে গেছে এবং এবার একটি সুযোগ এসেছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে দুর্বৃত্তমুক্ত ও পরিশীলিত করে তোলার। সামরিক বাহিনী প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের সময় কয়েকদিন আগে একটি প্রভাবশালী দৈনিকের একজন সম্পাদক এ-ও বলেছেন, যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে এই জরুরি অবস্থাকালীন সরকারকে কমপক্ষে এক-দেড় বছর সময় দেয়া উচিত!

বাংলাদেশে জরুরি অবস্থার মধ্যে শহীদ দিবস প্রথম পালিত হয় ১৯৭৫ সালে। ওই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রের সংকট দূর হয় নি, বরং তা আরও বাড়ে এবং মধ্য আগস্টে ধর্মজ রাজনৈতিক ধারা রাষ্ট্রকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। একুশকে কেন্দ্র করে যে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত হচ্ছিল সঙ্গত কারণেই তা ব্যহত হয়। সংবিধান থেকে বিদায় নেয় ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলনীতি। তারপর কোনও সময় সামরিক শাসনের আড়ালে, কোনও সময় বহুদলীয় বেসামরিক রাজনৈতিক শাসনের ছদ্দাবরণে এই ধর্মজ রাজনৈতিক অপশক্তি ক্রমান্বয়ে নিজেদের সংগঠিত করেছে। ফলে এ দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারাও এক মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার জরুরি অবস্থা জারি করেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর। এই জরুরি অবস্থা জারির পর নাগরিক গণঅভ্যুত্থান ঘটে, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কোনও ভূমিকা রাখতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাধ্য হন ক্ষমতা থেকে সরে যেতে। অচিরেই একটি অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রের দায়িত্বভার নেয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে দফায় দফায় সামরিক শাসকদের তত্ত্বাবধানে পরিপুষ্ট ধর্মজ রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীকার করে, সঙ্গী করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনধারা যাত্রা শুরু করে।

গত ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে তৃতীয়বারের মতো জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং আমরা দ্বিতীয়বারের মতো শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করতে চলেছি। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বলছেন, আমাদের দেশের সংবিধানে সামরিক শাসনের বিধান বা স্বীকৃতি নেই, কিন্তু জরুরি অবস্থার বিধান বা স্বীকৃতি রয়েছে। অতএব এ পরিস্থিতি এক অর্থে সংবিধানসম্মত,– তা মৌলিক অধিকারগুলোকে যতই খর্ব করুক। এদের কারও কারও অভিমত, সশস্ত্র বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে

সংবিধানসম্মত উপায়ে জরুরি অবস্থা জারি করিয়ে দেশের শাসনব্যবস্থাকে সাংবিধানিক পথে কার্যকর রাখার এক মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকায় আমি খুবই বিস্মিত। একজন সাধারণ মানুষ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় আশ্বস্ত হতে পারেন, কিন্তু একজন বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ কীভাবে বলেন, এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না সংকট নিরসনের? একশ্রেণির সুশীল ও বুদ্ধিজীবী কেন জরুরি অবস্থায় স্বস্তি বোধ করছেন, তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত গণমাধ্যম অবশ্য এ অবস্থার প্রতিবাদ করেছে, যদিও তার কারণ নিতান্তই পেশাগত। গণমাধ্যমের প্রতিবাদের মুখে রাষ্ট্রযন্ত্র কিছুটা হলেও পিছু হটেছেন এবং বলেছেন, সরকার জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ ২০০৭-এর আওতায় মিডিয়ার জন্যে যে গাইড লাইন তৈরি করেছেন তা কখনও কার্যকর করা হবে না। যে গাইড লাইন অনুসরণ করা হবে না, সে গাইড লাইন কেন প্রণয়ন করা হলো, সে গাইডলাইন আদৌ শেষ পর্যন্ত অলংকার হিসেবেই শোভা বর্ধন করবে কি না, এগুলো বোঝার মতো মাথা আমাদের সবারই আছে। তবু বেড়াল-ইঁদুর খেলা চলছে। সহজ কথায়, আমরা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের বিষয়টি মেনে নিয়েছি, কিন্তু গণমাধ্যমের অধিকার যাতে হরণ করা না হয় সেজন্যে সোচ্চার হয়েছি; এইভাবে আমরা প্রমাণ করেছি, মৌলিক অধিকার হরণের বিষয়টি আমাদের কাছে কোনও বড় বিষয় নয়, তার চেয়ে অনেক বড় হলো মৌলিক অধিকার হরণের পর কী ঘটছে, কী মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা সকালে উঠেই বাসি চোখে দেখতে পাওয়া। আমরা নাকের বদলে নরুন পেয়েছি এবং সেই নরুনসমেত আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

দুই

এই একুশে তাই স্বাভাবিকভাবেই একেবারে অন্যরকম। এবারের একুশ আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে-একুশ আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার উৎস, যে-একুশ আমাদের এতদিন ধরে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসনবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে সে-একুশ কি তা হলে এবার হারিয়ে যাবে সামাজিক ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ সামাজিক বাণিজ্যের গহ্বরে?

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় আটচলিশ সালে। কিন্তু অচিরেই ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ আন্দোলন নানা রাজনৈতিক নিপীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হতে-হতে আলাদা একটি রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জনমানসে অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রমুখি এত বড় আবর্তন সৃষ্টি হওয়ার কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর-পরই একদিকে শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা বিকাশমান মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছোটবড় বিভিন্ন শ্রেণি আন্দোলন দানা বাধতে থাকে, তেভাগা-টংক-হাজং ইত্যাদি বিদ্রোহগুলি পাকিস্তান সরকার দমন করে কঠোর হাতে, নেমে আসে শ্রেণি নিপীড়ন, চেষ্টা চলে বারবার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গা সৃষ্টির। নতুন বিকাশমান যে-শিক্ষিত শ্রেণিটি কৃষকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পর্যায়ে তাদের বিভিন্নরকম সংযুক্তি ঘটে এবং এভাবে তারা কিংবা তাদের পরিবারও গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর নতুন এক অংশীদার হয়ে ওঠে। গ্রামের নতুন ক্ষমতাকাঠামো আর নতুন উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেলবন্ধনে ভাষা আন্দোলন বিস্তার পায় গ্রাম ও শহরে সমানতালে। এরকম ক্ষমতাকাঠামো ও শ্রেণি কার্যকারণ না থাকলে বাংলা ভাষা আন্দোলনও ব্যর্থ হতো পৃথিবীর আরও সব ভাষা আন্দোলনের মতো, যেমন ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তানেরই বেলুচিস্তানে। কিন্তু শ্রেণিআকাঙ্ক্ষা বাংলা ভাষার আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের জন্যে সব শ্রেণির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিয়ে অর্জিত সব গৌরব নষ্ট করার পথ হলো, একুশে ফেব্রুয়ারিকে সাম্প্রদায়িক চেতনার আবর্তে নিয়ে যাওয়া, ভাষা আন্দোলনকে 'মুসলমানদের' আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মৌলবাদীরা অনেক আগে থেকেই জোরেশোরে সে-প্রচেষ্টা শুরু করেছে, চেষ্টা চালাচ্ছে গোলাম আযমকে ভাষা সৈনিক বানাবার, যাতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্যে একটি ইতিবাচক পরিসর তৈরি করা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মতো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকেও ভিন্নমুখি করা যায়।

তিন

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি'র নেতা গোলাম আযম দেশে ফিরলেই তাকে ভাষাসৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কৌশল নেয় জামায়াতে ইসলামী। প্রচার চালানো হয়, ১৯৪৮ সালে গোলাম আযম ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সামনে স্মারকলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন। জামাতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম প্রতিবার একুশে ফেব্রুয়ারির আগে-পরে এ ব্যাপারে বেশ বড়সড় 'তথ্যবহুল প্রতিবেদন'ও ছাপে। তাতে কমরেড তোয়াহার মতো বামপন্থী নেতার কিংবা ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের সাক্ষাতকারের কথিত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হয়, গোলাম আযম সত্যিই ভাষাসৈনিক ছিলেন। ভাষা

সৈনিকদের এরকম সাধারণভাষ্যকে সমর্থন করেন এমনকি বুদ্ধিজীবী বশীর আলহেলাল। তবে বশীর আলহেলাল যতই বলুন, ''ভালো লাগুক আর না লাগুক গোলাম আযম আন্দোলন করেছেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই,''–বাস্তবতা হলো এ বক্তব্যও ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে বিশেষণ করার ফল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে গোলাম আযম নিজেই তার ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার বিষয়টিকে বিতর্কিত করে তুলেছেন। এতদিন পরে আমাদের মনে না-ও থাকতে পারে, জুন ১৯৭০-এ পশ্চিম পাকিস্তানে এক জনসভায় গোলাম আযম বলেছিলেন, 'উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল এবং আমরা ভাষা আন্দোলন করে ভুল করেছিলাম'। ওই সময় দৈনিক আজাদের ২০ জুন, ১৯৭০ সংখ্যায় এ সংবাদ ছাপা হয়েছিল। গোলাম আযমের এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র প্রকাশ্য পত্রিকা 'গণশক্তি'তে একটি কড়া সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন বুদ্ধিজীবী ও 'গণশক্তি'র সম্পাদক বদরুদ্দীন ওমর।

মুক্তিযুদ্ধ যদি না হতো, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো যদি আগের মতোই থাকত, তা হলে কী হতো? গোলাম আযম এখনও বলতেন, ভাষা আন্দোলন করে ভুল করেছি। অথচ এখন ভাষাসৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়াতে তিনি মর্মাহত। চারদলীয় জোট ২০০১-এ ক্ষমতায় এলে জামায়াতের আলোচনাসভায় আবদুল কাদের মোলাসহ তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুসারী এ ব্যাপারে কথা তোলেন। ফলে গোলাম আযমের মনের দুঃখ আরও বেড়ে যায়। তিনি ভারাক্রান্ত গলায় বলেন, 'দাবি করে স্বীকৃতি আদায় সম্মানজনক নয়। তবে জামায়াত এ ব্যাপারে লবিং করতে পারে' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২)।

গোলাম আযমকে এখন বলতে শোনা যায়, 'অভিমান করে প্রথমে উর্দু ভাষাই শিখি নাই, মাতৃভাষার আন্দোলন করাকালে। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলাম হিন্দু হলের ছাত্রদের উর্দু শিখা দেখে' (দৈনিক সংগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০০)। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, 'হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা উর্দু শিখে পাকিস্তানি হয়ে উঠতে চেয়েছিল এবং বাংলা ভাষার আন্দোলন থেকে দূরে ছিল'। ভাগ্য ভালো, তিনি বলেন নি ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি অরবিন্দ ভাষা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ডাকসুর মনোনিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গোলাম আযম যখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সামনে স্মারকলিপি পড়ার সুযোগ পান, তখন অরবিন্দ ছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে এই অরবিন্দের ভূমিকা অনালোচিতই রয়ে গেছে; কেননা পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রচরিত্রের কারণে আন্দোলনকারীদের, বিশেষত আন্দোলনের সংগঠক বামপন্থী নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হয়েছে। যাতে শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। আর এ জন্যেই লিয়াকত আলী খানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়ার দায়িত্ব তখন অরবিন্দকে দেয়া যায় নি, দেয়া হয় নি। তাঁর বদলে স্মারকলিপি দেন গোলাম আযম। সেদিনের সেই ঘটনাকে পুঁজি করে এখন গোলাম আযম মরিয়া হয়ে উঠেছেন ভাষাসৈনিকের তকমা নিতে।

গোলাম আযম ওই আলোচনাসভায় আরও বলেছিলেন, 'দু'বাংলা এক হলে আজ যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েছেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারারও হতে পারতেন না, যাঁরা সেনাবাহিনীর জেনারেল হয়েছেন তাঁরা লেফটেন্যান্টও হতে পারতেন না, যাঁরা সচিব হয়েছেন তাঁরাও আজ এ পর্যায়ে আসতে পারতেন না। আজ তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতেও সাহস পাচ্ছেন' (দৈনিক সংগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০০)। দুবাংলা এক হলে কী হতো সেটা আমরা কেউই বলতে পারব না, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববাংলাকে জুড়ে দেয়ায় কী হয়েছিল তা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু গোলাম আযম সে সম্পর্কে কিছুই বলেন না, কেননা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে তার বুক খানখান হয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য কতটুকু এই মৌলবাদীদের কাছে? গোলাম আযমের নিজের কথাতেই শোনা যাক। তাঁর মতে, 'এটা তখন কোন রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, মায়ের ভাষার প্রাণের দাবি হিসাবে চিহ্নিত, প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চেয়েছি তারাও তখন মনে করেছি এটা আদায় করা গেলে বাঙালীদের চাকরি-বাকরি পাওয়া সহজ হবে' (জনকণ্ঠ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২)। গোলাম আযমদের কাছে ভাষা আন্দোলন কেবল 'চাকরি-বাকরি পাওয়া সহজ হওয়া'র মতো উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই তিনি বলতে পারেন, ভাষা আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক চরিত্র নেই। পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রযন্ত্রটির এত বড় একটি পদক্ষেপকে গোলাম আযম বিবেচনা করেন 'অরাজনৈতিক' হিসেবে। গোলাম আযম বলতে চান, জিন্নাহ কিংবা লিয়াকত আলী খানদের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার এবং তাদের এ সিদ্ধান্তের কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদে ভাষা আন্দোলন নিয়ে কী বিতর্ক হয়েছিল এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, মওলানা ভাসানী প্রমুখ তাতে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা সেই রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছিলেন এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোরই বা কী সম্পর্ক ছিল,– এসব ব্যাপার বিবেচনা করতে আগ্রহী নন তিনি।।

বছর কয়েক আগে মৌলবাদীদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং আমরা' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, তাঁদের দাবি ও ভাষ্য অনুযায়ী

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রস্তাবক খান মোঃ মিজানুল ইসলাম সেলিম'। এ সেমিনারের বক্তারা বলেন, 'ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তান আন্দোলনেরই বর্ধিত রূপ। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভক্তি ঘটলে ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজন ঘটতো না' (দৈনিক সংগ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২)। এ সেমিনারেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে আফতাব আহমেদ বলেন, 'এ দেশে বাঙালি মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি... (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২)।' এভাবেই চেষ্টা চলেছে ভাষা আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতায় সম্প্রদায়ের আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার।

লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করে মৌলবাদীরা চায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পাকিস্তানি রাষ্ট্রদর্শনের আদলে গড়ে তুলতে। লাহোর প্রস্তাবে কয়েকটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় এ ব্যাপারে মৌলবাদীরা মুখ বুজে ছিলেন। তখন শরৎ বোস ও সোহরাওয়ার্দী মিলে অখণ্ড বাংলা গঠনের দাবি তুলেছিলেন (যদিও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এরকম একটি দাবি কেন তুলেছিলেন, তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিমত রয়েছে)। কিন্তু ভারতবর্ষে দুইয়ের অধিক রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সাম্প্রদায়িক শক্তি তথা মৌলবাদীরা ছিল একেবারেই নীরব। এমনকি ১৯৭১ সালেও এরা ঐক্য ও সংহতির বাণী প্রচার করেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছেন। এখন এরাই লাহোর প্রস্তাবের সবচেয়ে বড় পূজারি। কেননা এরা চায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানি আদলে গড়ে তুলতে। এরা চায় সেক্যুলারিজমকে হত্যা করতে। সে কারণে এরা বারবার বলে, পাকিস্তান হয়েছে বলেই বাংলাদেশ হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতার দিকে তাকালে এরকম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, পাকিস্তান না হলেও বাংলা নামের একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটত, এবং পাকিস্তান গঠন করার মধ্যে দিয়ে ওই রাষ্ট্রটির গঠনপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হয়েছে মাত্র।

চার

একুশে ফেব্রুয়ারি কি পারবে ভবিষ্যতেও আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রেরণা দিতে? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আমরা একুশকে মৌলবাদী রাজনীতির খপ্পর থেকে, সুশীল রাজনীতির খপ্পর থেকে কতটুকু রক্ষা করতে পারব তার ওপরে। কেননা এর মধ্যেই আমরা দেখেছি, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়ার পর এর রাষ্ট্রীয় অপব্যবহার শুরু হয়েছে, ধর্মজ অপব্যবহার শুরু হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযোগ হিসেবে একে অকার্যকর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

কিন্তু এরকম সব অপচেষ্টার পরও এবারের একুশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রাজনীতিকে একটি দুষ্ট নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দেশের সুশীল সমাজের একটি চিহ্নিত অংশ উঠেপড়ে লেগেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একদলীয় অগণতান্ত্রিক শাসন, সামরিক শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ছদ্দাবরণে একনেতাকেন্দ্রিক শাসনের ফলে যে রাজ নৈতিক দুর্বত্তায়ন ঘটেছে, যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি ঢুকেছে সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমালোচনা না করে গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। এবং এইভাবে রক্ষা করা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য, এনজিও প্রক্রিয়া, সামরিকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের যোগসাজশে গড়ে ওঠা একটি ধারাকে। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নির্বিষ করা হচ্ছে যাতে বিশ্বায়ন ও বিশ্বব্যাংকের কথিত এজেন্ডাগুলি সহজেই বাস্তবায়নের পরিবেশ তৈরি করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় হয়তো ছোটখাটো রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যক্তি ও আমলানির্ভর দুর্নীতিও বহুলাংশে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বদলে সংঘটিত হতে থাকবে বড় বড় রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, যেগুলি নিয়ে আমাদের কোনও কিছু করার থাকবে না, কোনও কিছু বলার থাকবে না।

মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন মহাজনী ঋণ প্রথা উঠিয়ে দিয়ে তার বদলে প্রাতিষ্ঠানিক মহাজনী প্রথা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় এ দেশ থেকে এলেবেলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উঠিয়ে তার বদলে চেষ্টা চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি প্রতিষ্ঠার। কেননা একমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই সম্ভব রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলির প্রস্তাবিত পথে বন্টন করা, দেশের অবকাঠামোগুলিকে বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা। আমাদের গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য, এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে এমন ব্যক্তিও সমালোচনা করেন যার প্রতিষ্ঠানের কোনও কোনও সদস্যকে ঋণ নেয়ার পর আত্মহত্যা করতে হয়, যিনি একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করে সুবোধের মতো দেশে ফেরেন, নরওয়ের একজন মন্ত্রী যাঁকে তিরস্কারমেশানো কণ্ঠে 'ব্যবসায়ী' হিসেবে আখ্যায়িত করে স্মরণ করিয়ে দেন, ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই কথাবার্তা হবে। নরওয়ের মন্ত্রী যাকে ব্যবসায়ী বলছেন বিশ্বায়নের মোড়লদের চোখে তিনি 'শান্তির দূত', বাংলাদেশের কথিত সুশীলদের কাছে তিনি এদেশের সম্মানবাহক এবং সামাজিক ব্যবসায়ীদের চোখে তিনি 'দারিদ্র থেকে মুক্তিদাতা'। তিনি এখন একদিকে রাজনীতিকদের সমালোচনা করছেন, অন্যদিকে রাজনীতিতে নামার স্বপ্নও দেখছেন। তিনি রাজনৈতিক দল করুন, তাকে আমরা স্বাগত জানাই; কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দল গঠন করার আগেই রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাহীন বিধায় অন্য কিছু অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে

বেসরকারিকরণের মতো বিভিন্ন গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নের ইংগিত দিচ্ছেন। হ্যারি কে টমাস এক সময় বলেছিলেন, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতায় এ দেশে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে। আমরা এখন সেই তৃতীয় শক্তিকে দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বের গণমাধ্যমে একজন ব্যক্তির আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে কয়েকদিন হেডলাইন হওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে অনেক কিছুই দিতে হবে, পরিস্থিতি দেখে এরকমই মনে হয় আমাদের।

দেশে এখন একটি বিশেষ রেজিমেন্টেড প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুলিতে তুলে দেয়ার বিনিময়ে সামাজিক ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে জরুরি অবস্থানকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে এ সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা যায় না, বোধহয় তারা নিজেরাও তা মনে করেন না। কালো টাকার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, কয়েকজন বিতর্কিত মন্ত্রী ও রাজনীতিককে গ্রেফতার করে এ সরকার অনেকের নজরও কেড়েছেন। কিন্তু জরুরি আইন জারি হওয়ার আগে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার কিছু কিছু কাজ নিয়ে জনমনে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। চারজন উপদেষ্টা ওইসময় পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সবাই এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন নি। যেমন, একজন উপদেষ্টা নিয়োগবদলি বাণিজ্যের মাধ্যমে বহু টাকার ঘুষ নিয়েছেন, তিনি এমনকি একজন প্রতিষ্ঠিত সম্পাদকের কাছ থেকে একটি রেডিও চ্যানেল অনুমোদন করার বিনিময়ে ঘুষ চেয়েছিলেন। আরেকজন উপদেষ্টা এনার্জি সেক্টরে চারটি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে অবৈধ চুক্তি করে গেছেন। আরেকজন উপদেষ্টা বিদেশি নাগরিকত্ব নেয়ার পরও তথ্য গোপন করে উপদেষ্টা হয়েছিলেন এবং পদত্যাগ করার পরদিন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে অনেক ফাইলে সাক্ষর করে রেখে এসেছেন। এদের এইসব দুর্নীতি কি ধামাচাপা পড়ে যাবে?

আমি যতদূর জানি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানতম কাজটিই হলো, ৯০ দিনের মধ্যে একটি নির্বাচন করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিদার এই জরুরি অবস্থাকালীন সরকার সেই পরিবেশ সৃষ্টির নামে যা করছেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে নির্বাচনের এই পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রধানতম কাজটিই হলো মৌলিক অধিকারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা অর্থাৎ জরুরি আইন প্রত্যাহার করে নেয়া। অথচ এই প্রক্রিয়া ব্যাহত করা হচ্ছে এবং এই সুযোগে এমন অনেক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা গণবিরোধী। এবং এসব এজেন্ডা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা বহাল রাখার স্বার্থেই বোধকরি কথিত সুশীলরা উদ্যোগ নিয়েছেন একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার। মজার ব্যাপার হলো, দল গড়ার দায়িত্ব যিনি নিতে চাইছেন, তিনিই প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা কুক্ষীগতকারী ইয়াজউদ্দিনকে এ পাস দিয়েছিলেন। সেই দলে যদি এখনকার এই উপদেষ্টাদের কেউ কেউ নেতা বনে যান, তাতে আমি অন্তত বিস্মিত হব না। অতীতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে প্রথমে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চোটপাট দেখান এবং পরে ধীরে ধীরে সেই দুর্নীতিবাজদের নিয়েই রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। আমরা চাই না সেই ভয়াবহ অতীতের পুনরাবৃত্তি হোক, আমাদের পুরানো কুমীর দেখানো হোক। এও আমরা চাই না, রাজনীতিবিদদের নিষ্ক্রীয় করে রেখে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া হোক।

রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের দায় সব রাজনীতিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গণমাধ্যমের একটি অংশ এখানে আসলে নেপথ্যে বিবিধ ক্ষমতার অংশীদার হতে চাইছে এবং দেশটি সামাজিক ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। গণমাধ্যমের এই অংশটিই একসময় মৌলবাদীদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, হরকাতুল জেহাদের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছিল বোমা হামলা তদন্তের নামে নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষদের হয়রানি করা যাবে না, এরাই অক্টোবর, ২০০১-এর পর মাসের পর মাস সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর সেন্সর করেছে। কেন তারা তাদের অবস্থান বদল করেছেন, কেনই বা এখন আবার সামাজিক ব্যবসায়ীদের ওকালতি করছেন, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। এই সামাজিক ব্যবসায়ীরা রাজনীতিকদের ঢালাওভাবে দুর্বৃত্ত বলেন, কালো টাকার মালিক বলেন, কিন্তু তারা এমন সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন যা কেবল ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক স্বার্থই সংরক্ষণ করে। আর এরকম একটি রেজিমেন্টেড আবহে রাজনীতিসংশিষ্ট অর্থনৈতিক খাতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার অর্থই হলো সামাজিক ব্যবসায়ীদের জনস্বার্থবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কয়েকদিন আগে একজন উপদেষ্টা বলেছেন, 'আমরা রুই কাতলার ব্যবসা করি, ছোট মাছ ধরি না'। বলা হয়েছে, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা এই গ্রেফতার অভিযানের লক্ষ্য নয়! এবং আমরা অনুভব করছি, বাস্তবিকই দেশে দুর্নীতি দমনের নামে রুই কাতলার ব্যবসা শুরু হয়েছে।

আমাদের কাছে মনে হতে পারে, এই সামাজিক ব্যবসায়ীরা মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দেবে না; কিন্তু বাস্তবতা হলো, জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়া হয় নি, যা আমাদের আশান্বিত করতে পারে। আর এসব কারণেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একুশ আরও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। একুশের তাৎপর্য তো কেবল ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর মূল তাৎপর্য প্রতিবাদ করার মানসিকতার মধ্যে,

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ত দেয়ার মধ্যে। আমরা যেন সেই প্রতিবাদ করতে পারি, আমরা যেন প্রয়োজনে ফের রাজপথে রক্ত দিতে পারি।

২৪ মাঘ ১৪১৩/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। প্রকাশ : দৈনিক সমকাল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

বিদায় স্বায়ত্তশাসন ও সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা?

গত ৫ জুন ২০০৮-এ বাংলাদেশের প্রধান সারির সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'তে কামাল হোসেনের একটি লেখা 'একটি প্রতিষ্ঠানের পুনর্জীবন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩' ছাপা হয়েছে। লেখাটিতে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা যখন জাতীয় ঐক্য ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমাদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাইছি, আমরা যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় বিশ্বাসী, তাঁদের কি উচিত নয় এর পুনর্গঠনের জন্য হাতে হাত রেখে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধন করার ব্যাপারে একমত হওয়া?'

এককথায় তাঁর অভিমত হলো, ১৯৭৩-এর স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশটি জাতীয় স্বার্থে সংশোধন করা হোক।

প্রায় একই সময় দৈনিক ভোরের কাগজে খবর বের হয়, বাংলাদেশের ৩০টি উপজেলার সরকারি-বেসরকারি সব কটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখভালের দায়িত্ব গোপনে গত মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ-ঘটনা স্পষ্টতই প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেসরকারি করে ফেলার প্রাথমিক পদক্ষেপ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষকরা এ ব্যাপারে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভোরের কাগজের খবর অনুযায়ী, ব্র্যাকের কর্মকর্তারা প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠনকে আলোচনায় আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ প্রস্তাব শিক্ষকদের সংগঠনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্র্যাকের এই অতিউৎসাহ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তাদের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। তা ছাড়া ফজলে হোসেন আবেদও বলে দিয়েছেন, উপ-আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম যেহেতু তারা পরিচালনা করতে পারছেন, সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার কাজটিও তারা অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবেন।

সম্প্রতি প্রথম আলোতে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি কলাম ছাপা হয়েছে, যাতে তিনি নম্র ভাষায় সরকারের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। পরে গত ০১ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শফি আহমেদ ব্র্যাকের পক্ষ নিয়ে মুহম্মদ জাফর ইকবালের নিবন্ধের বিরোধিতা করে একটি কলাম লিখেছেন। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে সরকারি সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন।

তার মানে আমরা এখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আর সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা থাকবে কি থাকবে না? এ দুটি বিষয়ই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কামাল হোসেন, যিনি ডক্টর কামাল হোসেন হিসেবেই সাধারণ্যে পরিচিত এবং নামের আগে ডক্টর পদটি না থাকলে যাঁকে অনেকেই পৃথিবীর তাবৎ সাধারণ কামাল হোসেনের তালিকায় ফেলে দেন,– তাঁর কাছ থেকে লিখিতভাবে, তাও আবার বাংলা ভাষায়, কোনও অভিমত পাওয়া সত্যিই বিরল এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিরল এ-লেখাটি আবার এমন এক বিষয়ে লেখা যেটি ভীষণ স্পর্শকাতর। ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসন জারি করার পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩কে বাতিল করার, কখনও বা সংস্কারের নামে অকার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত আর কুলাতে পারেন নি।

অন্যদিকে, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারী করার উদ্যোগও বাংলাদেশে এই প্রথম নয়। ১৯৮১ সালেও বিএনপি'র শাসনামলে সংসদে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বেসরকারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকদের আন্দোলনে সরকার বাধ্য হয় সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে।

বাজার-মৌলবাদের দাবি : সবকিছু করা হোক বেসরকারি

ড. কামাল হোসেন কেন হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে পুরানো সেই 'বাণীচিরন্তন' লিখতে গেলেন? কেন তিনি মনে করছেন, স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাপরিস্থিতিতে মহাবিপর্যয় নেমে এসেছে? সত্যিই কি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্যে স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ ১৯৭৩-ই দায়ী?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যে কামাল হোসেনের এই বাক্যগুলি আমাদের সাহায্য করতে পারে, ''সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে নতুন ধরণের নীতিবর্জিত সহিংস ঘটনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের উৎস থেকে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক উপদলের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতার সঙ্গে জ্ঞান ও সত্যসন্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই।'' একটি নষ্ট উদ্দেশ্যকে সাধন করার জন্যে আরেকটি নষ্ট ছুঁতো খুঁজে পেতে হয়। কামাল হোসেন সেরকম বিভিন্ন ছুঁতো খুঁজে পেতে চেয়েছেন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলির নীতিবর্জিত সহিংস ঘটনার মধ্যে।

যত নষ্টের গোড়া ১৯৭৩-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ,– এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েই কামাল হোসেন এ লেখায় এসব ছুঁতো খুঁজে বের করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই অধ্যাদেশটির খসড়া কপি শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেয়ার সময় শেখ মুজিব নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার কি মনে হয়, এত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নির্বাচিত কার্যালয় হজম করার মতো ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে?' আমরা জানি না, শেখ মুজিব নিহত হওয়ার এত বছর পর কেন কামাল হোসেনের এই 'অমিয়বাণী' মনে পড়ল। আমরা জানি না, কেন তাঁর এতদিন পর মনে হচ্ছে, ''বঙ্গবন্ধু সঠিক অবস্থানে ছিলেন। এত এত নির্বাচন কেবল বদহজমই ঘটায়নি; বরং স্বার্থপর ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে দিয়ে তা খাদ্যে বিষক্রিয়ার রূপ নিয়েছে।'' সামরিক জান্তা এরশাদবিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলনের সময় একবারও তাঁর এ আত্মোপলব্ধি ঘটেনি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটিকে সবচেয়ে হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করার কাজটি ওই সময়েই সম্পন্ন হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে তিনি যখন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণফোরামের পক্ষ থেকে এক সমাবেশ করেন এবং এসংক্রান্ত একটি সমীক্ষাসংকলন ছাপিয়ে ও বিলি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হানাহানির তত্ত্বতালাশ করেন, তখনও তিনি ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের দোষ খুঁজে পাননি। এতদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন হানাহানি অনেকটাই কমে এসেছে, ছাত্র-শিক্ষকরাও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শিক্ষার পরিবেশকে দলবাজী থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে অনেক সচেতন সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন, তখন তিনি হঠাৎ অধ্যাদেশটি পরিবর্তনের 'বাণীচিরন্তন' প্রচার করতে নেমেছেন। এর লক্ষ্য কি শুধুই ''বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের সর্বস্বীকৃত কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় আগে যা শ্রদ্ধা পেত তা ফিরিয়ে আনা?''

না, আসলে তা নয়। এর শেষ লক্ষ্য হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া চালু করার নামে অগণতান্ত্রিক একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া, এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ছকেবাঁধা সৃজনবিমুখ, প্রশ্নহীন, আনুগত্যশীল শিক্ষার ধারা সক্রিয় করা, উচ্চ ও মানসম্মত শিক্ষা সবসময়েই ব্যয়বহুল,- এরকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চশিক্ষার পথ সংকুচিত করা, ক্রমান্বয়ে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যক্তিখাতে তুলে দেয়া, বেসরকারি করা,– কেননা বাজার-মৌলবাদ এরকমই প্রত্যাশা করে পুঁজিশাসিত একটি সমাজ-রাষ্ট্রের কাছ থেকে, কেননা কর্পোরেটতন্ত্র এরকমই প্রত্যাশা করে রাষ্ট্রের সরকারের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন : ধ্রুপদী অভিজ্ঞতা

কামাল হোসেন লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশটি ছিল ষাটের দশকের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া।' কিন্তু এটি কি কেবলই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া? না কি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা বিকাশের ধারাবাহিক ইতিবাচক অভিজ্ঞতাই ছিল এ অধ্যাদেশের মূল পাথেয়? কামাল হোসেন সত্যকে গোপন করতে চেয়েছেন, নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার অতীত ধারাবাহিকতার দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত রাখার চিন্তা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কয়েক দশকের মধ্যেই। এবং এ-চিন্তার শুরু ইতিবাচক বিবেচনা থেকেই।

ভারত উপমহাদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং পরে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তখন প্রশ্ন উঠেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কতটুকু মূল্য পাবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রচলনের পেছনে বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন স্বার্থ সংশিষ্ট ছিল। কিন্তু তারপরও শিক্ষার সার্বজনীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই মৌলিক বিষয় হয়ে ওঠে। এসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাবর্তনে বক্তব্য রাখার সময় একজন ইংরেজ উপাচার্য এমন এক ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করেছিলেন, ''যখন শিক্ষা এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে, তা এমনি সাধারণ অর্জনের বিষয় হয়ে পড়বে যে, এ আর অসাধারণ বলে গণ্য হবে না, যার ফলে শিক্ষা কোনো বিশেষ দাবি বা ব্যক্তির কোনো অভিযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উচ্চশিক্ষার তেমন বিস্তারই হবে আমাদের শান্ত কামনা।''

ব্রিটিশরাজের নিয়োজিত উপাচার্যের পক্ষ থেকে এরকম শান্ত কামনা জানানোর পরও ব্রিটিশ শাসকচক্র বার বার উদ্বিগ্ন হয়েছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে। কেননা তাদের মনে হয়েছে, স্বাধীন শিক্ষার সংস্পর্শে আসার মধ্যে দিয়ে এমন সব দাবি অনিবার্যভাবেই উঠে আসছে যেগুলোর চরিত্র রাজনৈতিক। রাজনীতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছে তারা। আর এ-ব্যাপারেও মুখ খুলতে হয়েছে উপাচার্যদের। ১৮৯৩ সালে একজন ইংরেজ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে জানান, ''বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে উৎসাহিত করাতে আপত্তি সম্পর্কে আমার একটি চতুর সন্দেহ আছে, সেটি এই যে আমরা যেহেতু যাই করি বা না করি না কেন তাদেরকে নিবৃত্ত করতে পারবো না তাই রাজ নৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেদেরকে অভিব্যক্তি করার বৈধ সুযোগ করে দেওয়াই সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে।''

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত ভূমিকা এবং স্বায়ত্তশাসন নিয়ে দ্বন্দ্ববিরোধ বিকশিত ও পরিশীলিত হতে হতে ধারাবাহিকভাবে যে-সত্যে উপনীত হয় সে-সত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে। পরপর দু'বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তিনি। শিক্ষার্থীরা হবে অনুগত, কর্তৃপক্ষের প্রতি দায়বদ্ধ, সরকারের কাছে অবনত,– এরকম সব ধারণা পোষণ করতেন তিনি প্রথম দিকে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তিনি এই জ্ঞানে উপনীত হন,– কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে না, মুক্ত চিন্তাকে উৎসাহিত করতে পারে না।

১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্যার আশুতোষ বলেছিলেন, ''আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের প্রতি সেই আনুগত্যের বোধ প্রদর্শন করো যা সত্যিকারের শিক্ষাগত শৃঙ্খলার অপরিহার্য অঙ্গ। ...নিজেদেরকে অনুগত ও মূল্যবান নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করো। পৃথিবীকে দেখিয়ে দাও যে, শিক্ষা ও আনুগত্য কেবল পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ হবে তা নয়, বরঞ্চ যতই শিক্ষা এগোবে, যতই বিশুদ্ধ হবে সংস্কৃতি, ততই গভীরে হবে শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক।''

পরের বছর ১৯০৯ সালে সমাবর্তন ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সর্বপ্রকারে, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে আমাদের যুবকদেরকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে যারা দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতে চায় এবং আইনসঙ্গত সরকারের বিরুদ্ধে কচি মনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।'

তারপর ১৯১০ সালের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, ''এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কোনো কোনো শিক্ষক ও অধ্যাপক- ছাত্রদের পড়ানোর মতো প্রস্তুতি ও যোগ্যতা যাঁদের আছে – তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত আস্থার অপমান করছেন।''

কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এই সত্যের দিকে এগিয়ে গেলেন, অনুগত শিক্ষার্থীরা কখনও সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে না, নতুন চিন্তার জন্ম দিতে পারে না, নিজেদের বিকশিত করতে পারে না, প্রকৃত শিক্ষায় অবগাহন করতে পারে না। তিনি দেখতে পেলেন, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে এরকম সব অনুগত ডিগ্রিধারীরই জন্ম দিতে চাইছে ব্রিটিশরাজ ও সরকার।

১৯২১ সালে দ্বিতীয় দফায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অসহযোগ আন্দোলন চলছে তখন। তিনি দেখতে পেলেন, সরকার চায় বিশবিদ্যালয়কে আরও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। ১৯২৩-এর সমাবর্তনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই সমস্যার দিকেই মুখ তুলে কথা বললেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বাধীনতা হলো শোণিত-ধারা, বিকাশের শর্ত, সাফল্যের রহস্য।'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আরও বললেন, 'জেনে রাখুন, আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমাননায় অংশ নেবো না। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছুতেই গোলাম সৃষ্টির কারখানায় পরিণত হতে দেওয়া হবে না। আমরা যথার্থরূপে চিন্তা করতে চাই। আমরা স্বাধীনতা শিক্ষা দিতে চাই।''

এটিই ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ সমাবর্তন ভাষণ। পরের বছর ১৯২৪ সালে মারা যান তিনি। কিন্তু মৃত্যুর আগে আরও একটি দৃষ্টান্তজনক ও সুদূরপ্রসারী ঘটনার জন্ম দেন তিনি। বাংলার তৎকালীন গভর্নর লিটন এ-সময় তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন, একটি কাজ করে দিলে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আবারও উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন,– কাজটি হলো, বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। লিটনের এই চিঠির উত্তরে, এই প্রস্তাবকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে-চিঠি লিখেছিলেন, সেটি এখন পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনসংক্রান্ত ইতিহাসের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত।

অধ্যাদেশ বদলালেই সব পাল্টে যাবে?

প্রায় একশ বছর আগে এই আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল স্যার আশুতোষের জীবনে। কামাল হোসেনের জীবনেও একই ঘটনা ঘটল, তবে উল্টোভাবে। আশুতোষ হেঁটেছিলেন সামনের দিকে, কামাল হোসেন হাঁটলেন পেছনের দিকে। যদিও কামাল হোসেন ভালো করেই জানেন, দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী সামরিক শাসন এদেশের শিক্ষাকাঠামোকেও অন্যায়-অভ্যস্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত, অবনত ও বিকৃত করে ফেলেছে; জানেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামধারী দলগুলোও তাদের শাসনামলে আলাদা কোনও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি।

এইসব একই চিত্র বার বার বর্ণনা করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হলো, এর সমাধান কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনীতিমুক্ত করা? এর সমাধান কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসনমুক্ত করা? এর সমাধান কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনপদ্ধতি তুলে দেয়া? ছাত্র ও শিক্ষকরাজনীতি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চয়ই কোনও ধর্মগ্রন্থ নয় যে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-নির্বাচনপদ্ধতি স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশে রয়েছে, তাকে আরও গণতান্ত্রিক করার বদলে অগণতান্ত্রিক করে তোলা কি সমাধানের পথ? কামাল হোসেন তো দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার পরও অতীতের সামরিক জান্তারা, বহুদলীয় শাসনের ছদ্দাবরণে বসবাসরত স্বৈরশাসকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধ্যাদেশকে বাতিল করতে চেয়েছে। কেন চেয়েছে? নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার পরও কেন তাদের মনে হয়েছে এটি একটি বড় হুমকি নিয়ন্ত্রকদের জন্যে? কারণ সামরিক জান্তা ও স্বৈরশাসকদের ভালো করেই জানা আছে, চূড়ান্ত দলীয়করণের পরও যে-কোনও সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ভেঙে মুক্তচিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ।

একই কথা ছাত্র রাজনীতির বেলাতেও খাটে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার পথ কি ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা? নাকি ছাত্ররাজনীতিকে বিকশিত করেই কেবল সম্ভব শিক্ষাঙ্গনকে সুস্থ ও মুক্তচিন্তা চর্চার উপযোগী করা? গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের ব্যক্তিগত মত শুনে আসছি। দুঃখজনক হলেও সত্য, তাঁর এ-অভিমত কর্পোরেটবাদীদের উপকার করা ছাড়া আর কারও কাজে লাগেনি। যে মানুষটি ছাত্ররাজনীতির বিরোধিতা করেন, সে মানুষটিই রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে জাগ্রত করতে চান,– এর মতো বৈপরীত্য আর কী হতে পারে? এখন, ধরুন, আনোয়ারুলাহ চৌধুরী রাতের অন্ধকারে উপাচার্যের আসনে আসীন হয়েছিলেন। সেটি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশের দোষ? না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের হস্তক্ষেপের ফল? এই কুখ্যাত আনোয়ারুলাহ চৌধুরী যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তার কারণ কি রাজনৈতিক চেতনা নয়? স্বায়ত্তশাসন ও রাজনীতিকে ত্যাগ করলে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব হবে না হাসান আজিজুল হকদের মতো মুক্ত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের রক্ষা করা, বরং অচিরেই শিক্ষকদের ড. তাহের কিংবা ড. ইউনূসের পরিণতি মেনে নিতে হবে, বার বার আগস্ট ২০০৭-এর মতো কারাগারে যেতে হবে শিক্ষকদের।

আর কামাল হোসেনের মুখে তো শেখ মুজিবের এইসব 'অমিয়বাণী' মানায় না। তিনি কি দেখেননি, শেখ মুজিবুর রহমান একসময় দেশের যাবতীয় অরাজকতা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি থেকে উত্তরণের জন্যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল চালু করেছিলেন? কামাল হোসেন দাবি করে থাকেন, তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিলটি পাশ হওয়ার সময় বিদেশে ছিলেন। যদি তাই হয়, তা হলে এটিও তিনি জানেন, শেখ মুজিবের ওই পদক্ষেপের ফলে শেষমেষ বাংলাদেশে সামরিক শাসন এসেছে, ধর্মজ রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক অধিকার সংবিধানসম্মত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখটাও দেখতে পারি নি। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার গলদের জন্যে রাজনীতি ও স্বায়ত্তশাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এগুলো ছেঁটে ফেলতে চাইলেও ফলাফল সে-রকমই হবে। গণতন্ত্রকে ছেঁটে ফেলে শেখ মুজিব এ-রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করতে পারেননি, রাজনীতি ও স্বায়ত্তশাসনকে ছেটে ফেলে কামাল হোসেনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্থিতিশীল করতে পারবেন না। একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শেখ মুজিব, তারপর একদলীয় শাসনেরই আরেক রূপ সামরিক শাসন চালিয়ে জিয়া ও এরশাদ বাংলাদেশকে পবিত্র করতে পারেননি, রাজনীতি নিষিদ্ধ করে কামাল হোসেনরাও পারবেন না শিক্ষার মানকে উন্নত করতে।

অবশ্য ১১ জানুয়ারির নীরব সামরিক অভ্যুত্থানকে যারা বৈধ মনে করেন, সর্বরোগহর মনে করেন তারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশের মধ্যেই যাবতীয় দোষ খুঁজে পাবেন তাতে আর সন্দেহ কি!

প্রাথমিক শিক্ষাকে অকার্যকর করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

বাজার-মৌলবাদের খপ্পরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠেলে দেয়ার জন্যে যে-তোড়জোর শুরু হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্র্যাকের তত্ত্বাবধানে তুলে দেয়ার ঘটনাটিও তার একটি উদাহরণ। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে গ্রাস করার জন্যে ব্র্যাক জাল ফেলেছে অনেক আগে। তাদের এ লক্ষ্যের পরিপূরক কর্মসূচি হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের শক্তিশালী প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গণসাহায্য সংস্থা। কিন্তু ব্র্যাকের এনজিও-রাজনীতির চক্রে হাসফাঁস খেতে খেতে গণসাহায্য সংস্থা বাধ্য হয়েছে ব্র্যাকের হাতে তাদের দেশব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি তুলে দিতে। এ-কাজে তারা ব্যবহার করেছিল যে-এনজিওটিকে সেই প্রশিকাও এখন মারাত্মক দুর্দশার শিকার। দুষ্ট লোকে বলে, নেপথ্য থেকে এ-ব্যাপারেও ব্র্যাক ভূমিকা রাখছে। ব্র্যাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় তাদের শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি নি। যেসব শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে, তাদের শিক্ষা দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।' কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরিয়ে ফেলা হচ্ছে ব্র্যাক স্কুলের বিবিধ সুযোগসুবিধার হাতছানি দেখিয়ে। এরপরও কাজ হয় না দেখে ব্র্যাক এখন চাইছে চুক্তির ফাঁদে ফেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কব্জা করে নিতে। কয়েকদিন আগে ফজলে হোসেন আবেদ বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'এটা পারলে (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা) ওটা (প্রাথমিক শিক্ষা) না পারার কি আছে?' তার মানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

সরকার খুব ভালো করেই জানেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা কোথায়। তাদের বেতন সামান্য, পর্যাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন এমন স্কুল হাতে গোণা যায়। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। আর শিক্ষকসংকট থাকলে স্কুল ছেড়ে গিয়ে তারা প্রশিক্ষণই বা নেবেন কেমন করে? সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সারা বছর ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়,– কখনও ভোটারতালিকা তৈরির কাজে, কখনও আদমশুমারির কাজে, কখনও টীকাপ্রদান কর্মসূচিতে, কখনও আবার অমুক-তমুক জরিপের কাজে। আবার অনেক সময় বিতর্কিত সব শিক্ষাকর্মসূচির মাধ্যমে, যেমন *শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য*, তাদের ঠেলে দেয়া হয় স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে দ্বন্দ্বের দিকে। সরকার প্রচার করে, স্কুলে গেলেই গরিব ছাত্রছাত্রীরা খাদ্য পাবে; কিন্তু এ কর্মসূচির নিয়ম হলো, কেবল অভাবী হলেই চলবে না, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে এবং পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট গড়মাত্রার নম্বর পায় এমন ছাত্রছাত্রীদেরই খাদ্য দেয়া হবে। গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো শিক্ষকদের ওপর যে অপ্রকাশ্য চাপ সৃষ্টি করে, তার ফলে স্কুলের শিক্ষকরা বাধ্য হয় ছাত্র বা ছাত্রটিকে অভাবীর সার্টিফিকেট দিতে, বাধ্য হয় কাগজে-কলমে তাকে উপস্থিত দেখাতে এবং বাধ্য হয় পরীক্ষার সময় ইঙ্গিতময় ভাষায় উত্তর বলে দিতে,– যাতে তারা পরীক্ষার খাতায় গড় মার্কস পেতে পারে (কেননা এই পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষণ করা হয় অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে)। সরকার নিজে যে অনৈতিকতার, অশিক্ষার বীজ বপন করেছেন তা উৎপাটন না করে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও অনিয়মের অভিযোগ এনে অপচেষ্টা করছেন জনমনে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনাস্থা তৈরি করতে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে পাটকলের পরিণতি?

আমেরিকার নিউ অরলিয়ান্সের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাটুকুকে মনে করুন। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তিন মাস পর ৯৩ বছরের থুথুরে বুড়ো 'আঙ্কল মিলটি' ওরফে মিলটন ফ্রিডম্যান 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ লিখলেন, 'নিউ অরলিয়ানসের অধিকাংশ বিদ্যালয় ওইসব স্কুলে পড়াশুনা করা শিশুদের বাড়িঘরের মতোই ভেসে গেছে। এই ছেলেপেলেরা এখন ছড়িয়ে আছে সারা দেশ জুড়ে। এটি একটি ট্র্যাজেডি। আবার এটি একইসঙ্গে একটি বিরাট সুযোগ, পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে রেডিক্যালি সংস্কার করার বিরাট সুযোগ!' ফ্রিডম্যানের সেই রেডিক্যাল সংস্কারের ধারণাটি ছিল এরকম, সরকারি স্কুলগুলোতে আর সরকারের টাকা খরচ করে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন কাজের কোনও দরকার নেই। অতএব অচিরেই আমেরিকার এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিণত হয় বেসরকারিভাবে পরিচালিত চারটার বিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশেও তাই হতে চলেছে। এ সরকার এবং তাদের সুশীলবন্ধুরা চাইছেন, বাজার-মৌলবাদের স্বার্থে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বেসরকারি করে ফেলতে। কিন্তু এতো আর শ্রমিকদের পাটকল নয় যে সরাসরি কোনও আগাম বার্তা না দিয়েই এসব বন্ধ করে দিয়ে পরে বেসরকারি খাতে বিক্রি করে দেয়া যাবে। তাই কখনও কামাল হোসেনদের মুখ খুলতে হচ্ছে, কখনও কর্পোরেট-কলামিস্টদের শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ে হাহুতাশ করতে হচ্ছে, কর্পোরেট সাংবাদিকরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ইতিবাচক খবর ছাপছেন, কর্পোরেট সংবাদপত্রগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে মিলে গোলটেবিল বৈঠক করছে। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ : বাজার-মৌলবাদের প্রতিনিধিত্ব করা; শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা। পুরো দেশটিকে একটি বাজারে পরিণত করার আগে তাদের মুক্তি নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই; তাতে দেশের যাই হোক না কেন, কোনও কিছুই আসে-যায় না।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১৫/ জুন ২০০৮ । প্রকাশ : ইউকে বেঙ্গলি ডট কম, ২২ জুন ২০০৮ ।